রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৪
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৮৮০ শক : জুলাই ১৯৫৮

মূল্য ৯৲, ১২৲ ও ১৩৲

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

প্রহাসিনী

ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায়
দ্যুলোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ত্বরিতে পারায়ে—
পরিহাসচ্ছটা ফেলে সুদূরে হারায়ে,
সৌর বিদূষক পায় ছুটি।

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

এ জগৎ মাঝে মাঝে কোন্ অবকাশে
কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে
হেসে ওঠে, দেখা যায় আলোকে ঝলকে—
তারা কেহ ধ্রুব নয়, পলকে পলকে
চিহ্ন তার নিয়ে যায় মুছে।

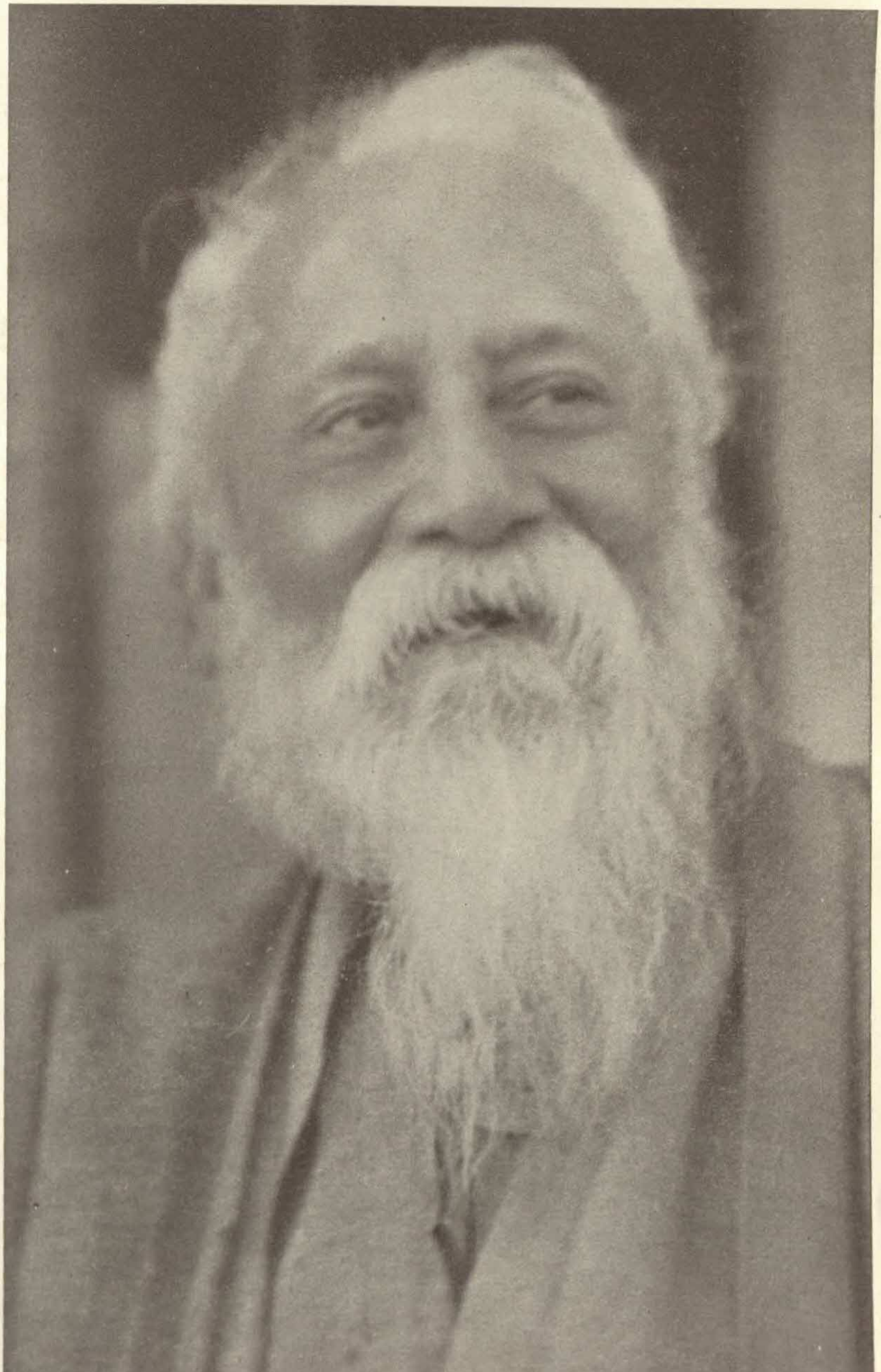
তিমির-আসনে যবে ধ্যানমগ্ন রাতি
উল্কাবরিষনকর্তা করে মাতামাতি—
দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গনা,
প্রহর-কয়েকে যায় ঘুচে।

অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্বসৃষ্টিতে,
বিধাতার স্নেহ তাহে সহাস্য দৃষ্টিতে।
তেমনি হালকা হাসি দেবতার দানে
রয়েছে খচিত হয়ে আমার সম্মানে—
মূল্য তার মনে মনে জানি।

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্লামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
পৌষ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



প্রহাসিনী

আধুনিকা

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।
কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়
যদি সন্দেহ কর এত বড়ো অবিনয়,
চুপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয়।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা।
পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হর্‌দম
বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে।
জীর্ণ জীবনে আজ রঙ নাই, মধু নাই—
মনে রেখো, তবু আমি জন্মেছি অধুনাই।
সাড়ে আঠারো শতক এ. ডি., সে যে বি. সি. নয়;
মোর যারা মেয়ে-বোন নারদের পিসি নয়।
আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে,
কবিযশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে।

তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরীনিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ যে।
সেকালেও কালিদাস-বররুচি-আদিরা
পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা
যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ,
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।
জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখ অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা।
মিঠে আর কটু মিলে, মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি।
মিষ্ট-কটুর মাঝে কোন্‌টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্‌ কবির সাহিত্যে।
ঐ দেখো, ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।
এরকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য।
প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।

বারে বারে এইমতো করি অত্যুক্তি
ক্ষমা করে কোরো সেই অপরাধমুক্তি।

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই,
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই।
অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ প্রাণ দিয়ে—
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে।
পুরুষ পরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা।
করুণায় ব'লে থাক্, "আহা, মন্দ বা কী।"
খুঁটে বের কর না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় কজনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা।
এর পর বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পার যদি ভুলিতে।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণপবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে—
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনও যদি পারে মন মাতাতে
তাহলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া।

এ কী গেরো। কাজ কী এ কল্পনাবিহারে,
সেন্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে।
ম'রে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই;
এস্টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই।

অতএব, মন, তোর কলসি ও দড়ি আন্,
অতলে মারিস ডুব মিড্-ভিক্‌টোরিয়ান।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে;
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদ্‌গদ স্বর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়।

তোমাদের মুখে থাক্ হাস্যের রোশনাই—
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।
এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্‌ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবিরেখা রবে সোনা-আঁকা স্মরণে।
সুর-সুরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
প্রেমদীপ জেলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানারূপে ভোগসুধা যা করেছে বরষন
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
দামি যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।

আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা সিনিকাল!
কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে— ঢাকা থাক্ তার প্রতি বিশ্বাস।

একটু সবুর করো, আরো কিছু বলে যাই,
কথার চরম পারে তারপরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার।
ভিড় ক'রে ঘটা-করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের—
কবি-'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।
"ভুলিব না, ভুলিব না" এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু, বলো তাহে হিত কার।
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশালাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো—
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সদুপায় এ নহে।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ—
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য,
সকলি আহুতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিঁকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিঁকাতে

ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে।

লাহোর
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

নারীপ্রগতি

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে।
নারীপ্রগতির মহাদিনে আজি
নারীপদগতি জিনিল এ বাজি।

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে ;
কেনে নি ইস্‌টিশনের টিকেট ;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলে নি ক্রিকেট ;
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায় ;—
তারা তো মন্দ-মধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।

রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে—
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস, এ তড়িৎগতি ;

পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া,
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া। —
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।

সে ধ্বনি শুনিয়া পরলোকে বসি,
কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি
উষ্ণীষ তব; দুরুদুরু বুকে
ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে।
একটি প্রশ্ন শুধাব এবার—
অকপটে তারি জবাব দেবার
আগে একবার ভেবে দেখো মনে,
উত্তর পেলে রাখিব গোপনে—
স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিলে যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
নিতে চাও কভু তীব্রভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ-দূত
লিখিতে পাবে কি ভাষা মজবুত।

রঙ্গ

'এ তো বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত—
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।

পরিণয়মঙ্গল

তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক্ সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে;
শাশুড়ি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা'।

'পাক প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

যা-ই কেন বলুক-না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব ক'ষে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।
বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর-বাকর চায় মাসহারা-চোকানি—
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ।

বই-কেনা শখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয়;
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয়।
বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতাটি,
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মনুসংহিতাটি:
'স্ত্রী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হুঁশ রয়।

যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দু'তলায়।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে।

দ্রুত উন্নতিবেগে স্বামীর অদৃষ্ট
দারোগাগিরিতে এসে শেষে পাক্ ইষ্ট।
বহু পুণ্যের ফল যদি তার থাকে রে,
রায়বাহাদুর-খ্যাতি পাবে তবে আখেরে;
তার পরে আরো কী বা রবে অবশিষ্ট।

প্রয়াগ। ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

ভাইদ্বিতীয়া

সকলের শেষ ভাই
সাতভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল
দৈবানুকম্পার।
মনে মনে বিধি-সনে
করেছিল মন্ত্রণ,
যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
পায় সে নিমন্ত্রণ।
যদি জোটে দরদি
ছোটো-দি বা বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ
নাতনির র‍্যাঙ্কে,
উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
সাধুবাদে থ্যাঙ্কে।

এল তিথি দ্বিতীয়া,
ভাই গেল জিতিয়া
ধরিল পারুল দিদি
হাতা বেড়ি খুন্তি।
নিরামিষে আমিষে
রেঁধে গেল ঘামি সে,
ঝুড়ি ভ'রে জমা হল
ভোজ্য অগুন্তি।
বড়ো থালা কাংসের
মৎস্য ও মাংসের
কানায় কানায় বোঝা

হয়ে গেল পূর্ণ।
স্বঘ্রাণ পোলায়ে
প্রাণ দিল দোলায়ে,
লোভের প্রবল স্রোতে
লেগে গেল ঘূর্ণো।
জমে গেল জনতা,
মহা তার ঘনতা
ভাই-ভাগ্যের সবে
হতে চায় অংশী।
নিদারুণ সংশয়
মনটারে দংশয়—
বহুভাগে দেয় পাছে
মোর ভাগ ধ্বংসি।
চোখ রেখে ঘণ্টে
অতি মিঠে কণ্ঠে
কেহ বলে, "দিদি মোর!"
কেহ বলে, "বোন গো,
দেশেতে না থাক্ যশ,
কলমে না থাক্ রস,
রসনা তো রস বোঝে,
করিয়ো স্মরণ গো।"
দিদিটির হাস্য
করিল যা ভাষ্য
পক্ষপাতের তাহে
দেখা দিল লক্ষণ।
ভয় হল মিথ্যে,
আশা হল চিত্তে,
নির্ভাবনায় ব'সে
করিলাম ভক্ষণ।

লিখেছিনু কবিতা
স্থরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ
বাঁচতে ও মরতে।
ভেবেছিনু তখুনি,
একি মিছে বকুনি।
আজ তার মর্মটা
পেরেছি যে ধরতে।
যদি জন্মান্তরে
এই দেশেই টান ধরে
ভাইরূপে আর বার
আনে যেন দৈব—
হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
ঘষাঘষি চন্দন,
ভগ্নী হবার দায়
নৈবচ নৈব।
আসি যদি ভাই হয়ে
যা রয়েছি তাই হয়ে
সোরগোল পড়ে যাবে
হুলু আর শঙ্খে—
জুটে যাবে বুড়িরা
পিসি মাসি খুড়িরা,
ধুতি আর সন্দেশ
দেবে লোকজনকে।
বোনটার ধ'রে চুল
টেনে তার দেব ভুল,
খেলার পুতুল তার
পায়ে দেব দলিয়া।
শোক তার কে থামায়,
চুমো দেবে মা আমায়,

রাক্ষুসি বলে তার
কান দেবে মলিয়া।
বড়ো হলে নেব তার
পদখানি দেবতার,
দাদা নাম বলতেই
আঁখি হবে সিক্ত।
ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাত অতিরিক্ত।

ভাইদ্বিতীয়া, ১৩৪৩

ভোজনবীর

অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
নাহয় হবে পেটের গোলযোগ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর,
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীর সর।

দেহের তামসিকতা ছিছি মাংস হাড় পেশি,
তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফ্‌তা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।

ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে—
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,
পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে,—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলংকৃত।

যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি,
গলায় যমদৌতিকের দড়ি।
হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে,
কবিরাজিও নারাজ হবে,
তখন আবধৌতিকের বড়ি।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরই পথে ঢুকে
অম্লশূলসাধনকৌতুকে।
কাঁচা আমের আচার যত
রহিবে হয়ে বংশগত,
ধরাবে জালা পারিবারিক বুকে।

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।

লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো—তাহার পরে মৃত।

অপাক-বিপাক

চলতি ভাষায় যারে ব'লে থাকে আমাশা
যত দূর জানা আছে, সেটা নয় তামাশা।
অধ্যাপকের পেটে এল সেই রোগটা তো,
তাহার কারণ ছিল গুরু জলযোগটা তো।

বউমার অবারিত অতিথিসেবার চোটে
কী কাণ্ড ঘটেছিল শুনে বুক ফুলে ওঠে।
টেবিল জুড়িয়া ছিল চর্ব্য ও কত পেয় ;
ডেকে ডেকে বলেছেন, "যত পার তত খেয়ো।"
হায়, এত উদারতা সইল না উদরের—
জঠরে কী কঠোরতা বিজ্ঞানভূধরের ;
রসনায় ভূরি ভূরি পেল এত মিষ্টতা,
অন্তরে নিয়ে তারে করিল না শিষ্টতা।
এই যদি আচরণ হেন খ্যাতনামাদের,
তোমাদেরি লজ্জা সে, ক্ষতি নেই আমাদের।
হেথাকার আয়োজনে নাই কার্পণ্য যে,
প্রবল প্রমাণে তারি পরিবার ধন্য যে।
বিশ্বে ছড়াল খ্যাতি ; বিশ্ববিদ্যাগৃহে
করে সবে কানাকানি, "বলো দেখি, হল কী হে।"
এত বড়ো রটনার কারণ ঘটান যিনি
তাঁর কাছে কবি রবি চিরদিন রবে ঋণী ॥

গরঠিকানি

বেঠিকানা তব
আলাপ শব্দভেদী
দিল এ বিজনে
আমার মৌন ছেদি।
দাদুর পদবী
পেয়েছি, তাহার দায়
কোনো ছুতো করে
কভু কি ঠেকানো যায়!
স্পর্ধা করিয়া
ছন্দে লিখেছ চিঠি;
ছন্দেই তার
জবাবটা যাক মিটি।
নিশ্চিত তুমি
জানিতে মনের মধ্যে,—
গর্ব আমার
খর্ব হবে না গদ্যে।
লেখনীটা ছিল
শক্ত জাতেরই ঘোড়া;
বয়সের দোষে
কিছু তো হয়েছে খোঁড়া।
তোমাদের কাছে
সেই লজ্জাটা ঢেকে
মনে সাধ, যেন
যেতে পারি মান রেখে।
তোমার কলম
চলে যে হালকা চালে,
আমারো কলম
চালাব সে ঝাঁপতালে;

হাঁপ ধরে, তবু
        এই সংকল্পটা
টেনে রাখি, পাছে
        দাও বয়সের খোঁটা।
ভিতরে ভিতরে
        তবু জাগ্রত রয়
দর্পহরণ
        মধুসূদনের ভয়।
বয়স হলেই
        বৃদ্ধ হয়ে যে মরে
বড়ো ঘৃণা মোর
        সেই অভাগার ’পরে।
প্রাণ বেরোলেও
        তোমাদের কাছে তবু
তাই তো ক্লান্তি
        প্রকাশ করি নে কভু।

কিন্তু একটা
        কথায় লেগেছে ধোঁকা,
কবি বলেই কি
        আমারে পেয়েছ বোকা।
নানা উৎপাত
        করে বটে নানা লোকে,
সহ্য তো করি
        পষ্ট দেখেছ চোখে,—
সেই কারণেই
        তুমি থাক দূরে দূরে,
বলেছ সে কথা
        অতি সকরুণ সুরে।

বেশ জানি, তুমি
জান এটা নিশ্চয়—
উৎপাত সে যে
নানা রকমের হয়।
কবিদের ’পরে
দয়া করেছেন বিধি—
মিষ্টি মুখের
উৎপাত আনে দিদি।
চাটু বচনের
মিষ্টি রচন জানে ;
ক্ষীরে সরে কেউ
মিষ্টি বানিয়ে আনে।
কোকিলকণ্ঠে
কেউ বা কলহ করে ;
কেউ বা ভোলায়
গানের তানের স্বরে।
তাই ভাবি, বিধি
যদি দরদের ভুলে
এ উৎপাতের
বরাদ্দ দেন তুলে,
শুকনো প্রাণটা
মহা উৎপাত হবে।
উপমা লাগিয়ে
কথাটা বোঝাই তবে।—
সামনে দেখো-না
পাহাড়, সাবল ঠুকে
ইলেক্‌ট্রি কের
খোঁটা পোঁতে তার বুকে ;
সন্ধ্যেবেলার
মসৃণ অন্ধকারে

এখানে সেখানে
          চোখে আলো খোঁচা মারে।
তা দেখে চাঁদের
          ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,
বার্তা পাঠায়
          শৈলশিখর-পানে—
বলে, "আজ হতে
          জ্যোৎস্নার উৎপাতে
আলোর আঘাত
          লাগাব না আর রাতে"—
ভেবে দেখো, তবে
          কথাটা কি হবে ভালো।
তাপের জ্বলন
          আনে কি সবারই আলো।

এখানেই চিঠি
          শেষ ক'রে যাই চলে—
ভেবো না যে তাহা
          শক্তি কমেছে ব'লে;
বুদ্ধি বেড়েছে
          তাহারই প্রমাণ এটা;
বুঝেছি, বেদম
          বাণীর হাতুড়ি পেটা
কথারে চওড়া
          করে বকুনির জোরে,
তেমনি যে তাকে
          দেয় চ্যাপটাও ক'রে।
বেশি যাহা তাই
          কম, এ কথাটা মানি—

চেঁচিয়ে বলার
　　চেয়ে ভালো কানাকানি।
বাঙালি এ কথা
　　জানে না ব'লেই ঠকে ;
দাম যায় আর
　　দম যায় যত বকে।
চেঁচানির চোটে
　　তাই বাংলার হাওয়া
রাতদিন যেন
　　হিস্‌টিরিয়ায় পাওয়া।
তারে বলে আর্ট
　　না-বলা যাহার কথা ;
ঢাকা খুলে বলা
　　সে কেবল বাচালতা।
এই তো দেখো-না
　　নাম-ঢাকা তব নাম ;
নামজাদা খ্যাতি
　　ছাপিয়ে যে ওর দাম

এই দেখো দেখি,
　　ভারতীর ছল কী এ।
বকা ভালো নয়,
　　এ কথা বোঝাতে গিয়ে
খাতাখানা জুড়ে
　　বকুনি যা হল জমা
আর্টের দেবী
　　করিবে কি তারে ক্ষমা
সত্য কথাটা
　　উচিত কবুল করা—

রব যে উঠেছে
রবিরে ধরেছে জরা,
তারই প্রতিবাদ
করি এই তাল ঠুকে ;
তাই ব'কে যাই
যত কথা আসে মুখে।
এ যেন কলপ
চুলে লাগাবার কাজ—
ভিতরেতে পাকা,
বাহিরে কাঁচার সাজ।
ক্ষীণ কণ্ঠেতে
জোর দিয়ে তাই দেখাই,
বকবে কি শুধু
নাতনিজনেরা একাই।
মানব না হার
কোনো মুখরার কাছে,
সেই গুমোরের
আজো ঢের বাকি আছে।

কালিম্পং
৫ আষাঢ়, ১৩৩৫

অনাদৃতা লেখনী

সম্পাদকি তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে,
অন্তরেতে লেখার তাগিদ একটু নাহি রে
মৌন মনের মধ্যে
গদ্যে কিংবা পদ্যে।

পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে
ফুল উঠিত জেগে—
কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া
নিত্যই দেয় নাড়া,
ধাক্কা খেয়ে যে জিনিসটা ফোটে খাতার পাতে
তুলনা কি হয় কভু তার অশোকফুলের সাথে।

দিনের পরে দিন কেটে যায়
গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে
শীতের রৌদ্রে মাঠের পানে চেয়ে।
ফিকে রঙের নীল আকাশে
আতপ্ত সমীরে
আমার ভাবের বাষ্প উঠে
ভেসে বেড়ায় ধীরে,
মনের কোণে রচে মেঘের স্তূপ,
নাই কোনো তার রূপ—
মিলিয়ে যায় সে এলোমেলো নানান ভাবনাতে,
মিলিয়ে যায় সে কুয়োর ধারে
শজনেগুচ্ছ-সাথে।

এদিকে যে লেখনী মোর
একলা বিরহিণী ;
দৈবে যদি কবি হতেন তিনি,
বিরহ তাঁর পদ্যে বানিয়ে
নিচের লেখার ছাঁদে আমায়
দিতেন জানিয়ে—

বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্গুলিচম্পাসু,
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু।

যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
অচলকূটের নির্বাসন সে কেমন ক'রে সবে।
বক্ষ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
কেন আমায় ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তি দান।
স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনোদিন।
করেছি কি চঞ্চু আমার ভোঁতা কিংবা ক্ষীণ।
কোনোদিন কি অপঘাতে তাপে কিংবা চাপে
অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে।
পত্রপটে অক্ষর-রূপ নেবে তোমার ভাষা,
দিনে-রাতে এই ছাড়া মোর আর কিছু নেই আশা।
নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে,
নীল কালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার ভরে।
চালাই তোমার কীর্তিপথে রেখার পরে রেখা,
আমার নামটা কোনো খাতায় কোথাও রয় না লেখা।
ভগীরথকে দেশবিদেশে নিয়েছে লোক চিনে,
গোমুখী সে রইল নীরব খ্যাতিভাগের দিনে।
কাগজ সেও তোমার হাতের স্বাক্ষরে হয় দামি,
আমার কাজের পুরস্কারে কিছুই পাই নে আমি।
কাগজ নিত্য শুয়ে কাটায় টেবিল-'পরে লুটি,
বাঁ দিক থেকে ডান দিকেতে আমার ছুটোছুটি।
কাগজ তোমার লেখা জমায়, বহে তোমার নাম—
আমার চলায় তোমার গতি এইটুকু মোর দাম।
অকীর্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ,
আসবে তখন আবর্জনায় বিসর্জনের দিন।
বাচালতায় তিন ভুবনে তুমিই নিরুপম,
এ পত্র তার অনুকরণ; আমায় তুমি ক্ষমো।
নালিশ আমার শেষ করেছি, এখন তবে আসি।
—তোমার কালিদাসী।

পলাতকা

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে,
　　　　একজামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের 'পরে ঝুঁকে থাক,
বেণীর ডগাও দেখি নাকো,
　　　　দিনে রাতে পাই নে যে সাড়া।
আমার চায়ের সভা শূন্য,
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,
　　　　সুমুখে নফর বনমালী।
'সুমুখ' তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় খিঁচে,
　　　　বিনাদোষে দিই তারে গালি।
ভোজন ওজনে অতি কম—
নাই রুটি, নাই আলুদম,
　　　　নাই রুইমাছের কালিয়া।
জঠর ভরাই শুধু দিয়ে
দু-পেয়ালা Chinese tea-য়ে
　　　　আধসের দুগ্ধ ঢালিয়া।
উদাস হৃদয়ে খাই একা
টিনের মাখন দিয়ে সেঁকা
　　　　রুটি-তোস্ শুধু খান তিন।
গোটা-দুই কলা খাই গুনে,
তারই সাথে বিলিতি-বেগুনে
　　　　কিছু পাওয়া যায় ভিটামিন।
মাঝে মাঝে পাই পুলিপিঠে,
পার করে দিই দু চারিটে
　　　　খেজুরগুড়ের সাথে মেখে।

পরিচে পেরাকি যবে আনে
আড়চোখে চেয়ে তার পানে
'পরে খাব' বলে দিই রেখে।
তারপর দুপুর অবধি
না ক্ষীর, না ছানা সর দধি,
ছুঁই নেকো কোফতা কাবাব।
নিজের এ দশা ভেবে ভেবে
বুক যায় সাত হাত নেবে,
কারে বা জানাই মনোভাব।

করছি নে exaggerate—
কিছু আছে সত্য নিরেট,
কবিত্ব সেও অল্প না।
বিরহ যে বুকে ব্যথা দাগে
সাজিয়ে বলতে গেলে লাগে
পনেরো আনাই কল্পনা।
অতএব এই চিঠি-পাঠে
পরান তোমার যদি ফাটে
খুব বেশি রবে না প্রমাণ।
চিঠির জবাব দেবে যবে
ভাষা ভরে দিয়ো হাহারবে
কবি-নাতনির রেখো মান।

পুনশ্চ

বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়
যদি কোনো নীতিবাদী কয়
কোস্ তারে, "অতিশয় উক্তি—
মসলার যোগে যথা রান্না,
আবদারে ছল ক'রে কান্না,
নাকিসুর-যোগে যথা যুক্তি।

ঝুমকোর ফুল ফোটে ডালে,
চোরেও চায় না কোনোকালে,
কানে ঝুমকোর ফুল দামি।
কৃত্রিম জিনিসেরই দাম,
কৃত্রিম উপাধিতে নাম,
জমকালো করেছি তো আমি।"
অতএব মনে রেখো দড়ো,
এ চিঠির দাম খুব বড়ো,
যে-হেতুক বাড়িয়ে বলায়
বাজারে তুলনা এর নেই—
কেবলই বানানো বচনেই
ভরা এ যে ছলায় কলায়।
পাল্লা যে দিবি মোর সাথে
সে ক্ষমতা নেই তোর হাতে,
তবুও বলিস প্রাণপণ
বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা—
ভুলিবে, হবে না অন্যথা,
দাদামশায়ের বোকা মন।
যা হোক, এ কথা চাই শোনা,
তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
না হয় না হলে কবিবর—
অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো,
তাহে তুমি বাড়িয়ো না স্বর।
যে ভাষায় কথা কয়ে থাক
আদর্শ তারে বলে নাকো,
আমার পক্ষে সে তো ঢের—
flatter করিতে যদি পার
গ্রাম্যতাদোষ যত তারো
একটু পাব না আমি টের।

শান্তিনিকেতন
৮ মাঘ, ১৩৪১

কাপুরুষ

নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিষ্থ,—
কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু,
জানিয়ো তো সেই সংখ্যাতত্ত্বনিধিকে,
ব্যর্থ যদি করেন তিনি বিধিকে,
পুরুষজাতির মুখ্যবিজয়কেতু
গুম্ফশ্মশ্রু ত্যজেন বিনা হেতু,
গণ্ডদেশে পাবেন ক্ষুরের শাস্তি
একটুমাত্র সংশয় তায় নাস্তি।
সিংহ যদি কেশর আপন মুড়োয়
সিংহী তারে হেসেই তবে উড়োয়।
কৃষ্ণসার সে বদ্‌খেয়ালে হঠাৎ
শিং জোড়াটা কাটে যদি পটাৎ
কৃষ্ণসারনি সইতে সে কি পারবে—
ছী ছি ব'লে কোন্ দেশে দৌড় মারবে।
উলটো দেখি অধ্যাপকের বেলায়—
গোঁফদাড়ি সে অসংকোচে ফেলায়,
কামানো মুখ দেখেন যখন ঘরনি
বলেন না তো 'দ্বিধা হও, মা ধরণী'।

গৌড়ী রীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা

লোকে তারে বলে নয়নের জলে,
　　“দাতা বটে ষোলো আনা।”

বিপুল ভোজনে মনের ওজনে
　　ছটাক যদি বা কমে
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
　　গালাগালি-বোল জমে।

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে,
　　খুঁজিয়া না পাবে চাবি—
পাওনা-যাচাই কঠিন বাছাই,
　　শেষ নাহি তার দাবি।

রুদ্ধ দুয়ার বহুমান তার
　　দ্বারীর প্রসাদে খোলে।
মুক্ত ঘরের মহা আদরের
　　মূল্য সবাই ভোলে।

সামনে আসিয়া নম্র হাসিয়া
　　স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ—
　　ধন্য ধন্য গৌড়।

অটোগ্রাফ

খুলে আজ বলি, ওগো নব্য,
নও তুমি পুরোপুরি সভ্য।
জগৎটা যত লও চিনে
ভদ্র হতেছ দিনে দিনে।
বলি তবু সত্য এ কথা—
বারো আনা অভদ্রতা

কাপড়ে-চোপড়ে ঢাক' তারে,
ধরা তবু পড়ে বারে বারে,
কথা যেই বার হয় মুখে
সন্দেহ যায় সেই চুকে।

ডেস্কেতে দেখিলাম, মাতা
রেখেছেন অটোগ্রাফ-খাতা।
আধুনিক রীতিটার ভানে
যেন সে তোমারই দাবি আনে।
এ ঠকানো তোমার যে নয়
মনে মোর নাই সংশয়।
সংসারে যারে বলে নাম
তার যে একটু নেই দাম
সে কথা কি কিছু ঢাকা আছে
শিশু ফিলজফারের কাছে।
খোকা বলে, বোকা বলে কেউ—
তা নিয়ে কাঁদ না ভেউ-ভেউ।
নাম-ভোলা খুশি নিয়ে আছ,
নামের আদর নাহি যাচ।
খাতাখানা মন্দ এ না গো
পাতা-ছেঁড়া কাজে যদি লাগ।
আমার নামের অক্ষর
চোখে তব দেবে ঠোক্কর।
ভাববে, এ বুড়োটার খেলা,
আঁচড়-পাঁচড় কাটে মেলা।
লজঞ্জুসের যত মূল্য
নাম মোর নহে তার তুল্য।
তাই তো নিজেরে বলি, ধিক্,
তোমারই হিসাব-জ্ঞান ঠিক।

বস্তু-অবস্তুর সেন্স্
খাঁটি তব, তার ডিফারেন্স্
পষ্ট তোমার কাছে খুবই—
তাই, হে লজঞ্চুস-লুভি,
মতলব করি মনে মনে,
খাতা থাক্ টেবিলের কোণে।
বনমালী কো-অপেতে গেলে
টফি-চকোলেট যদি মেলে
কোনোমতে তবে অন্তত
মান রবে আজকের মতো।
ছ বছর পরে নিয়ো খাতা,
পোকায় না কাটে যদি পাতা।

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ, ১৩৪৫

মাল্যতত্ত্ব

লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পো জ্বালা,—
লেগেছি প্রুফ-করেক্‌শনে গলায় কুন্দমালা।
ডেস্কে আছে দুই পা তোলা, বিজন ঘরে একা,
এমন সময় নাতনি দিলেন দেখা।

সোনার কাঠির শিহরলাগা বিশবছরের বেগে
আছেন কন্যা দেহে মনে পরিপূর্ণ জেগে।
হঠাৎ পাশে আসি
কটাক্ষেতে ছিটিয়ে দিল হাসি,
বললে বাঁকা পরিহাসের ছলে
"কোন্ সোহাগির বরণমালা পরেছ আজ গলে।"
একটু থেমে দ্বিধার ভানে নামিয়ে দিয়ে চোখ
বলে দিলেম, "যেই বা সে-জন হোক
বলব না তার নাম—
কী জানি, ভাই, কী হয় পরিণাম।

মানবধর্ম, ঈর্ষা বড়ো বালাই,
একটুতে বুক জ্বালায়।”
বললে শুনে বিংশতিকা, “এই ছিল মোর ভালে—
বুক ফেটে আজ মরব কি শেষকালে,
কে কোথাকার তার উদ্দেশে করব রাগারাগি
মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনি হতভাগি।”
আমি বললেম “কেনই বা দাও লাজ,
করোই-না আন্দাজ।”
বলে উঠল, “জানি, জানি, ঐ আমাদের ছবি,
আমারই বান্ধবী।
একসঙ্গে পাস করেছি ব্রাহ্ম-গার্ল্‌-স্কুলে,
তোমার নামে চোখ পড়ে তার ঢুলে।
তোমারও তো দেখেছি ওর পানে
মুগ্ধ আঁখি পক্ষপাতের কটাক্ষ সন্ধানে।”
আমি বললেম, “নাম যদি তার শুনবে নিতান্তই—
আমাদের ঐ জগা মালী, মৃদুস্বরে কই।”
নাতান বলে, “হায় কী দুরবস্থা,
বয়স হয়ে গেছে ব'লেই কণ্ঠ এতই সস্তা।
যে গলাটায় আমরা গলগ্রহ
জগামালীর মালা সেথায় কোন্ লজ্জায় বহ।”
আমি বললেম, “সত্য কথাই বলি,
তরুণীদের করুণা সব দিলেম জলাঞ্জলি।
নেশার দিনের পারে এসে আজকে লাগে ভালো,
ঐ যে কঠিন কালো।
জগার আঙুল মালা যখন গাঁথে
বোকা মনের একটা কিছু মেশায় তারই সাথে।
তারই পরশ আমার দেহ পরশ করে যবে
রস কিছু তার পাই যে অনুভবে।
এ-সব কথা বলতে মানি ভয়
তোমার মতো নব্যজনের পাছে মনে হয়—

এ বাণী বস্তুত
কেবলমাত্র উচ্চদরের উপদেশের ছুতো,
ডাইডাকৃটিক্ আখ্যা দিয়ে যারে
নিন্দা করে নতুন অলংকারে।
গা ছুঁয়ে তোর কই,
কবিই আমি, উপদেষ্টা নই।
বলি-পড়া বাকলওয়ালা বিদেশী ঐ গাছে
গন্ধবিহীন মুকুল ধরে আছে
আঁকাবাঁকা ডালের ডগা ধূসর রঙে ছেয়ে—
যদি বলি ওটাই ভালো মাধবিকার চেয়ে,
দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী,
ব্যঙ্গকুটিল দুর্বাক্য-চয়নী,
ভেবো না গো, পূর্ণচন্দ্রমুখী,
হরিজনের প্রপাগ্যাণ্ডা দিচ্ছে বুঝি উঁকি।
এতদিন তো ছন্দে-বাঁধা অনেক কলরবে
অনেকরকম রঙ-চড়ানো স্তবে
সুন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান—
আজকে যদি বলি 'আমার প্রাণ
জগামালীর মালায় পেল একটা কিছু খাঁটি',
তাই নিয়ে কি চলবে ঝগড়াঝাঁটি।"
নাতনি কহেন, "ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ কথা,
আমার মনে সত্যি লাগায় ব্যথা।
তোমার বয়স চারিদিকের বয়সখানা হতে
চলে গেছে অনেক দূরের স্রোতে।
একলা কাটাও ঝাপসা দিবসরাত্তি,
নাইকো তোমার আপন দরের সাথি।
জগামালীর মালাটা তাই আনে
বর্তমানের অবজ্ঞাভার নীরস অসম্মানে।"
আমি বললেম, "দয়াময়ী, ঐটে তোমার ভুল,
ঐ কথাটার নাইকো কোনো মূল।

জান তুমি, ঐ যে কালো মোষ
আমার হাতে রুটি খেয়ে মেনেছে মোর পোষ,
মিনি-বেড়াল নয় বলে সে আছে কি তার দোষ।
জগামালীর প্রাণে
যে জিনিসটা অবুঝভাবে আমার দিকে টানে
কী নাম দেব তার,
একরকমের সেও অভিসার।
কিন্তু সেটা কাব্যকলায় হয় নি বরণীয়,
সেই কারণেই কণ্ঠে আমার সমাদরণীয়।"
নাতনি হেসে বলে,
"কাব্যকথার ছলে
পকেট থেকে বেরোয় তোমার ভালো কথার থলি,
ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।"
আমি বললেম, "যদি কোনোক্রমে
জন্মগ্রহের ভ্রমে
ভালো যেটা সেটাই আমার ভালো লাগে দৈবে,
হয়তো সেটা একালেরও সরস্বতীর সইবে।"
নাতনি বলে, "সত্যি বলো দেখি,
আজকে-দিনের এই ব্যাপারটা কবিতায় লিখবে কি।"
আমি বললেম, "নিশ্চয় লিখবই,
আরম্ভ তার হয়েই গেছে সত্য করেই কই।
বাঁকিয়ো না গো পুষ্পধনুক-ভুরু,
শোনো তবে, এইমতো তার শুরু।—
'শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপজলে ধোওয়া'—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল,
এটা নেহাত অসাময়িক হল।
হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।

শূন্যসভায় যত খুশি করুন বাবুয়ানা,
সত্য হতে চান যদি তো বাহার-দেওয়া মানা।
তাছাড়া ঐ পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সে দন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে।'
তার পরেকার বর্ণনা এই—'তামাক-সাজার ধন্দে
জগার থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
দিনরাত্রি ল্যাপা।
তাই সে জগা খ্যাপা
যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ।' "
নাতনি বললে বাধা দিয়ে, "আমি জানি জানি,
কী বলে যে শেষ করেছ নিলেম অনুমানি।
যে তামাকের গন্ধ ছাড়ে মালার মধ্যে, ওটায়
সর্বসাধারণের গন্ধ নাড়ীর ভিতর ছোটায়।
বিশ্বপ্রেমিক, তাই তোমার এই তত্ত্ব—
ফুলের গন্ধ আলংকারিক, এ গন্ধটাই সত্য।"
আমি বললেম, "ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই,
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্‌টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।"

নাতনি আমার ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে
এক দৌড়ে চলে গেল আমার আশা ছেড়ে।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

সংযোজন

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু[১] মেরা,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পত্রিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনা-ভর্ কুছ খবর মিলে না ইয়ে তো নহি আচ্ছা।
টপাল্,[২] টপাল্, কঁহা টপাল্‌রে, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল বেলাতে নাহি মিলতা টপাল্‌কো নাম গন্ধ!
ঘরকো যাকে কায়কো বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে ফর্‌খৎ।
দো-চার কলম লীখ্ দেওঙ্গে ইস্‌মে ক্যা হয় হর্‌কৎ!
প্রবাসকো এক সীমা পর হম্ বৈঠ্‌কে আছি একলা—
সুরিবাবাকো বাস্তে আঁখ্‌সে বহুৎ পানি নেক্‌লা।
সর্বদা মন কেমন কর্‌তা, কেঁদে উঠ্‌তা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেনবাবু নির্দয়!
মন্‌কা দুঃখে হুহু কর্‌কে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি বহিন বাই,[৩]
কী করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!
বহুৎ জোরসে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্গুলি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজ্‌না বাজাতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিম্‌টি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জজসাহেব[৪] কুছ বোল্‌তা নহি রক্ষা করবে কেটা,
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজসাহেবকি বেটা!

১ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২ চিঠির ডাক।
৩ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
৪ অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথের পিতা।

গাড়ি চড়্‌কে লাঠিন পড়কে তুম্ তো যাতা ইস্কিল্,
ঠোঁটে নাকে চিম্‌টি খাকে হমারা বহুৎ মুস্কিল!
এদিকে আবার party হোতা খেল্‌নেকোবি যাতা,
জিম্‌খানামে হিম্‌ঝিম্ এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সমজে না তো হম্‌রা দুরাবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ merry খিল্‌খিল্ কর্কে হাস্তা!
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম,
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

পত্র

সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব
লয়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে;
গ্রহতারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে;
হাঁকায়ে দু-চারিজোড়া
তাজা পক্ষিরাজ-ঘোড়া
কলপনা গগনভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশকাল যায় লঙ্ঘি,
কোথা প'ড়ে থাকে এ মেদিনী।
সেই তুমি ব্যোমচারী
আকাশ-রবিরে ছাড়ি
ধরার রবিরে কর মনে—
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতির্হীন মর্ত্যবাসী জনে।

ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ,
দূরবীন ভ্রষ্টলক্ষ্য,
কোথা হতে কোথায় পতন।
ত্যজি দীপ্ত ছায়াপথে
পড়িয়াছ কায়াপথে—
মেদ-মাংস মজ্জা-নিকেতন।

বিধি বড়ো অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে—
তবু তো ক্ষণেকতরে
ধূলিময় খেলাঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে।
তুমি অদ্য কাশীবাসী,
সম্প্রতি লয়েছ আসি
বাবা ভোলানাথের শরণ;
দিব্য নেশা জমে ওঠে,
দু বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূমোপকরণ।
জেগে উঠে মহানন্দ
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ,
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম—
পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইস্টাম্পের দাম।
আমার সে কর্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা-দেবী চেপেছেন বক্ষে—

সহজেই দম কম
তাহে লাগাইলে দম
কিছুতে রবে না আর রক্ষে।
নাহি গান, নাহি বাঁশি,
দিনরাত্রি শুধু কাশি,
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে;
নবরস কবিত্বের
চিত্তে ছিল জমা ঢের,
বহে গেল সর্দির প্রবাহে।
অতএব নমোনম,
অধম অক্ষমে ক্ষম,
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে—
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বলো পারিবে তোমা-সনে।

বনক্ষেত্র, শিমলাশৈল
শনিবার, ১৮৯৮

সুসীম চা-চক্র

শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষ্যে

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে!
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে

এল চীন-গগন হতে
পূর্বপবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণবাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে !

এস পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী,
এস গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূবিবরণ ভাণ্ডারী।
এস বিশ্বভার-নত
শুষ্ক-রুটিনপথ
মরুপরিচারণ ক্লান্ত !
এস হিসাব'পত্তর'ত্রস্ত
তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে !

এস গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতালতলমগ্ন,
এস চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এস কনস্‌টিট্যুশন
নিয়ম-বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত,

এস কমিটি-পলাতক
বিধানঘাতক
এস দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে।

[শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩৩১]

চাতক

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন চা-চক্রে আহূত
অতিথিগণের প্রতি

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীর শাস্ত্র গিরিশিরে!
তিয়াষিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে!

পাণিনিরসপানের বেলা দিয়েছে এরা ফাঁকি,
অমরকোষ-ভ্রমর এরা নহে।
নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি,
গৌড়পাদ-পাদপে নাহি রহে।

অনুস্বরে ধনুঃশর-টংকারের সাড়া
শঙ্কা করি দূরে দূরেই ফেরে।
শঙ্কর-আতঙ্কে এরা পালায় বাসাছাড়া,
পালি ভাষায় শাসায় ভীরুদেরে।

চা-রস ঘন শ্রাবণধারাপ্লাবন-লোভাতুর
কলাসদনে চাতক ছিল এরা—
সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে এ কী সুর,
চকোর-বেশে বিধুরে কেন ঘেরা

নিমন্ত্রণ

প্রজাপতি যাঁদের সাথে
পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির
ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদরায়ণ উদার ক্ষেত্রে
মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক
নানারসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের
ডেকেছিলেন দক্ষ
অনাহুত পড়ল এসে
মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে ভুল করব না তো,
মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত
দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজো যাঁরা বাঁধন-ছাড়া
ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের
আশিস লক্ষ লক্ষ—
"তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে
জুটুন কারাধ্যক্ষ।"
এর পরে আর মিল মেলে না
য র ল ব হ ক্ষ।

[? ১৯২৮]

নাতবউ

অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত
স্বপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।
দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে।

সযতনে যবে সূর্যমুখীর অর্ঘ্যটি
আনে নিশান্তে, সেও নিতান্ত মন্দ না।
এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি
মুখরিত করি তানে মানে করে বন্দনা।
তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে
থালাখানি যবে ভরি স্বরচিত পিষ্টকে
মোদক-লোভিত মুগ্ধ নয়ন নন্দে সে।

প্রভাতবেলায় নিরালা নীরব অঙ্গনে
দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে।
দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি-রঙ্গনে,
সাজি সাজাইছে গোলাপে জবায় চম্পাতে।
আরো সে করুণ তরুণ তনুর সংগীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেশনের ভঙ্গীতে,
স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে।

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত—
মালতীজড়িত বঙ্কিম বেণীভঙ্গিমা?
দ্রুত-অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝংকৃত?
শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা?

পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তার লজ্জিত ?
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত ?
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে ?

দার্জিলিং
বিজয়া দ্বাদশী, ১৬ আশ্বিন ১৩৩৮

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা।
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয় তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে।
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন-অন্তে,
বহুত তবু রইল বাকি মনটাতে—
এমনি করেই দেব্‌তা পাঠান ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে।
সে বর তাঁহার বহন করল যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই—
রঙিন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই।

হেন গুমর নেইকো আমার, স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়,
জানি নে তো কোন্ খেয়ালের ক্রূর কটাক্ষে
কখন বজ্র হানতে পার অত্যাশায়

দ্বিতীয়বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন না হয় কমল,
গাছ মরে যায় থাকে তাহার টবটা তো
জোয়ারবেলায় কানায় কানায় যে জল জমল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটা তো।
অনেক হারাই, তবু যা পাই জীবনযাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি।
রইল আশা, থাকবে ভরা খুশির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃস্মৃতি।

বলবে তুমি, 'বালাই! কেন বকছ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।'
বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইকো চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।
অকল্যাণের কথা কিছু লিখনু অত্র,
বানিয়ে-লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টমি।

১ জুন, ১৯৩৫

নামকরণ

দেয়ালের ঘেরে যারা
গৃহকে করেছে কারা,
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ,

গুরুভজা বাঁধা বুলি
যাদের পরায় ঠুলি,
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ,
যাহা কিছু আজগুবি
বিশ্বাস করে খুবই,
সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতোনাতা
সকলই পাথরে গাঁথা,
তাহাদেরই বলা চলে দেয়ালি।

আলো যার মিট্‌মিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে-ঝাপে
স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,
খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করে মিছে,
সব-তাতে দাঁত খিঁচে,
তারে নাম দিব খ্যাক্‌শেয়ালি।

দিনখাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরাম-কেদারা যদি মেলে—
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসে খেলে—

দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদসভা,
আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই—
ঠিক সুরে তার বাঁধা,
মূলতানে তান সাধা,
নাম দিতে পারি তবে কেদারি।

শান্তিনিকেতন
৭ মার্চ, ১৯৩৯

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটবুকে এগিয়ে আনে; অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজিস্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি;
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি।

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান—
ভাঙন কিন্তু আর্টিস্টিক; কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হত দেব্‌তাদিগের পক্ষে।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হত মিঠা
নিষ্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া—
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া।

ধাক্কা মারেন সেক্রেটরি, নয় মেনকা-রম্ভা—
রিয়লিস্‌টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা—
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু, জানি, ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ—
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূলহস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম।

রেলেটিভিটি

তুলনায় সমালোচনাতে
জিভে আর দাঁতে
লেগে গেল বিচারের দ্বন্দ্ব,
কে ভালো কে মন্দ।
বিচারক বলে হেসে,
দাঁতজোড়া কী সর্বনেশে
যবে হয় দেঁতো।
কিন্তু, সে সুধাময় লোকবিশেষে তো
হাসিরশ্মিতে,
যাহারে আদরে ডাকি 'অয়ি সুস্মিতে'
পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে।

জিহ্বায় রস খুব জমে,
অথচ তাহার সংস্রবে
দেহখানা যবে
আগাগোড়া উঠে জ্বলি
রস নয়, বিষ তারে বলি।

স্বভাবে কঠিন কেহ, মেজাজে নরম—
বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম।

প্রকাশ্যে এক রূপ যার
ঘোমটায় আর।
তুলনায় দাঁত আর জিভ
সবই রেলেটিভ।
হয়তো দেখিবে, সংসারে
দাঁতালো যা মিঠে লাগে তারে,
আর যেটা ললিত রসালো
লাগে নাকো ভালো।
সৃষ্টিতে পাগলামি এই—
একান্ত কিছু হেথা নেই।

ভালো বা খারাপ লাগা
পদে পদে উলোটা-পালোটা—
কভু সাদা কালো হয়,
কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাবো যদ্যপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৩০।১২।৩৮ সকাল

নারীর কর্তব্য

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ;
খাওয়া-ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষরাতে জাগে;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিয়ে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা;

মাজা-ঘষা শেষ করে আঙিনায় ছোটে—
ধড়্‌ফড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজামুড়ো জাপটিয়ে ধ'রে
সুনিপুণ কবজির জোরে,
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে ব'সে,
কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে।
কুটিকুটি বানায় ইঁচোড়;
চাকা চাকা করে থোড়,
আঙুলে জড়ায় তার সুতো;
মোচাগুলো ঘস্ ঘস্ কেটে চলে দ্রুত;
চালতারে
বিশ্লেষণ করে খরধারে।
বেগুন পটোল আলু খণ্ড খণ্ড হয় সে অগুন্তি।
তারপরে হাতা বেড়ি খুন্তি;
তিন-চার দফা রান্না সে
নানা ফরমাশে—
আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা রুগির কোনোটা,
সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা, কোনোটা বা মোটা।
যবে পাবে ছুটি
বেলা হবে আড়াইটা। বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
পান-দোক্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম;
ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম,
বলবে "বজ্জাত ভারি"।
তার পরে রাত্রে হবে রুটি আর বাসি তরকারি।

জনার্দন ঠাকুরের
পানাপুকুরের
পাড়ের কাছটা ঢাকা কলমির শাকে।
গা ধুয়ে তাহারই এক ফাঁকে,

ঘড়া কাঁখে, গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি
ঘন ঘন হাত নাড়ি
খস্‌খস্‌-শব্দ-করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
রাম নাম জপি মনে মনে
ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
গোধূলির ছম্‌ছমে অন্ধকারছায়ে।
সন্ধ্যেবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে,
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি-আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়াপ্রতিবেশিনীর— কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
ও-পাড়ার বোসগিন্নি; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

কাপড়ে-জড়ানো পুঁথি কাঁখে
তিলক কাটিয়া নাকে
উপস্থিত আচার্যি মশায়—
গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়,
আটক পড়েছে তার বিয়ে;
তাহারই ব্যবস্থা নিয়ে
স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
কর্তারে লুকিয়ে তারই খরচের হল বন্দোবস্ত।

এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুজ্যেমশা'র অনুমত—
কলহে ও নামজপে, ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজে,
নেশাখোর ব্রাহ্মণের ভোজে।

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।

নূতন বই কি চাই। নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশন্যাল কাল্‌চারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি-এ এম-এ পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়ীরে করে হেলা;
বসন্তের টিকা নেয়; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে'
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।

তবু আজও রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।
মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে-রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।
কিন্তু, যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় ক'রে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী
এই ফল তারই।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে।

বুঝি নে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।

ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।
সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা।

বেস্পতিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা।

মধুসন্ধায়ী

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পার ডাকে,
বিলাতি সুগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
'গুড়ং দদ্যাৎ' বাণী বলে কবিরাজে।
দায়ে পড়ে তাই
লুচি-পাঁউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই;
বিমর্ষমুখে বলি 'গুড়ং দদ্যাৎ',
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পদ্যাৎ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিশ্বাস ফেলে বলে, সকলই অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য।
গৌড়ী গদ্য হতে মধুময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য।

১৩ ফাল্গুন, ১৩৪৬

২

তল্লাস করেছিনু, হেথাকার বৃক্ষের
চারিদিকে লক্ষণ মধু-দুর্ভিক্ষের।
মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠাণ্ডার,
সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভাণ্ডার—
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে।
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে।
তবু কাল মধু-লাগি করেছিনু দরবার,
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবি করবার।
মৌচাক-রচনায় সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই,
জাস্তি না মেলে তবু খুশি রব থোড়াতেই।
তাও কভু সম্ভব না হয় যদিস্যাৎ
তা হলে তো অবশেষে শুধু গুড় দদ্যাৎ।
অনুরোধ না মিটুক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
দুর্লভ হলে মধু গুড় হয় লোভনীয়।
মধুতে যা ভিটামিন কম বটে গুড়ে তা,
পূরণ করিয়া লব টমেটোয় জুড়ে তা।
এইভাবে করা ভালো সন্তোষ-আশ্রয়—
কোনো অভাবেই কভু তার নাহি নাশ রয়।

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

৩

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা—
আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্ণে পরাহ্ণে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে;
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে।

যে দাক্ষিণ্য-উৎস হতে উৎসারিত এই মধুরতা
রসনার রসযোগে অন্তরে পশিবে তার কথা।
ভেবেছিনু, অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
সস্নেহ আঘাত দেবে তোমারে আমার পরিহাস ;
তখন তো জানি নাই, গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি।
দেখিনু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে ;
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ-দানে।

৫ মার্চ, ১৯৪০

৪

দূর হতে কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
কমলাকানন তব না হউক শূন্য।
গিরিতটে সমতটে
আজি তব যশ রটে,
আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দানপুণ্য।
তোমাদের বনময়
অফুরান যেন রয়
মৌচাক-রচনায় চিরনৈপুণ্য।
কবি প্রাতরাশে তার
না করুক মুখভার,
নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ণ।'
আরবার কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য।
রুটি বলে জয়-জয়,
লুচিও যে তাই কয়,
মধু যে ঘোষণা করে তোমারই তারুণ্য।'

৭ মার্চ, ১৯৪০

মাছিতত্ত্ব

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে
আজন্ম ধ্যানী সে।
সাধনের মন্ত্র তাহার
ভন্‌ভন্‌-ভন্‌ভন্‌কার।
সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ—
দক্ষিণ-বাম আর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য—
কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
দ্বৈতবিহীন হয় বিশ্ব।
সুগন্ধ পচা-গন্ধের
ভালো মন্দের
ঘুচে যায় ভেদবোধ-বন্ধন;
এক হয় পঙ্ক ও চন্দন।
অঘোরপন্থ সে যে শবাসন-সাধনায়
ইঁদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই—
বসে রয় স্তব্ধ,
মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ।
ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য দীপ্তি
ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি।
লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব,
ভুলে যায় মাছিত্ব।

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত-
বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
হার না মানিতে চায় কভু ও।

পৃথক করে না কভু ইষ্ট অনিষ্ট,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ;
সমবুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট।
সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত;
পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত।
এদের ভাষায় নেই 'ছি ছি',
শৌখিন রুচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিছিমিছি।

অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে;
কেবলই ঘুরিয়া দেখে কোথায় যে কী আছে।
বিশ্রামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,
ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলো কে-ই!

চারিদিকে মানবের বিষম অহংকার,
তারই মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শঙ্কার।
আকাশবিহারী তার গতিনৈপুণ্যেই
সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই।
এই তার বিজ্ঞানী কৌশল,
স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।
মানুষের মারণের লক্ষ্য
ক্ষিপ্র এড়ায়ে যায় নির্ভয়পক্ষ।
নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়—
কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয়।
ভন্‌-ভন্‌-ভন্‌কার
আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডঙ্কার।

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত—
বার বার তাড়া খেয়ো, নাহি হোয়ো ক্ষান্ত।

অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ
কখন অকস্মাৎ—
তবু মনে রেখো নির্বন্ধ,
সুযোগের পেলে নামগন্ধ
চ'ড়ে ব'সো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,
ক'রো তারে বিষম অতিষ্ঠ।
সার্থক হতে চাও জীবনে,
কী শহরে, কী বনে,
পাঠ লহ প্রয়োজনসিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিদ্বের—
নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্ ভন্‌ভন্
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

কালান্তর

তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে
যতই আমি নাবছি
আমায় মনে আছে কিনা
ভয়ে ভয়ে ভাবছি।
কথা পাড়তে গিয়ে দেখি,
হাই তুললে দুটো;
বললে উস্‌খুস্ করে,
"কোথায় গেল সুটো।"
ডেকে তারে বলে দিলে,
"ড্রাইভারকে বলিস,
আজকে সন্ধ্যা নটার সময়
যাব মেট্রোপলিস।"
কুকুরছানার ল্যাজটা ধরে
করলে নাড়াচাড়া;

বললে আমায়, "ক্ষমা করো,
যাবার আছে তাড়া।"

তখন স্পষ্ট বোঝা গেল,
নেই মনে আর নেই।
আরেকটা দিন এসেছিল
একটা শুভক্ষণেই—
মুখের পানে চাইতে তখন,
চোখে রইত মিষ্টি;
কুকুরছানার ল্যাজের দিকে
পড়ত নাকো দৃষ্টি।
সেই সেদিনের সহজ রঙটা
কোথায় গেল ভাসি;
লাগল নতুন দিনের ঠোঁটে
রুজ-মাখানো হাসি।
বুটসুদ্ধ পা-দুখানা
তুলে দিলে সোফায়;
ঘাড় বেঁকিয়ে ঠেসেঠুসে
ঘা লাগালে খোঁপায়।
আজকে তুমি শুকনো ডাঙায়
হালফ্যাশানের কূলে,
ঘাটে নেমে চমকে উঠি
এই কথাটাই ভুলে।

এবার বিদায় নেওয়াই ভালো,
সময় হল যাবার—
ভুলেছ যে ভুলব যখন
আসব ফিরে আবার।

শান্তিনিকেতন
১৩ শ্রাবণ, ১৩৪৭

তুমি

ঐ ছাপাখানাটার ভূত,
আমার ভাগ্যবশে তুমি তারি দূত।
দশটা বাজল তবু আস নাই ;
দেহটা জড়িয়ে আছে আরামের বাসনাই ;
মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে—
পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
ঘাটে নাই। কাব্যের দধিটা
বেশ করে জমে গেছে, নদীটা
এইবার পার ক'রে প্রেসে লও,
খাতার পাতায় তারে ঠেসে লও।
কথাটা তো একটুও সোজা নয়,
স্টেশন-কুলির এ তো বোঝা নয়।
বচনের ভার ঘাড়ে ধরেছি,
চিরদিন তাই নিয়ে মরেছি ;
বয়স হয়েছে আশি, তবুও
সে ভার কি কমবে না কভুও।

আমার হতেছে মনে বিশ্বাস—
সকালে ভুলাল তব নিশ্বাস
রান্নাঘরের ভাজাভুজিতে,
সেখানে খোরাক ছিলে খুঁজিতে,
উতলা আছিল তব মনটা,
শুনতে পাও নি তাই ঘণ্টা।

শুঁটকিমাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক।

তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা।
সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া-গর্বের মোক্ষণ।
রৌদ্র যেতেছে চড়ে আকাশে,
কাঁচা ঘুম ভেঙে মুখ ফ্যাকাশে।
ঘন ঘন হাই তুলে গা-মোড়া,
ঘস্‌ঘস্‌ চুলকোনো চামোড়া।
আ-কামানো মুখ ভরা খোঁচাতে—
বাসি ধুতি, পিঠ ঢাকা কোঁচাতে
চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো,
আলুথালু চুলে নাই পোমাটো।
বাসি মুখে চা খাচ্ছ বাটিতে,
গড়িয়ে পড়ছে ঘাম মাটিতে।
কাঁকড়ার চচ্চড়ি রাত্রে,
এঁটো তারি পড়ে আছে পাত্রে।
‘সিনেমার তালিকার কাগজে
কে সরাল ছবি’ ব’লে রাগো যে।

যত দেরি হতেছিল ততই যে
এই ছবি মনে এল স্বতই যে।
ভোরে ওঠা ভদ্র সে নীতিটা,
অতিশয় খুঁতখুঁতে রীতিটা।
সাফ্‌সোফ বুর্জোয়া অঙ্গেই
ধব্‌ধবে চাদরের সঙ্গেই
মিল তার জানি অতিমাত্র—
তুমি তো নও সে সৎ-পাত্র।
আজকাল বিড়িটানা শহুরে
যে চাল ধরেছ আটপহুরে,

মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানে-হীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য।

শান্তিনিকেতন
৪ অগস্ট, ১৯৪০

মিলের কাব্য

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার,
গদ্য কাব্যে এই জীবনটা হ'ত একাকার।
প্রোটন এবং ইলেকট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল।
কারণ তিনি তপস্বী যে বিশ্ব তাঁহার জ্ঞানে,
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে।
সৃষ্টিকার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্ত কাল ধুয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বাঁধার।
জাগরণে আছেন তিনি শুদ্ধ জ্যোতির দেশে,
আলো-আঁধার 'পরে তাঁহার স্বপ্ন বেড়ায় ভেসে।
যারে বলি বাস্তব সে ছায়ার লিখন লিখা,
অন্তবিহীন কল্পনাতে মহান মরীচিকা।
বাস্তব যে অচল অটল বিশ্বকাব্যে তাই,
তড়িৎকণার নৃত্য আছে বাস্তব তো নাই।
গোলাপগুলোর পাপড়ি-চেয়ে শোভাটাই যে সত্য,
কিন্তু শোভা কী পদার্থ কথায় হয় না কথ্য।

বিশুদ্ধ ইঙ্গিত সে মাত্র, তাহার অধিক কী সে,
কিসের বা ইঙ্গিত সে জিনিস, ভেবে কে পায় দিশে।
নিউস্‌পেপার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য,
মকদ্দমার দলিল আছে ঠিক কথাটার সাক্ষ্য।
কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর—
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।
আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা।
ফোটা-ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
সত্য রূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।
ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গন্ধ কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘুমে।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
১৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সন্ধ্যা

লিখি কিছু সাধ্য কী

লিখি কিছু সাধ্য কী!
যে দশা এ অভাগার লিখিতে সে বাধ্য কি।
মশা-বুড়ি মরেছিল চাপড়ের যুদ্ধে সে—
পরলোকগত তার আত্মার উদ্দেশে
আমারি লেখার ঘরে আজি তার শ্রাদ্ধ কি!
যেথানে যে কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন
অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন—

আমারি চরণজাত তাহাদের খাদ্য কি!
বাঁশি নেই, কাঁসি নেই, নাহি দেয় হাঁক সে,
পিঠেতে কাঁপাতে থাকে এক-জোড়া পাখ সে—
দেখিতে যেমনি হোক তুচ্ছ সে বাদ্য কি।
আশ্রয় নিতে চাই মেলে যদি shelter,
এক ফোঁটা বাকি নেই নেবুঘাস-তেলটার—
মশারি দিনের বেলা কভু আচ্ছাদ্য কি!
গাল তারে মিছে দিই অতি অশ্রাব্য,
হাতে পিঠ চাপড়াব সেটা যে অভাব্য—
এ কাজে লাগাব শেষে চটি-জোড়া পাদ্য কি।
পুজোর বাজারে আজি যদি লেখা না জোটাই,
দুটো লাইনেরো মতো কলমটা না ছোটাই—
সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ কি।

মশকমঙ্গলগীতিকা

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা—
জানিতাম দীনতার এই শেষ দশা,
আমি স্বপ্নে দেখিলাম হয়ে গেছি মশা!
কী হল যে দশা—
মধ্যরাত্রে স্বপ্নে আমি
হয়ে গেছি মশা।
দীন হতে দীন আমি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ—
একমাত্র নাম জপ করেছি ভরসা।

হিংস্র নীতি নাহি আর,
অতি শান্ত নির্বিকার

ভক্তের নাসাগ্র-'পরে স্তব্ধ হয়ে বসা—
কী হল যে দশা!

মধুর মাধবী বেণু নীরব সহসা।
পাখা করি নাড়াচাড়া,
ভোঁ ভোঁ শব্দে নাই সাড়া—
শুধু 'রাম রাম' ধ্বনি ডানা হতে খসা,
হেন হীন দশা।

জোড়াসাঁকো
৩০।১০।৪০

আকাশপ্রদীপ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
কল্যাণীয়েষু

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি! তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশপ্রদীপ

গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।
মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।
পাণ্ডু-আঁধার বিদায়রাতের শেষে
যে তাকাত শিশিরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

[শান্তিনিকেতন]
২৪।৯।৩৮

আকাশপ্রদীপ

ভূমিকা

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।
এই দাবি
জীবনের এ ছেলেমানুষি,
মরণেরে বঞ্চিবার ভান ক'রে খুশি,
বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার শখ,
তাই মন্ত্র প'ড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক।
কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে।
"রহিল" বলিয়া যায় অদৃশ্যের পানে;
মৃত্যু যদি করে তার প্রতিবাদ, নাহি আসে কানে।
আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয়দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

[শান্তিনিকেতন]
১৬।৩।৩৯

যাত্রাপথ

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে।
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,

হিসাব কিছু না থাক্ নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি,
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।
শক্ত সহজ এ সংসারটা যাহার লেখা বই
হালকা ক'রে বুঝিয়ে সে দেয় কই।
বুঝছি যত খুঁজছি তত, বুঝছি নে আর ততই—
কিছু বা হাঁ, কিছু বা না, চলছে জীবন স্বতই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা।
আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট
দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।
মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে।
অনেক কথা হয় নি তখন বোঝা,
যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—
ভালোমন্দে লড়াই অনিঃশেষ,
প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার দ্বেষ।
বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ
সামনে এল, রইনু বসে চুপ।

শুরু হতে এইটে গেল বোঝা,
হয়তো বা এক বাঁধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা,
যখন-তখন হঠাৎ সে যায় ঠেকে,
আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম এঁকেবেঁকে।
সব-জানা দেশ এ নয় কভু, তাই তো তেপান্তরে
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে।

সদাগরের পুত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন্ সাত-রাজা-ধন গোপন মানিকটার।
কোটালপুত্র খোঁজে এমন গুহায়-থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাঁধন-ডোর।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭

স্কুল-পালানে

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।
পুরোনো আমড়াগাছ হেলে আছে
পাঁচিলের কাছে,
দীর্ঘ আয়ু বহন করিছে তার
পুঞ্জিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্তবর্ষার।
লোভ করি নাই তার ফলে,
শুধু তার তলে
সে সঙ্গরহস্য আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে।
পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম
জানি না তাহার কোনো নাম;
হয়তো সে আদিম প্রাণের
আতিথ্যদানের
নিঃশব্দ আহ্বান,
যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে

মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।
সেই মৌনী বনস্পতি
সুবৃহৎ আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিতগতি
সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
মাটিতে বাতাসে,
লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
তেজের ভোজের পানালয়ে।
বিনা কাজে আমিও তেমনি বসে থাকি
ছায়ায় একাকী,
আলস্যের উৎস হতে
চৈতন্যের বিবিধ দিগ্বাহী স্রোতে
আমার সম্বন্ধ চরাচরে
বিস্তারিছে অগোচরে
কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
দূর দেশে দূর কালে।
প্রাণে মিলাইতে প্রাণ
সে বয়সে নাহি ছিল ব্যবধান;
নিরুদ্ধ করে নি পথ ভাবনার স্তূপ;
গাছের স্বরূপ
সহজে অন্তর মোর করিত পরশ।
অনাদৃত সে বাগান চায় নাই যশ
উদ্যানের পদবীতে।
তারে চিনাইতে
মালীর নিপুণতার প্রয়োজন কিছু ছিল নাকো।
যেন কী আদিম সাঁকো
ছিল মোর মনে
বিশ্বের অদৃশ্য পথে যাওয়ার আসার প্রয়োজনে।

কুলগাছ দক্ষিণে কুয়োর ধারে,
পুবদিকে নারিকেল সারে সারে,

বাকি সব জঙ্গল আগাছা।
একটা লাউয়ের মাচা
কবে যত্নে ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে।
বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে
পাতাশূন্য ডাল
অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো। বাঁধানো চাতাল;
ফাটাফুটো মেঝে তার, তারি থেকে
গরিব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে।
পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া
কালের লেখনি-টানা নানামতো ছবির ইঙ্গিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গীতে।
সদ্য ঘুম থেকে জাগা
প্রতি প্রাতে নূতন করিয়া ভালো-লাগা
ফুরাত না কিছুতেই।
কিসে যে ভরিত মন সে তো জানা নেই।
কোকিল দোয়েল টিয়ে এ বাগানে ছিল না কিছুই,
কেবল চড়ুই,
আর ছিল কাক।
তার ডাক
সময় চলার বোধ
মনে এনে দিত। দশটা বেলার রোদ
সে ডাকের সঙ্গে মিশে নারিকেল-ডালে
দোলা খেত উদাস হাওয়ার তালে তালে।
কালো অঙ্গে চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গী, চাতুরী সতর্ক আঁখিকোণে,
পরস্পর ডাকাডাকি ক্ষণে ক্ষণে—
এ রিক্ত বাগানটিরে দিয়েছিল বিশেষ কী দাম।
দেখিতাম, আবছায়া ভাবনায় ভালোবাসিতাম।

[শান্তিনিকেতন]
১৪।১০।৩৮

ধ্বনি

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া,
চারিদিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা স্বরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।
বালকের মনের অতলে দিত আনি
পাণ্ডুনীল আকাশের বাণী
চিলের সুতীক্ষ্ণ সুরে
নির্জন দুপুরে,
রৌদ্রের প্লাবনে যবে চারিধার
সময়েরে করে দিত একাকার
নিষ্কর্ম তন্দ্রার তলে।
ওপাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহকোলাহলে
মনেরে জাগাত মোর অনির্দিষ্ট ভাবনার পারে
অস্পষ্ট সংসারে।
ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে-সকল অলিগলি
জানি নি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগদাদের বসোরার
পরদেশী পসরার
স্বপ্ন এনে দিত বহি।
রহি রহি
রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ডাক উর্ধ্বস্বরে,
অন্তরে অন্তরে
দিত সে ঘোষণা কোন্ অস্পষ্ট বার্তার,
অসম্পন্ন উধাও যাত্রার।
একঝাঁক পাতি হাঁস
টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চকলভাষ

পুকুরে পড়িত ভেসে।
বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতার-কাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাত আলোর কিলিবিলি।
বেলা হলে
হলদে গামছা কাঁধে হাত দোলাইয়া যেত চলে
কোন্‌খানে কে যে।
ইস্কুলে উঠিত ঘণ্টা বেজে।
সে ঘণ্টার ধ্বনি
নিরর্থ আহ্বানঘাতে কাঁপাইত আমার ধমনী।
রৌদ্রক্লান্ত ছুটির প্রহরে
আলস্যে-শিথিল শান্তি ঘরে ঘরে;
দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীরমন্দ্রিত হাঁক হেঁকে
বাষ্পশ্বাসী সমুদ্র-খেয়ার ডিঙা
বাজাইত শিঙা,
রৌদ্রের প্রান্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী।
বাতায়নকোণে
নির্বাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।
জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কভু অকস্মাৎ

কভু মৃদুবেগে ধীরে
ধ্বনিরূপে মোর শিরে
স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।
চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।
যেথা আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

[শান্তিনিকেতন]
২১।১০।৩৮

বধূ

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে—
ভাবখানা মনে আছে—"বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"

বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনীগানে

ছন্দের লাগাল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।
ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে-গলি বাহিয়া
চিহ্নিত করেছে মোর হিয়া
গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় এঁকেবেঁকে।
তারি প্রান্ত থেকে
অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে।
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
পথ শেষ হবে না কভুও।

সেকাল মিলাল। তার পরে, বধূ-আগমনগাথা
গেয়েছে মর্মরছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা;
বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে;
মধ্যাহ্নে করুণ রাগিণীতে
বিদেশী পান্থের শ্রান্ত সুরে।
অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে
তন্দ্রায় প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি
মৃদু রণরণি।
ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে,
পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
দিয়েছিল দেখা
অনাগত চরণের অলক্তের রেখা।
কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধ'রে—
সচকিতে
দেখে তবু পাই নি দেখিতে।

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ ;
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে !"
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ ;
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চির-পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"

[শান্তিনিকেতন]
২৫।১০।৩৮

জল

ধরাতলে
চঞ্চলতা সব-আগে নেমেছিল জলে।
সবার প্রথম ধ্বনি উঠেছিল জেগে
তারি স্রোতোবেগে।
তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল
কলোল্লোলে উদ্বেল উচ্ছল
শৃঙ্খলিত ছিল স্তব্ধ পুকুরে আমার,
নৃত্যহীন ঔদাসীন্যে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তার।
গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ডোবা,
প্রাণ হোথা বোবা।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে ওখানে রয়েছে পর্দা টানা,
ওইখানে কালো বরনের মানা।
ঘটনার স্রোত নাহি বয়,
নিস্তব্ধ সময়।
হোথা হতে তাই মনে দিত সাড়া
সময়ের বন্ধ-ছাড়া
ইতিহাস-পলাতক কাহিনীর কত
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি নানামতো।
উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।
নাগকন্যা মানিকদর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী
ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে
যখন বিকেলে হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে।
তীরে যত গাছপালা পশুপাখি
তারা আছে অন্যলোকে, এ শুধু একাকী।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ,
কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ।

তার পরে মনে হল একদিন,
সাঁতারিতে পেল যারা পৃথিবীতে তারাই স্বাধীন,
বন্দী তারা যারা পায় নাই।
এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই
ভূমির নিষেধগণ্ডি হতে পার।
অনাত্মীয় শত্রুতার

সংশয় কাটিল ধীরে ধীরে,
জলে আর তীরে
আমারে মাঝেতে নিয়ে হল বোঝাপড়া।
আঁকড়িয়া সাঁতারের ঘড়া
অপরিচয়ের বাধা উত্তীর্ণ হয়েছি দিনে দিনে,
অচেনার প্রান্তসীমা লয়েছিনু চিনে।
পুলকিত সাবধানে
নামিতাম স্নানে,
গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
ধরিত জড়ায়ে।
হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
দেহময়
রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।

পূর্বতীরে বৃদ্ধ বট প্রাচীন প্রহরী
গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাত নিরালোকে
যেন পাতালের নাগলোকে।
এক দিকে দূর আকাশের সাথে
দিনে রাতে
চলে তার আলোকছায়ার আলাপন,
অন্য দিকে দূরনিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
কিসের সন্ধানে
অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে।
সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায়;
তার পরে দেখিলাম, এ পুকুর এও বাতায়ন—
এক দিকে সীমা বাঁধা, অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ।

করিয়াছি পারাপার
যত শত বার
ততই এ তটে-বাঁধা জলে
গভীরের বক্ষতলে
লভিয়াছি প্রতি ক্ষণে বাধা-ঠেলা স্বাধীনের জয়,
গেছে চলি ভয়।

[শান্তিনিকেতন]
২৬।১০।৩৮

শ্যামা

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি। ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার,
সকালবেলার রোদে বাদামগাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল। ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া

সূক্ষ্ম স্পর্শময়ী।
সাহস হল না কথা কই।
হৃদয় ব্যথিল মোর অতিমৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত দল। আমি মুখচোরা ছেলে
একপাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা,
পরিবেষণের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু, দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো বা গড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।

কখনো বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ।
পুরুষসুলভ মোর কত মূঢ়তারে
ধিক্কার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে।
একদিন বলেছিল, "জানি হাত দেখা।"
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—
বলেছিল, "তোমার স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন।" দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

[শান্তিনিকেতন]
৩১।১০।৩৮

পঞ্চমী

ভাবি বসে বসে
গত জীবনের কথা,
কাঁচা মনে ছিল
কী বিষম মূঢ়তা।
শেষে ধিক্কারে বলি হাত নেড়ে,
যাক গে সে-কথা যাক গে।

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
ভয় ছিল হারবার,
তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।
কৃপণ কৃপার ভাঙা কণা একটুক
মনে দেয় নাই সুখ।
সে যুগের শেষে আজ বলি হেসে,
কম কি সে কৌতুক
যতটুকু ছিল ভাগ্যে,
দুঃখের কথা থাক্ গে।

পঞ্চমী তিথি
বনের আড়াল থেকে
দেখা দিয়েছিল
ছায়া দিয়ে মুখ ঢেকে।
মহা আক্ষেপে বলেছি সেদিন,
এ ছল কিসের জন্য।

পরিতাপে জ্বলি আজ আমি বলি,
সিকি চাঁদনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।

বলি আরবার, এসো পঞ্চমী, এসো,
চাপা হাসিটুকু হেসো,
আধখানি বেঁকে ছলনায় ঢেকে
না জানিয়ে ভালোবেসো।
দয়া, ফাঁকি নামে গণ্য,
আমাকে করুক ধন্য।

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি,
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস্য।

ভাগ্যের হাসি কৌতুক করি
সেদিন সে কোন্‌ ছলে
আপনার ছবি দেখিতে চাহিল
আমার অশ্রুজলে।
এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি,
পালা শেষ করো আসি।
মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি।
আজ করো তারি ভাষ্য
যা ছিল অবিশ্বাস্য।

বয়স গিয়েছে,
হাসিবার ক্ষমতাটি
বিধাতা দিয়েছে,
কুয়াশা গিয়েছে কাটি।
দুখদুর্দিন কালো বরনের
মুখোশ করেছে ছিন্ন।

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ্,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

[শান্তিনিকেতন]
২৯।১১।৩৮

জানা-অজানা

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না জানারি মতো।
পর্দায় পড়েছে ঢাকা সাসির দুখানা কাঁচ ভাঙা;
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা—
চোখে পড়ে পড়েও না;
জাজিমেতে আঁকে আলপনা
সাতটা বেলার আলো সকালে রোদ্দুরে।
সবুজ একটি শাড়ি ডুরে
ঢেকে আছে ডেস্কোখানা; কবে তারে নিয়েছিনু বেছে,
রঙ চোখে উঠেছিল নেচে,

আজ যেন সে রঙের আগুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
আছে তবু ষোলো-আনা নাই।
থাকে থাকে দেরাজের
এলোমেলো ভরা আছে ঢের
কাগজপত্তর নানামতো,
ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার।
টেবিলে হেলানো ক্যালেণ্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ। ল্যাভেণ্ডার
শিশিভরা রোদ্দুরের রঙে। দিনরাত
টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ।
দেয়ালের কাছে
আলমারিভরা বই আছে;
ওরা বারো-আনা
পরিচয়-অপেক্ষায় রয়েছে অজানা।
ওই যে দেয়ালে
ছবিগুলো হেথা হোথা, রেখেছিনু কোনো-এক কালে;
আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
যেন ভূতে-পাওয়া।
কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন;
আজ অন্যরূপ,
প্রায় তারা চুপ।
আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।

এইটুকু ঘর।
কিছু বা আপন তার, অনেক কিছুই তার পর।
টেবিলের ধারে তাই
চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই।

দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো।
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি 'পরে চলে আনাগোনা।
আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।
মনে ভাবি, আমি সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন; ঝাপ্‌সা পুরানো ছেঁড়া-ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।
যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে।
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা;
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
১১।৯।৩৮

প্রশ্ন

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলেম হাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল,
পড়ল আমার ঝুড়ির থেকে
একটি রাঙা ফল।

হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
গড়িয়ে গেল ভুলে,
নিই নি ফিরে তুলে।
দিনের শেষে দিঘির ঘাটে
তুলতে এলে জল,
অন্ধকারে কুড়িয়ে তখন
নিলে কি সেই ফল।
এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

বঞ্চিত

রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী,
ছিল অনেক গুণী।
কবির মুখে কাব্যকথা শুনি
ভাঙল দ্বিধার বাঁধ,
সমস্বরে জাগল সাধুবাদ।
উষ্ণীষেতে জড়িয়ে দিল
মণিমালার মান,
স্বয়ং রাজার দান।
রাজধানীময় যশের বন্যাবেগে
নাম উঠল জেগে।

দিন ফুরাল। খ্যাতিক্লান্ত মনে
যেতে যেতে পথের ধারে
দেখল বাতায়নে,
তরুণী সে, ললাটে তার
কুঙ্কুমেরি ফোঁটা,
অলকেতে সদ্য অশোক ফোটা।

সামনে পদ্মপাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধ্যেবেলার বাতাস গন্ধে ভরে।
নিশ্বাসিয়া বললে কবি,
এই মালাটি নয় তো আমার তরে।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

আমগাছ

এ তো সহজ কথা,
অঘ্রানে এই স্তব্ধ নীরবতা
জড়িয়ে আছে সামনে আমার
আমের গাছে ;
কিন্তু ওটাই সবার চেয়ে
দুর্গম মোর কাছে।
বিকেল বেলার রোদ্দুরে এই চেয়ে থাকি,
যে রহস্য ঐ তরুটি রাখল ঢাকি
গুঁড়িতে তার ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কাঁপনলাগা তালে
সে কোন্ ভাষা আলোর সোহাগ
শূন্যে বেড়ায় খুঁজি।
মর্ম তাহার স্পষ্ট নাহি বুঝি,
তবু যেন অদৃশ্য তার চঞ্চলতা
রক্তে জাগায় কানে-কানে কথা,
মনের মধ্যে বুলায় যে অঙ্গুলি
আভাস-ছোঁওয়া ভাষা তুলি
সে এনে দেয় অস্পষ্ট ইঙ্গিত
বাক্যের অতীত।

ঐ যে বাকলখানি
রয়েছে ওর পর্দা টানি

ওর ভিতরের আড়াল থেকে আকাশ-দূতের সাথে
বলাকওয়া কী হয় দিনে রাতে,
পরের মনের স্বপ্নকথার সম
পৌঁছবে না কৌতূহলে মম।
দুয়ার-দেওয়া যেন বাসরঘরে
ফুলশয্যার গোপন রাতে কানাকানি করে,
অনুমানেই জানি,
আভাসমাত্র না পাই তাহার বাণী।
ফাগুন আসে বছরশেষের পারে,
দিনে-দিনেই খবর আসে দ্বারে।
একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হতে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।
অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
মুকুলে মুকুলে।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৫।১২।৩৮

পাখির ভোজ

ভোরে উঠেই পড়ে মনে,
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।
চাতালকোণে বসে থাকি,
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো।
স্নিগ্ধ আলো
এ অঘ্রানের শিশিরছোঁওয়া প্রাতে,
সরল লোভে চপল পাখির চটুল নৃত্য-সাথে

শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে—
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে।

জাড়ের হাওয়ায় ফুলিয়ে ডানা
একটুকু মুখ ঢেকে
অতিথিরা থেকে থেকে
লাল্‌চে-কালো সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন বেশে
দেখা দিচ্ছে এসে।

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো,
বুক ফুলিয়ে হেলে-দুলে খুঁটে খুঁটে ধুলো
খায় ছড়ানো ধান।
ওদের সঙ্গে শালিখদলের পঙ্‌ক্তি-ব্যবধান
একটুমাত্র নেই।
পরস্পরে একসমানেই
ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে।
মাঝে-মাঝে কী অকারণ ত্রাসে
ত্রস্ত পাখা মেলে
এক মুহূর্তে যায় উড়ে ধান ফেলে।
আবার ফিরে আসে
অহেতু আশ্বাসে।

এমনসময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
একটুখানি যাচ্ছে সরে আসছে আবার কাছে,
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুলগাছে।
বাঁকিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।
এবার মনে হয়,
এতক্ষণে পরস্পরের ভাঙল সমন্বয়।

কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
সন্দেহ আর সতর্কতায় দুলছে সারাক্ষণ।
প্রথম হল মনে,
তাড়িয়ে দেব ; লজ্জা হল তারি পরক্ষণে—
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
আমার মতোই সমান অধিকার।
তখন দেখি, লাগছে না আর মন্দ
সকালবেলার ভোজের সভায়
কাকের নাচের ছন্দ।

এই যে বহায় ওরা
প্রাণস্রোতের পাগ্‌লাঝোরা,
কোথা হতে অহরহ আসছে নাবি
সেই কথাটাই ভাবি।
এই খুশিটার স্বরূপ কী যে, তারি
রহস্যটা বুঝতে নাহি পারি।
চটুলদেহ দলে দলে
দুলিয়ে তোলে যে আনন্দ খাদ্যভোগের ছলে,
এ তো নহে এই নিমেষের সদ্য চঞ্চলতা,
অগণ্য এ কত যুগের অতি প্রাচীন কথা।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেই মতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।
আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন্‌ সুদূর কেন্দ্র হতে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানা রূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা রঙ্গিমায়

তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতিহারা,
হয় না ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।
সেই পুরাতন অনির্বচনীয়
সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
আমার চোখের কাছে
ভিড়-করা ঐ শালিখগুলির নাচে।
আদিমকালের সেই আনন্দ ওদের নৃত্যবেগে
রূপ ধ'রে মোর রক্তে ওঠে জেগে।
তবুও দেখি কখন কদাচিৎ
বিরূপ বিপরীত—
প্রাণের সহজ সুষমা যায় ঘুচি,
চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুচি ;
পরাভূত হতভাগ্য মোর দুয়ারের কাছে
ক্ষত-অঙ্গে শরণ মাগিয়াছে।
দেখেছি সেই জীবন-বিরুদ্ধতা,
হিংসার ক্রুদ্ধতা—
যেমন দেখি কুহেলিকার কুশ্রী অপরাধ,
শীতের প্রাতে আলোর প্রতি কালোর অপবাদ—
অহংকৃত ক্ষণিকতার অলীক পরিচয়,
অসীমতার মিথ্যা পরাজয়।
তাহার পরে আবার করে ছিন্নেরে গ্রন্থন
সহজ চিরন্তন।
প্রাণোৎসবে অতিথিরা আবার পাশাপাশি
মহাকালের প্রাঙ্গণেতে নৃত্য করে আসি।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৬।১২।৩৮

বেজি

অনেকদিনের এই ডেস্কো—
আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কো
দিয়েছে বিস্তর দাগ ভুতুড়ে রেখার।
যমজ সোদর ওরা যে সব লেখার—
ছাপার লাইনে পেল ভদ্রবেশে ঠাঁই,
তাদের স্মরণে এরা নাই।
অক্সফোর্ড ডিক্সনারি, পদকল্পতরু,
ইংরেজ মেয়ের লেখা 'সাহারার মরু'
ভ্রমণের বই, ছবি আঁকা,
এগুলোর একপাশে চা রয়েছে ঢাকা
পেয়ালায় মডার্‌ন্‌ রিভিয়ুতে চাপা।
পড়ে আছে সগুছাপা
প্রুফগুলো কুঁড়েমির উপেক্ষায়।
বেলা যায়,
ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে পাঁচ,
বৈকালী ছায়ার নাচ
মেঝেতে হয়েছে শুরু, বাতাসে পর্দায় লেগে দোলা।
খাতাখানি আছে খোলা।—
আধঘণ্টা ভেবে মরি,
প্যান্থীজ্‌ম্‌ শব্দটাকে বাংলায় কী করি।

পোষা বেজি হেনকালে দ্রুতগতি এখানে সেখানে
টেবিল-চৌকির নিচে ঘুরে গেল কিসের সন্ধানে—
দুই চক্ষু ঔৎসুক্যের দীপ্তিজ্বলা,
তাড়াতাড়ি দেখে গেল আলমারির তলা
দামি দ্রব্য যদি কিছু থাকে;
ঘ্রাণ কিছু মিলিল না তীক্ষ্ণ নাকে

ঈপ্সিত বস্তর। ঘুরে ফিরে অবজ্ঞায় গেল চলে ;
এ ঘরে সকলি ব্যর্থ আরসুলার খোঁজ নেই ব'লে।

আমার কঠিন চিন্তা এই,
প্যান্থীজ্‌ম্ শব্দটার বাংলা বুঝি নেই।

[শান্তিনিকেতন]
৪ অক্টোবর, ১৯৩৮

যাত্রা

ইস্‌টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাঁই,
স্পষ্ট মনে নাই।
উপরতলার সারে
কামরা আমার একটা ধারে।
পাশাপাশি তারি
আরো ক্যাবিন সারি সারি
নম্বরে চিহ্নিত,
একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিন্নিত।
সরকারী যা আইনকানুন তাহার যথাযথ্য
অটুট, তবু যাত্রীজনের পৃথক বিশেষত্ব
রুদ্ধদুয়ার ক্যাবিনগুলোয় ঢাকা ;
এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন চাকা,
ভিন্ন ভিন্ন চাল।
অদৃশ্য তার হাল,
অজানা তার লক্ষ্য হাজার পথেই,
সেথায় কারো আসনে ভাগ হয় না কোনোমতেই।
প্রত্যেকেরই রিজার্ভ-করা কোটর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ;
দরজাটা খোলা হলেই সম্মুখে সমুদ্র
মুক্ত চোখের 'পরে
সমান সবার তরে,

তবুও সে একান্ত অজানা,
তরঙ্গতর্জনী-তোলা অলঙ্ঘ্য তার মানা।

মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ে। ডিনার-টেবিলে
খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অঙ্গরাগের সুগন্ধ যায় মিলে—
তারি সঙ্গে নানা রঙের সাজে
ইলেক্‌ট্রিকের আলো-জ্বালা কক্ষমাঝে
একটু জানা অনেকখানি না-জানাতেই মেশা
চক্ষু কানের স্বাদের ঘ্রাণের সম্মিলিত নেশা
কিছুক্ষণের তরে
মোহাবেশে ঘনিয়ে সবায় ধরে।
চেনাশোনা হাসি-আলাপ মদের ফেনার মতো
বুদ্‌বুদিয়া ওঠে আবার গভীরে হয় গত।
বাইরে রাত্রি তারায় তারাময়,
ফেনিল সুনীল তেপান্তরে মরণ-ঘেরা ভয়।

হঠাৎ কেন খেয়াল গেল মিছে,
জাহাজখানা ঘুরে আসি উপর থেকে নিচে।
খানিক যেতেই পথ হারালুম, গলির আঁকেবাঁকে
কোথায় ওরা কোন্ অফিসার থাকে।
কোথাও দেখি সেলুন-ঘরে ঢুকে,
ক্ষুর বোলাচ্ছে নাপিত সে কার ফেনায়-মগ্ন মুখে।
হোথায় রান্নাঘর;
রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর।
গা ঘেঁষে কে গেল চলে ড্রেসিং-গাউন-পরা,
স্নানের ঘরে জায়গা পাবার ত্বরা।
নিচের তলার ডেকের 'পরে কেউ বা করে খেলা,
ডেক-চেয়ারে কারো শরীর মেলা,
বুকের উপর বইটা রেখে কেউ বা নিদ্রা যায়,
পায়চারি কেউ করে ত্বরিত পায়।

স্টুয়ার্ড্ হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।
আমি তাকে শুধাই আমার ক্যাবিন-ঘরের পথ
নেহাত থতোমতো।
সে শুধাল, নম্বর তার কত।
আমি বললেম যেই,
নম্বরটা মনে আমার নেই—
একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে,
ঘেমে উঠি উদ্‌বেগে আর লাজে।
আবার ঘুরে বেড়াই আগে পাছে,
চেয়ে দেখি কোন্ ক্যাবিনের নম্বর কী আছে।
যেটাই দেখি মনেতে হয়, এইটে হতে পারে ;
সাহস হয় না ধাক্কা দিতে দ্বারে।
ভাবছি কেবল, কী যে করি, হল আমার এ কী—
এমন সময় হঠাৎ চমকে দেখি,
নিছক স্বপ্ন এ যে,
এক যাত্রার যাত্রী যারা কোথায় গেল কে যে।

গভীর রাত্রি ; বাতাস লেগে কাঁপে ঘরের সাসি,
রেলের গাড়ি অনেক দূরে বাজিয়ে গেল বাঁশি।

[শান্তিনিকেতন]
২৬।২।৩৯

সময়হারা

খবর এল, সময় আমার গেছে
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই ;
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো।

হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।
ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই ;
ইচ্ছে করে, পৌষমাসের হাওয়ার তোড়টা ভাঙাই ;
ঘুমোই যখন ফড়্‌ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
নিতান্ত ভুতুড়ে।
আধপেটা খাই শালুক-পোড়া ; একলা কঠিন ভুঁয়ে
চেটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু আপন-মনে—
"উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারে দই।"
আমার চেয়ে কম-ঘুমন্ত নিশাচরের দল
খোঁজ নিয়ে যায় ঘরে এসে, হায় সে কী নিস্ফল।
কখনো বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর,
শূন্য ঘরের পানে চেয়ে বলে, "সাঙাত মোর,
আছে ঘরে ভদ্র ভাষায় বলে যাকে দাওয়াই ?"
নেই কিছু তো, দু-এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াই।
একটু যখন আসে ঘুমের ঘোর
সুড়সুড়ি দেয় আরসুলারা পায়ের তলায় মোর।
দুপুরবেলায় বেকার থাকি অন্যমনা ;
গিরগিটি আর কাঠবিড়ালির আনাগোনা
সেই দালানের বাহির ঝোপে ;
থামের মাথায় খোপে খোপে
পায়রাগুলোর সারাটা দিন বকম্‌-বকম্‌।
আঙিনাটার ভাঙা পাঁচিল, ফাটলে তার রকম-রকম
লতাগুল্ম পড়ছে ঝুলে,
হলদে সাদা বেগনি ফুলে
আকাশ-পানে দিচ্ছে উঁকি।
ছাতিমগাছের মরা শাখা পড়ছে ঝুঁকি

শঙ্খমণির থালে,
মাছরাঙারা দুপুরবেলায় তন্দ্রানিঝুম কালে
তাকিয়ে থাকে গভীর জলের রহস্যভেদরত
বিজ্ঞানীদের মতো।
পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,
অফলা এক চালতাগাছের চলে ছায়ার নাট।
চক্ষু বুজে ছবি দেখি—কাৎলা ভেসেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
ঝাউগুঁড়িটার 'পরে
কাঠঠোকরা ঠক্‌ঠকিয়ে কেবল প্রশ্ন করে।
আগে কানে পৌঁছত না ঝিঁঝিঁপোকার ডাক,
এখন যখন পোড়ো বাড়ি দাঁড়িয়ে হতবাক্‌
ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান স্তব্ধতা-সংগীতে
লেগেই আছে একঘেয়ে সুর দিতে।
আঁধার হতে না হতে সব শেয়াল ওঠে ডেকে
কল্‌মিদিঘির ভাঙা পাড়ির থেকে।
পেঁচার ডাকে বাঁশের বাগান হঠাৎ ভয়ে জাগে,
তন্দ্রা ভেঙে বুকে চমক লাগে।
বাদুড়-ঝোলা তেঁতুলগাছে মনে যে হয় সত্যি,
দাড়িওয়ালা আছে ব্রহ্মদত্যি।
রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।
তখন ভাবি, একলা ব'সে দাওয়ার কোণে
মনে-মনে,
ঝড়েতে কাত জারুলগাছের ডালে ডালে
পিরবু নাচে হাওয়ার তালে।

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।

সময় আমার গেছে ব'লেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গ'ড়ে।
সজনেগাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে—
গোধূলিতে সূয্যিমামার বিয়ে ;
মামি থাকেন, সোনার বরন ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা।
এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে ব'লেই জানার সুযোগ হল
'কলুদ ফুল' যে কাকে বলে, ঐ যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুক্‌রো জ্বলে।
বেড়া আমার সব গিয়েছে টুটে ;
পরের গোরু যেখান থেকে যখন খুশি ছুটে
হাতার মধ্যে আসে ;
আর কিছু তো পায় না, খিদে মেটায় শুকনো ঘাসে।
আগে ছিল সাটন্ বীজে বিলিতি মৌসুমি,
এখন মরুভূমি।
সাত পাড়াতে সাত কুলেতে নেইকো কোথাও কেউ
মনিব যেটার, সেই কুকুরটা কেবলি ঘেউ-ঘেউ
লাগায় আমার দ্বারে ; আমি বোঝাই তারে কত,
আমার ঘরে তাড়িয়ে দেবার মতো
ঘুম ছাড়া আর মিলবে না তো কিছু—
শুনে সে লেজ নাড়ে, সঙ্গে বেড়ায় পিছু পিছু।
অনাদরের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পিঠের 'পরে
জানিয়ে দিলে, লক্ষ্মীছাড়ার জীর্ণ ভিটের 'পরে
অধিকারের দলিল তাহার দেহেই বর্তমান।
দুর্ভাগ্যের নতুন হাওয়া-বদল করার স্থান
এমনতরো মিলবে কোথায়। সময় গেছে তারই,
সন্দেহ তার নেইকো একেবারেই।

সময় আমার গিয়েছে, তাই গাঁয়ের ছাগল চরাই ;
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই ।
খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে
দিল কখন ফুঁকে ।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার,
সারাদিনে জনামাত্র নেইকো খরিদ্দার ।
কালের অলস চরণপাতে
ঘাস উঠেছে ঘরে আসার বাঁকা গলিটাতে ।
ওরি ধারে বটের তলায় নিয়ে চিঁড়ের থালা
চড়ুইপাখির জন্যে আমার খোলা অতিথশালা ।

সন্ধ্যে নামে পাতাঝরা শিমুলগাছের আগায়,
আধ-ঘুমে আধ-জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্টারিটির পথে
স্বপ্নমনোরথে ;
কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,—
"ওরে পুতুলওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম-বায়না-নেওয়া খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণ-লাগা ক্ষণিক কালের পাছে ;
আজ চেয়ে দেখ্, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ-দেওয়া তার ভালে ।
পুরানো সে নতুন আলোয় জাগল নতুন কালে ।
সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুলওলা,
আপন সৃষ্টি-মাঝখানেতে থাকিস আপন-ভোলা ।

ঐ যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চেটাই পাতা,
ছেঁড়া মলিন কাঁথা—
ঐ যে বলিস, জোটে কেবল সিদ্ধ কচুর পথ্যি—
এটা নেহাত স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি।
পাস নি খবর, বাহান্ন জন কাহার
পাল্‌কি আনে— শব্দ কি পাস তাহার।
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,
সখীর সঙ্গে আসছে রাজার মেয়ে।
খেলা যে তার বন্ধ আছে তোমার খেলনা বিনে,
এবার নেবে কিনে।
কী জানি বা ভাগ্য তোমার ভালো,
বাসরঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালো;
নবযুগের রাজকন্যা আধেক রাজ্যসুদ্ধ
যদি মেলে, তা নিয়ে কেউ বাধায় যদি যুদ্ধ,
ব্যাপারখানা উচ্চতলায় ইতিহাসের ধাপে
উঠে পড়বে মহাকাব্যের মাপে।
বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে
বলবে তাকে, একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল-পাঁজি-ছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া।"

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র—
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
১।১।৩৯

নামকরণ

একদিন মুখে এল নূতন এ নাম—
চৈতালিপূর্ণিমা ব'লে কেন যে তোমারে ডাকিলাম
সে কথা শুধাও যবে মোরে
স্পষ্ট ক'রে
তোমারে বুঝাই
হেন সাধ্য নাই।
রসনায় রসিয়েছে, আর কোনো মানে
কী আছে কে জানে।
জীবনের যে সীমায়
এসেছ গম্ভীর মহিমায়
সেথা অপ্রমত্ত তুমি,
পেরিয়েছ ফাল্গুনের ভাঙাভাঙি উচ্ছিষ্টের ভূমি,
পৌঁছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে,
এ কথাই বুঝি মনে আসে
না ভাবিয়া আগুপিছু।
কিংবা এ ধ্বনির মাঝে অজ্ঞাত কুহক আছে কিছু।
হয়তো মুকুল-ঝরা মাসে
পরিণতফলনম্র অপ্রগল্‌ভ যে মর্যাদা আসে
আম্রডালে,
দেখেছি তোমার ভালে
সে পূর্ণতা স্তব্ধতামন্থর—
তার মৌন-মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্মর।
অবসন্ন বসন্তের অবশিষ্ট অন্তিম চাঁপায়
মৌমাছির ডানারে কাঁপায়
নিকুঞ্জের ম্লান মৃদু ঘ্রাণে,
সেই ঘ্রাণ একদিন পাঠায়েছ প্রাণে,
তাই মোর উৎকণ্ঠিত বাণী
জাগায়ে দিয়েছে নামখানি।

সেই নাম থেকে থেকে ফিরে ফিরে
তোমারে গুঞ্জন করি ঘিরে
চারিদিকে,
ধ্বনিলিপি দিয়ে তার বিদায়স্বাক্ষর দেয় লিখে।
তুমি যেন রজনীর জ্যোতিষ্কের শেষ পরিচয়
শুকতারা, তোমার উদয়
অস্তের খেয়ায় চ'ড়ে আসা,
মিলনের সাথে বহি বিদায়ের ভাষা।
তাই বসে একা
প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব-শেষ দেখা।
সেই দেখা মম
পরিস্ফুটতম।
বসন্তের শেষমাসে শেষ শুক্লতিথি
তুমি এলে তাহার অতিথি,
উজাড় করিয়া শেষ দানে
ভাবের দাক্ষিণ্য মোর অন্ত নাহি জানে।
ফাল্গুনের অতিতৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
চৈত্রের সে ঘন দিন তোমার লাবণ্যে মূর্তি ধরে;
মিলে যায় সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে,
প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

হয়তো এ-সব ব্যাখ্যা স্বপ্ন-অন্তে চিন্তা ক'রে বলা,
দাম্ভিক বুদ্ধিরে শুধু ছলা—
বুঝি এর কোনো অর্থ নাইকো কিছুই।
জ্যৈষ্ঠ-অবসানদিনে আকস্মিক জুঁই
যেমন চমকি জেগে উঠে
সেইমতো অকারণে উঠেছিল ফুটে,

সেই চিত্রে পড়েছিল তার লেখা
বাক্যের তুলিকা যেথা স্পর্শ করে অব্যক্তের রেখা।
পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী—
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি;
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়।
উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে,
কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্র রূপ উঠে জেগে জেগে।
বসন্তে নাগকেশরের সুগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাদুর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।
বনতলে মর্মরিয়া কাঁপে সোনাঝুরি;
চাঁদের আলোর পথে খেলা করে ছায়ার চাতুরী;
গভীর চৈতন্যলোকে
রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিখি কিংশুকে অশোকে;
হাওয়ায় বুলায় দেহে অনামীর অদৃশ্য উত্তরী,
শিরায় সেতার উঠে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।

এই যারে মায়ারথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে
সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা হতে আসে মন্ত্র এই সাধনার।
রক্তস্রোত-আন্দোলনে জেগে
ধ্বনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে অর্থহীন বেগে;
প্রচ্ছন্ন নিকুঞ্জ হতে অকস্মাৎ ঝঞ্ঝায় আহত

ছিন্ন মঞ্জরীর মতো
নাম এল ঘূর্ণবায়ে ঘুরি ঘুরি,
চাঁপার গন্ধের সাথে অন্তরেতে ছড়াল মাধুরী।

চৈত্রপূর্ণিমা [২১ চৈত্র], ১৩৪৫
[? শান্তিনিকেতন]

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা
বেগ্‌নি-সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে
ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্‌দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত

এই-কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুক্‌রো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি, বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ঐ যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি—
কদিন হল জানি নে কোন্ গোঁয়ার খুনি
সমথ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।

আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

শান্তিনিকেতন
২৮।৩।৩৯

তর্ক

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে
সেই অভিপ্রায়ে
রচিলেন সূক্ষ্মশিল্পকারুময়ী কায়া—
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্ মায়া
যারে নাহি যায় ধরা,
যাহা শুধু জাদুমন্ত্রে ভরা,
যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য অলোকে
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে,
ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি
না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।
যার ছায়া সুরে খেলা করে
চঞ্চল দিঘির জলে আলোর মতন থরথরে।
'নিশ্চিত পেয়েছি' ভেবে যারে
অবুঝ আঁকড়ি রাখে আপন ভোগের অধিকারে,

মাটির পাত্রটা নিয়ে বঞ্চিত সে অমৃতের স্বাদে,
ডুবায় সে ক্লান্তি-অবসাদে
সোনার প্রদীপ শিখা-নেভা।
দূর হতে অধরাকে পায় যে বা
চরিতার্থ করে সে'ই কাছের পাওয়ারে,
পূর্ণ করে তারে।

নারীস্তব শুনালেম। ছিল মনে আশা—
উচ্চতত্ত্বে-ভরা এই ভাষা
উৎসাহিত করে দেবে মন ললিতার,
পাব পুরস্কার।
হায় রে, দুর্গ্রহগুণে
কাব্য শুনে
ঝক্‌ঝকে হাসিখানি হেসে
কহিল সে, "তোমার এ কবিত্বের শেষে
বসিয়েছ মহোন্নত যে-কটা লাইন
আগাগোড়া সত্যহীন।
ওরা সব-কটা
বানানো কথার ঘটা,
সদরেতে যত বড়ো অন্দরেতে ততখানি ফাঁকি।
জানি না কি—
দূর হতে নিরামিষ সাত্ত্বিক মৃগয়া,
নাই পুরুষের হাড়ে অমায়িক বিশুদ্ধ এ দয়া।"
আমি শুধালেম, "আর, তোমাদের ?"
সে কহিল, "আমাদের চারিদিকে শক্ত আছে ঘের
পরশ-বাঁচানো,
সে তুমি নিশ্চিত জান।"
আমি শুধালেম, "তার মানে ?"
সে কহিল, "আমরা পুষি না মোহ প্রাণে,

কেবল বিশুদ্ধ ভালোবাসি।"
কহিলাম হাসি,
"আমি যাহা বলেছিনু সে-কথাটা মস্ত বড়ো বটে,
কিন্তু তবু লাগে না সে তোমার এ স্পর্ধার নিকটে।
মোহ কি কিছুই নেই রমণীর প্রেমে।"
সে কহিল একটুকু থেমে,
"নেই বলিলেই হয়। এ কথা নিশ্চিত—
জোর করে বলিবই—
আমরা কাঙাল কভু নই।"
আমি কহিলাম, "ভদ্রে, তা হলে তো পুরুষের জিত।"
"কেন শুনি"
মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলিল তরুণী।
আমি কহিলাম, "যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো-আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।
আকাশের আলো
বিপরীতে-ভাগ-করা সে কি সাদা কালো।
ওই আলো আপনার পূর্ণতারে চূর্ণ করে
দিকে দিগন্তরে,
বর্ণে বর্ণে
তৃণে শস্যে পুষ্পে পর্ণে,
পাখির পাখায় আর আকাশের নীলে,
চোখ ভোলাবার মোহ মেলে দেয় সর্বত্র নিখিলে।
অভাব যেখানে এই মন-ভোলাবার
সেইখানে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার হার।

এমন লজ্জার কথা বলিতেও নাই—
তোমরা ভোল না শুধু ভুলি আমরাই।
এই কথা স্পষ্ট দিনু কয়ে,
সৃষ্টি কভু নাহি ঘটে একেবারে বিশুদ্ধেরে লয়ে।
পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।"

কোনো কথা নাহি ব'লে
সুন্দরী ফিরায়ে মুখ দ্রুত গেল চলে।
পরদিন বটের পাতায়
গুটিকত সদ্যফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়।
বলে গেল, "ক্ষমা করো, অবুঝের মতো
মিছেমিছি বকেছিনু কত।"

ঢেলা আমি মেরেছিনু চৈত্রে-ফোটা কাঞ্চনের ডালে,
তারি প্রতিবাদে ফুল ঝরিল এ স্পর্ধিত কপালে।
নিয়ে এই বিবাদের দান
এ বসন্তে চৈত্র মোর হল অবসান।

[এপ্রিল, ১৯৩৯]

ময়ূরের দৃষ্টি

দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে
সকালে বসি চাতালে।
অনুকূল অবকাশ;
তখনো নিরেট হয়ে ওঠে নি কাজের দাবি,
ঝুঁকে পড়ে নি লোকের ভিড়
পায়ে পায়ে সময় দলিত করে দিয়ে।
লিখতে বসি,
কাটা খেজুরের গুঁড়ির মতো
ছুটির সকাল কলমের ডগায় চুঁইয়ে দেয় কিছু রস।

আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে
পাশের রেলিংটির উপর।
আমার এই আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ,
এখানে আসে না তার বেদরদী শাসনকর্তা বাঁধন হাতে।
বাইরে ডালে ডালে কাঁচা আম পড়েছে ঝুলে,
নেবু ধরেছে নেবুর গাছে,
একটা একলা কুড়চিগাছ
আপনি আশ্চর্য আপন ফুলের বাড়াবাড়িতে।
প্রাণের নিরর্থক চাঞ্চল্যে
ময়ূরটি ঘাড় বাঁকায় এদিকে ওদিকে।
তার উদাসীন দৃষ্টি
কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা-লেখায়;
করত, যদি অক্ষরগুলো হত পোকা;
তাহলে নগণ্য মনে করত না কবিকে।
হাসি পেল ওর ঐ গম্ভীর উপেক্ষায়,
ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা।
দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য

সমস্ত নীল আকাশে,
কাঁচা-আম-ঝোলা গাছের পাতায় পাতায়,
তেঁতুলগাছের গুঞ্জনমুখর মৌচাকে।
ভাবলুম, মাহেন্দজারোতে
এইরকম চৈত্রশেষের অকেজো সকালে
কবি লিখেছিল কবিতা,
বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি।
কিন্তু, ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনাপাওনায়,
কাঁচা আম ঝুলে পড়েছে ডালে।
নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যন্ত
কোথাও ওদের দাম যাবে না কমে।
আর, মাহেন্দজারোর কবিকে গ্রাহ্যই করলে না
পথের ধারের তৃণ, আঁধার রাত্রের জোনাকি।

নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবীতে
মেলে দিলাম চেতনাকে,
টেনে নিলেম প্রকৃতির ধ্যান থেকে বৃহৎ বৈরাগ্য
আপন মনে;
খাতার অক্ষরগুলোকে দেখলুম
মহাকালের দেয়ালিতে
পোকার ঝাঁকের মতো।
ভাবলুম, আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি পাতাগুলো
তাহলে পশুর্দিনের অন্ত্যসংকার এগিয়ে রাখব মাত্র।

এমনসময় আওয়াজ এল কানে,
"দাদামশায়, কিছু লিখেছ না কি।"
ঐ এসেছে— ময়ূর না,
ঘরে যার নাম সুনয়নী,
আমি যাকে ডাকি শুনায়নী ব'লে।
ওকে আমার কবিতা শোনাবার দাবি সকলের আগে।

আমি বললেম, "স্বরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।"
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, "আচ্ছা, তাই সই।"
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে ;
বললে, "তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।"
ব'লে গলা ধরলে জড়িয়ে।
আমি বললেম, "কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে ?"
সে বললে, "অকবির মতো হল তোমার কথাটা ;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারই কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।"

শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে।
মনে-মনে বললুম, প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রয়েছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায়,
তারই উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার শুনায়নী,
ভোরবেলার শুকতারা।
সেই ক্ষণিকের কাছে হার মানবে বিরাটকালের বৈরাগ্য।

মাহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে।

[? শান্তিনিকেতন
এপ্রিল, ১৯৩৯]

কাঁচা আম

তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল গাছতলায়
চৈত্রমাসের সকালে মৃদু রোদ্দুরে।
যখন দেখলুম অস্থির ব্যগ্রতায়
হাত গেল না কুড়িয়ে নিতে।
তখন চা খেতে খেতে মনে ভাবলুম,
বদল হয়েছে পালের হাওয়া।
পুবদিকের খেয়ার ঘাট ঝাপসা হয়ে এল।
সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া দুটি-একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি,
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুঠুরি;
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না।

গোড়াকার কথাটা বলি।
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।
জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টের বদান্যতা।
পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে।
কদিন তিনবেলা রোশনচৌকিতে
চারদিকের প্রাত্যহিক ভাষা দিল বদলিয়ে;
ঘরে ঘরে চলল আলোর গোলমাল
ঝাড়ে লণ্ঠনে।
অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।

কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়,
আলতা-পরা পায়ে পায়ে—
ইঙ্গিত করল যে, সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়—
সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না—
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।

তার ভাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে।
অনেক সংকোচে অল্প একটু কাছে যেতে চাই,
তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত ;
কিন্তু, ভ্রূকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না, আমি ছেলেমানুষ,
আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের।
তার বয়স আমার চেয়ে দুই-এক মাসের
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে।
তা হোক, কিন্তু এ কথা মানি,
আমরা ভিন্ন মসলায় তৈরি।
মন একান্তই চাইত, ওকে কিছু একটা দিয়ে
সাঁকো বানিয়ে নিতে।
একদিন এই হতভাগা কোথা থেকে পেল
কতকগুলো রঙিন পুঁথি ;
ভাবলে, চমক লাগিয়ে দেবে।
হেসে উঠল সে ; বলল,
"এগুলো নিয়ে করব কী।"
ইতিহাসের উপেক্ষিত এই-সব ট্র্যাজেডি
কোথাও দরদ পায় না,
লজ্জার ভারে বালকের সমস্ত দিনরাত্রির
দেয় মাথা হেঁট ক'রে।

কোন্ বিচারক বিচার করবে যে, মূল্য আছে
সেই পুঁথিগুলোর।

তবু এরই মধ্যে দেখা গেল, শস্তা খাজনা চলে
এমন দাবিও আছে ঐ উচ্চাসনার—
সেখানে ওর পিঁড়ে পাতা মাটির কাছে।
ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও।

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ।
হাওয়া দিলেই ছুটে যেতুম বাগানে,
দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।
যে লোভী চিরে চিরে ওকে খায়
সে দেখতে পায় নি ওর অপরূপ রূপ।

একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম;
ও বলল, "কে বলেছে তোমাকে আনতে।"
আমি বললুম, "কেউ না।"
ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।
আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে;
সে বললে, "এমন ক'রে ফল আনতে হবে না।"
চুপ করে রইলুম।

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে;

তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাই নি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

[? শান্তিনিকেতন]
৮।৪।৩৯

নাটক ও প্রহসন

চণ্ডালিকা

ভূমিকা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

মা। প্রকৃতি, ও প্রকৃতি! গেল কোথায়! কী জানি কী হল মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাই নে।

প্রকৃতি। এই-যে, মা, এখানেই আছি।

মা। কোথায়!

প্রকৃতি। এই-যে কুয়োতলায়।

মা। আশ্চর্য করলি তুই। বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না। ঘরের জল কোন্ সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ্, ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধুঁকছে আমলকিগাছের ডালে। তুই এই বৈশেখের রোদ পোয়াচ্ছিস বিনি কাজে। পুরাণ-কথা শুনেছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে পুড়ে; তোর কি তাই হল।

প্রকৃতি। হাঁ, মা, তপ করছি তো বটে।

মা। অবাক করলে! কার জন্যে।

প্রকৃতি। যে আমাকে ডাক দিয়েছে।

গান

যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক্।
যে আমারি নাম জেনেছে ওগো তারি
নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্॥

মা। কিসের ডাক।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও'।

মা। পোড়া কপাল! তোকে বলেছে 'জল দাও'! কে শুনি। তোর আপন জাতের কেউ?

প্রকৃতি। তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

মা। জাত লুকোস নি? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী?

প্রকৃতি। বলেছিলেম। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।

মা। তোর মুখে এ-সব কী শুনছি। তোর কি মনে পড়েছে পূর্বজন্মের কোনো কাহিনী।

প্রকৃতি। এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের।

মা। হাসালি তুই। নতুন জন্ম! ঘটল কবে।

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘন্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে-মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডুষ জল, যাঁর পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।

মা। ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এতবড়ো হল তোর বুকের পাটা! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিস নে কোন্ কুলে তোর জন্ম?

প্রকৃতি। কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

মা। তোর মুখের কথা সুদ্ধু বদলে গেছে যে! জাদু করেছে তোর কথাকে। কী বলিস নিজে বুঝতে পারিস কিছু?

প্রকৃতি। সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে। একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাপুণ্যই খুঁজছিলেন। যে-জলে ব্রত হল পূর্ণ সে জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে-জল তুলে এনেছিল

গুহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত— দাও জল, দাও জল।

গান

বলে দাও জল, দাও জল!
দেব আমি, কে দিয়েছে হেন সম্বল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
দাও জল, দাও জল।

ভূমিতলে হারা
উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।

কার সুগভীর বাণী
দিল হানি
কালো শিলাতল—
দাও জল, দাও জল॥

মা। কী জানি, বাছা, ভালো ঠেকছে না। ওদের মন্তরের খেলা আমি বুঝি নে। আজ তোর কথা চিনছি নে, কাল তোর মুখ চিনতেই পারব না। ওদের এ যে প্রাণ-বদলানো মন্তর।

প্রকৃতি। চিনতে পার নি এতদিন। যিনি চিনেছেন তিনি চেনাবেন। তাই আছি তাকিয়ে। রাজদুয়ারে দুপুরের ঘণ্টা বাজে, মেয়েরা জল নিয়ে যায় ঘরে, শঙ্খচিল একলা ওড়ে দূর আকাশে, আমার ঘট নিয়ে এসে বসি কুয়োতলায় পথের ধারে।

মা। কার জন্যে।

প্রকৃতি। পথিকের জন্যে।

মা। তোর কাছে কোন্ পথিক আসবে, পাগলি!

প্রকৃতি। সেই এক পথিক, মা, সেই এক পথিক। তাঁর মধ্যে আছে বিশ্বের সকল পথের সব পথিক। দিনের পর দিন চলে যায়, এলেন না তো। কোনো কথা

না ব'লে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলেন না কেন কথা। আমার মন যে হল মরুভূমির মতো; ধু ধু করে সমস্ত দিন, হু হু করে তপ্ত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না।

গান

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়,
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
যে-ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকাল।
ঝরনারে কে দিল বাধা—
তাপের প্রতাপে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা। তোর আজকেকার কথা কিছু বুঝতে পারছি নে, তোকে কী নেশা লেগেছে কী জানি। কী চাস, আমাকে সাদা ক'রে বল্‌।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এতবড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি, এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর থেকে তাঁর বুকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।

মা। মনে রাখিস, প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্‌তাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক্‌ সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ।

প্রকৃতি। গান

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।

জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরো থরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি
তোমার তরে।

মা। বাছা, কিছু কিছু বুঝতে পারি তোর কথা। তুই মেয়েমানুষ, সেবাতেই তোর পুজো, সেবাতেই তোর রাজত্ব। এক নিমিষে জাত ডিঙিয়ে যেতে পারে মেয়েরাই; ধরা পড়ে, সবাই তারা রাজরানীর অংশ, যদি হঠাৎ স'রে পড়ে ভাগ্যের পর্দাটা। সুযোগ তোর তো ঘটেছিল। মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজার ছেলে এসেছিল তোরই এই কুয়োতলায়। মনে পড়ে তো?

প্রকৃতি। হাঁ, মনে পড়ে।

মা। কেন গেলি নে রাজার ঘরে। রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল।

প্রকৃতি। ভুলেছিল না তো কী। ভুলেইছিল যে, আমি মানুষ। পশু মারতে বেরিয়েছিল; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।

মা। তবু তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে। আর, ভিক্ষু, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে।

প্রকৃতি। বুঝবে না তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি, এতদিন পরে সে'ই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো আশ্চর্য।

গান

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার।
আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,

আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

তাঁকে চাই, মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এ জন্মের পূজার ডালি। অশুচি হবে না তাতে তাঁর চরণ। দেখুক সবাই আমার স্পর্ধা। গৌরব ক'রে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা, নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।

মা। মিছে রাগ করিস কেন, বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন খণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি। ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের— পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।

মা। তোর সঙ্গে কথা কইতে পারি এমন কথা আমি জানি নে। তা ভালো, আমি নিজে যাব তাঁর কাছে। পায়ে ধ'রে বলব, তুমি অন্ন নিয়ে থাক সব ঘর থেকেই, আমার ঘরে কেবল এক গণ্ডূষ জল নিতে এসো।

প্রকৃতি। গান

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে।
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে
গঙ্গাধারা মিশবে না কি কালো যমুনাতে।
আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে॥

পৃথিবী যখন অনাবৃষ্টিতে ফেটে চৌচির, কী হবে, মা, এক-ঘটি জল সংগ্রহ করে। আপনি আসবে না মেঘ আপন টানে, আকাশ ভরে দিয়ে?

মা। এ-সব কথা বলে লাভ কী। মেঘ আপনি আসে তো আসে, না আসে তো আসেই না। খেত-খন্দ যদি শুকিয়ে যায় তাতে কার কিসের গরজ। আমরা আকাশে তাকিয়ে থাকি, আর কী করতে পারি।

প্রকৃতি। সে হবে না। তাকিয়ে বসে থাকব না, মন্তর জানিস তুই, সেই মন্তর হোক আমার বাহুবন্ধন, আনুক তাঁকে টেনে।

মা। ওরে সর্বনাশী, বলিস কী! সাহস কেবলই বাড়ছে দেখি! আগুন নিয়ে খেলা! এরা কি সাধারণ মানুষ! মন্তর খাটাব এদের 'পরে? শুনে বুক কেঁপে ওঠে।

প্রকৃতি। রাজার ছেলের বেলায় মন্তর পড়তে চেয়েছিলি কোন্ সাহসে।

মা। ভয় করি নে রাজাকে, সে শূলে চড়াতে পারে। কিন্তু, এরা যে কিছুই করে না।

প্রকৃতি। আমি আর কোনো ভয় করি নে; ভয় করি, আবার যাব নেমে, আবার আপনাকে ভুলব, আবার ঢুকব আঁধার কোঠায়। সে যে মরণের বাড়া। আনতেই হবে তাঁকে, এতবড়ো কথা এত জোর করে বলছি, এ কি আশ্চর্য নয়— এই আশ্চর্যই তো ঘটিয়েছে সে। আরো আশ্চর্য কি ঘটবে না, আসবে না কি আমার পাশে। আমারি আধো আঁচলে বসবে না?

মা। তাঁকে আনতে পারি হয়তো, তুই তার মূল্য দিতে পারবি? তোর কিচ্ছুই থাকবে না বাকি!

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সেই দায়, কিচ্ছুই থাকবে না, একেবারে সমস্তই মিটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাব। তাই তো চাই তাঁকে। কিচ্ছু থাকবে না আমার। আমার যুগযুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে, মন কেবলই তাই বলছে। সার্থক হবে। সেইজন্যেই তো শুনলুম এমন আশ্চর্য কথা— জল দাও। আজ জেনেছি, আমিও পারি দিতে। এই কথা সবাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব, দেব, আজ আমার সব কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।

মা। তুই ধর্ম মানিস নে?

প্রকৃতি। কী করে বলব! তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে-ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মুখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু, সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ। কোনো ভয় আর নেই আমার— পড়্ তোর মন্তর, ভিক্ষুকে নিয়ে আয় চণ্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাঁকে সম্মান। এতবড়ো সম্মান আর কেউ দিতে পারবে না।

গান

আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার
যার অধিকার আমার দানে।
যে আমারে চিনতে পারে
সেই চেনাতেই চিনি তারে,
একই আলো চেনার পথে
তার প্রাণে আর আমার প্রাণে
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা
আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি,
ঘুমের ঢাকা গেল ফাটি,
নয়ন আমার ছুটেছে তার
আলো-করা মুখের পানে॥

মা। শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই?

প্রকৃতি। শাপ তো লেগেই আছে জন্মকাল থেকে। এক শাপের বিষে আর-এক শাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায়। কোনো কথাই শুনব না, মা, শুনব না, শুনব না। শুরু করে দে মন্ত্র। পারব না দেরি সইতে।

মা। আচ্ছা, তা হলে কী নাম তাঁর বল্‌।

প্রকৃতি। তাঁর নাম আনন্দ।

মা। আনন্দ? ভগবান বুদ্ধের শিষ্য?

প্রকৃতি। হাঁ, সেই ভিক্ষু।

মা। তুই আমার বুক-চেরা ধন, আমার চোখের মণি— তোর কথাতেই এতবড়ো পাপে হাত দিচ্ছি।

প্রকৃতি। কিসের পাপ! যিনি সবাইকে কাছে আনেন তাঁকে কাছে আনব, তাতে দোষ হয়েছে কী।

মা। ওঁরা পুণ্যের জোরে টেনে আনেন মানুষকে। আমরা মন্তর পড়ে টানি, পশুকে টানে যে-ফাঁসে। আমরা মথন করে তুলি পাঁক।

প্রকৃতি। ভালোই সে ভালোই, নইলে পঙ্কোদ্ধার হয় না।

মা। ওগো, তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রকৃতি। কিসের ভয় তোমার, মা! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ, করবই। যে-বিধানে কেবল শাস্তিই আছে, সান্ত্বনা নেই, মানব না সে বিধানকে।

গান

দোষী করো, দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম
পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে-ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি,
তারপরে সেই শূন্য ডালায়
তোমার করুণা ভরো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ—
ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।
আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য,
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি
গলায় তোমার পরো॥

মা। আচ্ছা সাহস তোর প্রকৃতি!

প্রকৃতি। আমার সাহস! ভেবে দেখ্, তাঁর সাহসের জোর! কেউ যে-কথা আমার কাছে বলতে পারে নি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত— আলো ক'রে দিলে আমার সমস্ত জন্ম; বুকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিস নি। সমস্ত সকাল বেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তীনগরে; এলেন মাঠ পেরিয়ে শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রখর রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে। আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে— জল

দাও! মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেম! নামল সেই ভীরুর কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্য। আর কিসের ভয় আমার! জল দাও! সেই জল-যে আমার জন্ম ভরে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও! এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে। তাই তো ডাকছি দিনরাত। শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর পড়ে। সইবে তাঁর সইবে।

মা। মাঠপারের রাস্তা দিয়ে ঐ-যে কারা চলেছে, প্রকৃতি, পীতবসন-পরা।

প্রকৃতি। তাই তো, ও যে দেখছি সংঘের সব শ্রমণ। শুনছ না, পড়ছেন মন্ত্র?

পথে শ্রমণেরা। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো।
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্।

প্রকৃতি। মা, ঐ-যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। এই কুয়োতলার দিকে ফিরে তাকালেন না। আর-একবার তো বলে যেতে পারতেন, জল দাও। মনে হয়েছিল, আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না, আমি যে ওঁর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি। (বসে প'ড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠুকে) এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন— হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফুটিয়ে তুলেছিল এক মুহূর্তের জন্যে। তাকে কি দয়া বলে। শেষে পড়তে হল এই মাটিতেই— চিরদিন মিশিয়ে থাকতে হবে এই মাটিতেই, যত লোক চলে রাস্তায় তাদের পায়ের তলায়।

মা। বাছা, ভুলে যা, ভুলে যা এ সমস্ত-কিছু। তোর এক নিমেষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ওরা যাচ্ছে চলে, যাক যাক। যা টেঁকবার নয় তা যত শীঘ্র যায় ততই ভালো।

প্রকৃতি। এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতি মুহূর্তের অপমান, বুকের ভিতরে এই খাঁচার পাখির পাখা-আছড়ে-মরা, একেই বলে স্বপ্ন? যা বুকের সব শিরা কামড়ে ধ'রে থাকে, ছাড়তে চায় না, তাই স্বপ্ন? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাঁধন, নেই কোনো সুখদুঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা— ভেসে চলে যায় শরৎকালের মেঘের মতো— ওরাই আছে জেগে, ওরাই স্বপ্ন নয়?

মা। তোর কষ্ট দেখতে পারি নে, প্রকৃতি। ওঠ্, তুই। আনবই তাঁকে মন্ত্র পড়ে। নিয়ে আসব ধুলোর পথ দিয়েই। 'কিছু চাই না' বলার অহংকার ভাঙব তাঁর— 'চাই চাই' বলেই আসতে হবে তাঁকে ছুটে।

প্রকৃতি। মা, তোমার মন্ত্র জীবসৃষ্টির আদিকালের। এদের মন্ত্র কাঁচা, এই

সেদিনকার। ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে। তোমার মন্ত্রের টানে খুলবে ওদের মন্ত্রের গাঁঠ। ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।

মা। কোথায় যাচ্ছে ওরা।

প্রকৃতি। ওরা যায় এইমাত্র জানি, ওরা কোনোখানেই যায় না। বর্ষা আসবে কিছুদিন পরে, তখন বসবে চাতুর্মাস্যে। আবার যাবে, কী জানি কোথায়। একেই ওরা বলে জেগে থাকা!

মা। পাগলি, তবে কী বলছিস মন্তরের কথা। চলে যাচ্ছে কত দূরে— কোথা থেকে আনব ফিরিয়ে।

প্রকৃতি। যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে, দূর নেই তোর মন্তরের কাছে।

গান

যায় যদি যাক সাগরতীরে।
আবার আসুক, আবার আসুক, আসুক ফিরে।
রেখে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে,
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুনীরে।
যায় যদি যাক শৈলশিরে।
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে॥

আমাকে করলে না দয়া, আমি ওকে দয়া করব না। তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়িস তাই— পাকে পাকে দাগ দিয়ে দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন।

মা। ভাবনা করিস নে। অসাধ্য হবে না। তোকে দেব মায়াদর্পণ। সেইটি হাতে নিয়ে নাচবি। তার ছায়া পড়বে তাতে। সেই আয়নাতেই দেখতে পাবি কী হল তার, কতদূর সে এল।

প্রকৃতি। ঐ দেখ, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ। মন্ত্র খাটবে, মা, খাটবে। উড়ে যাবে শুষ্ক সাধন, শুকনো পাতার মতো। নিববে বাতি। পথ দেখা যাবে না। ঘুরে ঘুরে এসে পড়বে এই দরজায়, নিশীথরাতে ঝড়ে বাসাভাঙা পাখি যেমন ক'রে এসে

পড়ে অন্ধকার আঙিনায়। বুক দুরদুর্ করছে, মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে বিজুলি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঢেউ উঠছে যে-সমুদ্রে তার পার দেখি নে।

মা। এখনো ভেবে দেখ্। মাঝখানে তো আঁৎকে উঠবি নে ভয়ে? ধৈর্য থাকবে তোর? মন্ত্রের বেগ চ'ড়ে যাবে যখন, হঠাৎ ঠেকাতে গেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। জলবার জিনিস সমস্ত যাবে ছাই হয়ে, তবে নিববে আগুন, এই কথাটা মনে রাখিস।

প্রকৃতি। তুই ডরছিস কার জন্যে। সে কি তেমনি মানুষ। কিছুতে কিছু হবে না তার— শেষ পর্যন্তই আসুক সে চলে, আগুনের পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। আমি মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সামনে প্রলয়ের রাত্রি, মিলনের ঝড়, ভাঙনের আনন্দ।

গান

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু, কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর;
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে,
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝংকৃত॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি। বুক ফেটে যাবে! আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না। কী ভয়ংকর দুঃখের ঘূর্ণিঝড়। বনস্পতি শেষকালে কি মড়্মড়্ করে লুটোবে ধুলোয়, অভ্রভেদী গৌরব তার পড়বে ভেঙে?

মা। দেখ্, বাছা, এখনো যদি বলিস, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমার মন্ত্রকে। তাতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে যায় যদি, যায় নিজের প্রাণ, সেও ভালো, কিন্তু ঐ মহাপ্রাণ রক্ষে পাক।

প্রকৃতি। সেই ভালো, মা, থাক্ তোমার মন্ত্র। আর কাজ নেই।—না না না না—পথ আর কতখানিই বা! শেষ পর্যন্ত আসতে দে তাকে, আসতে দে, আমার এই বুকের কাছ পর্যন্ত। তারপরে সব দুঃখ দেব মিটিয়ে, আমার বিশ্বসংসার উজাড় করে দিয়ে। গভীর রাত্রে এসে পৌঁছবে পথিক, সমস্ত বুকের জ্বালা দিয়ে জ্বালিয়ে দেব প্রদীপ, আছে সুধার ঝরনা গভীর অন্তরে, তারি জলে অভিষেক হবে তার—যে শ্রান্ত, যে তপ্ত, যে ক্ষতবিক্ষত। আর-একবার সে চাইবে, জল দাও— আমার হৃদয়সমুদ্রের জল! আসবে সেইদিন। তোর মন্ত্র চলুক, চলুক।

গান

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার॥

মা। এত দেরি হবে জানতুম না, বাছা। আমার মন্ত্র শেষ হল বুঝি। আমার প্রাণ যে কণ্ঠে এসেছে।

প্রকৃতি। ভয় নেই, মা, আর-একটু সয়ে থাক্। একটুখানি। বেশি দেরি নেই।

মা। আষাঢ় তো পড়েছে, ওঁদের চাতুর্মাস্য তো আরম্ভ হল।

প্রকৃতি। ওঁরা গেছেন বৈশালীতে গোশিরসংঘে।

মা। কী নিষ্ঠুর তুই! সে যে অনেক দূর।

প্রকৃতি। বহুদূর নয়। সাত দিনের পথ। পনরো দিন তো কেটে গেল। এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহুদূর, যা লক্ষযোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, আমার দু হাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার বুক ভূমিকম্পে।

মা। মন্ত্রের সব অঙ্গ পূর্ণ করেছি, এতে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তবু দেরি হচ্ছে। কী মরণান্তিক যুদ্ধই চলছে। কী দেখেছিলি তুই আয়নাতে।

প্রকৃতি। প্রথম দেখেছি, আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাক্যাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্ছে আগুন। তারপরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল— ফুলে-ওঠা ফেটে-পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো—লাল হয়ে উঠল রঙ। সেদিন গেল। পরের দিন দেখি, পিছনে ঘন কালো

মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জ্বলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছুটে তোকে বলতে গেলুম, এখনি সে তোর মন্ত্র বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বসে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। মনে হল, তোর মধ্যেও কোনোখানে দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। যে-পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি, আলো গেছে—শুধু দুঃখ দুঃখ দুঃখ, অসীম দুঃখের মূর্তি।

মা। মরে পড়ে গেলি নে তাই দেখে! তারই তো ঝলক লেগেছিল আমার প্রাণের মধ্যে; মনে হল, আর সইবে না।

প্রকৃতি। যে দুঃখের রূপ দেখেছি সে তো তাঁর একলার নয়, সে আমারও; আমাদের দু-জনের। ভীষণ আগুনে গ'লে মিশেছে সোনার সঙ্গে তাঁবা।

মা। ভয় হল না তোর মনে?

প্রকৃতি। ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি— মনে হল দেখলুম, সৃষ্টির দেবতা প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ংকর— আগুনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগুন কেবলই গোমরাচ্ছে গর্জাচ্ছে। সপ্তধাতুর কৌটোতে কী আছে তাঁর পায়ের সামনে— প্রাণ না মৃত্যু? আমার মনে ফুলতে লাগল একটা আনন্দ। তাকে কী বলব? নতুন সৃষ্টির বিরাট বৈরাগ্য। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দুঃখ নেই— ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ। থাকতে পারলুম না, আমার সমস্ত শরীর-মন নেচে নেচে উঠল, অগ্নিশিখার মতো।

গান

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ংকর,
ওহে শংকর, হে প্রলয়ংকর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম-
দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝন-ঝন, ঝন-নন ঝন-নন
পিণাক টংকরো॥

মা। কী রকম দেখলি তোর ভিক্ষুকে।

প্রকৃতি। দেখলুম, তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি বহুদূরে তাকিয়ে, গোধূলি-আকাশের তারার মতো। ইচ্ছে হল, আপনার কাছ থেকে চলে যাই অনন্তযোজন দূরে।

মা। তুই আয়নার সামনে তখন নাচছিলি— তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন ?

প্রকৃতি। ধিক্ ধিক্, কী লজ্জা! মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। আবার তখনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে ফেলছেন রাগের অঙ্গারগুলো। শেষকালে দেখলেম, তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে, বিঁধল গিয়ে মর্মের মধ্যে।

মা। সমস্ত সহ্য করলি তুই ?

প্রকৃতি। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই— তাঁর দুঃখ আর এর দুঃখ আজ এক। কোন্ সৃষ্টির যজ্ঞে এমন ঘটে— এতবড়ো কথা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারত !

মা। এই উৎপাত শান্ত হবে কতদিনে।

প্রকৃতি। যতদিন না আমার দুঃখ শান্ত হবে। ততদিন দুঃখ তাঁকে দেবই। আমি মুক্তি যদি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে।

মা। তোর আয়না শেষ দেখেছিস কবে।

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যেবেলায়। বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তার পরে কখনো দেখেছি, নদী পেরলেন খেয়া নৌকোয়; দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে; দেখেছি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, মাঠে তিনি একা; দেখেছি অন্ধকারে, গভীর রাত্রে, বনের পথে। যত যাচ্ছে দিন, স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহ্বলতা, দেহে একটা শৈথিল্য— দুই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই; নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমন্দ; আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোনো অর্থ।

মা। আজ কোথায় এসেছেন আন্দাজ করতে পারিস ?

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলী নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা উন্মত্ত, ঘাটের কাছে পুরোনো পিপুল গাছ, জোনাকি জ্বলছে ডালে ডালে, তলায় শেওলা-ধরা বেদী— সেইখানে এসেই হঠাৎ চম্‌কে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা; শুনেছি, ঐখানে বসে ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজা সুপ্রভাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ভাঙল হঠাৎ। তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না, ভয় হল কী জানি কী দেখব। তারপরে গেছে সমস্ত দিন, কিছু জানতে চাই নি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি—এমনি করে আছি বসে। এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাস্তায়, এক প্রহর গেল বুঝি

কেটে! আর সময় নেই, সময় নেই, মা, এ রাত ব্যর্থ করিস নে। তোর সব জোরটা দে ঐ মন্ত্রে।

মা। আর পারছি নে, বাছা। মন্ত্র দুর্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।

প্রকৃতি। দুর্বল হলে চলবে না। দিস নে হাল ছেড়ে। ফেরবার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন বা, বাঁধনে শেষ টান পড়েছে— হয়তো টিঁকবে না। হয়তো বেরিয়ে যাবেন আমার এ জন্মের সংসার থেকে, আর পাব না নাগাল কিছুতেই। তখন আমারই স্বপ্নের পালা, আবার চণ্ডালিনীর মায়ামূর্তি। পারব না সইতে সেই মিথ্যে। পায়ে পড়ি, মা, দে একবার তোর সমস্ত শক্তি। এবার শুরু কর্ তোর বসুন্ধরামন্ত্র, টলতে থাক্ পুণ্যবানদের তুষিত স্বর্গলোক।

গান

আমি তোমারি মাটির কন্যা,
জননী বসুন্ধরা।
তবে আমার মানবজন্ম
কেন বঞ্চিত করা।
পবিত্র জানি যে তুমি
পবিত্র জন্মভূমি—
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা
প্রাণের পুণ্যে ভরা।
কোন্ স্বর্গের তরে
ওরা তোমায় তুচ্ছ করে,
রহি তোমার বক্ষ-'পরে।
আমি যে তোমারি আছি
নিতান্ত কাছাকাছি—
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে
হৃদয়প্রাণ-হরা॥

মা। যেমন বলেছিলেম তেমনি প্রস্তুত হয়েছ তো?

প্রকৃতি। হয়েছি! কাল ছিল শুক্লাদ্বিতীয়ার রাত, করেছি গম্ভীরায় অবগাহন-স্নান। এই তো চাল দিয়ে, দাড়িমের ফুল দিয়ে, সিঁদুর দিয়ে, সাতটি রত্ন দিয়ে, চক্র

এঁকেছি আঙিনায়। পুঁতেছি হলদে কাপড়ের ধ্বজাগুলি, থালায় রেখেছি মালাচন্দন, জ্বালিয়েছি বাতি। স্নানের পর কাপড় পরেছি ধানের অঙ্কুরের রঙ, চাঁপার রঙের ওড়না। পুবদিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেছি তাঁর মূর্তি। ষোলোটি সোনালি সুতোয় ষোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেছি বাঁ হাতে।

মা। আচ্ছা, তবে নাচো তোমার সেই আহ্বানের নাচ—প্রদক্ষিণ করো। আমি বেদীর কাছে মন্ত্র পড়ছি।

প্রকৃতি। গান

মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো
সৌরভ-অমৃতে।
মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো
গৌরবনিশীথে।
এই মূল্যহারা মম শুক্তি,
এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি।
মম মৌনী বীণার তারে তারে
এসো সংগীতে।
নব-অরুণের এসো আহ্বান—
চিররজনীর হোক অবসান, এসো।
এসো শুভস্মিত শুকতারায়,
এসো শিশির-অশ্রুধারায়,
সিন্দূর পরাও উষারে
তব রশ্মিতে॥

মা। প্রকৃতি, এইবার তোমার আয়নাটা নিয়ে দেখো। দেখছ—কালো ছায়া পড়েছে বেদীটার উপরে? আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, পারছি নে। দেখো আয়নাটা—আর কত দেরি।

প্রকৃতি। না, দেখব না, দেখব না, আমি শুনব মনের মধ্যে—ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব যদি দেখা দেন। আর-একটু সয়ে থাকো, মা— দেবেন দেখা, নিশ্চয় দেবেন। ঐ দেখো, হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়, পদভরে পৃথিবী কাঁপছে থর্‌থরিয়ে, বুক উঠছে গুর্‌গুর্‌ করে।

মা। আনছে তোর অভিশাপ হতভাগিনী। আমাকে তো মেরে ফেললে! ছিঁড়ল বুঝি শিরাগুলো।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে। ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দুলছে আমার প্রাণ। ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ— আমার সমস্ত অপমানের চূড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন। আমার লজ্জা দিয়ে, ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে।

মা। সময় হয়ে আসছে আমার। আর পারছি নে। শিগ্‌গির দেখ্‌ তোর আয়নাটা।

প্রকৃতি। মা, ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে— তার পরে? তার পরে কী। শুধু এই আমি! আর কিচ্ছু না! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্যে এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে!

গান

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে শেষে।
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে।
ঢেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার,
সম্মুখে ঘন আঁধার—
পার আছে কোন্ দেশে।
আজ ভাবি মনে মনে,
মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই—
মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে॥

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে, দয়া কর্ আমাকে। আমার আর সহ্য হয় না। শিগ্‌গির আয়নাটা দেখ্‌।

প্রকৃতি। (আয়নাটা দেখেই ফেলে দিল) মা, ওমা, ওমা, রাখ্‌ রাখ্‌ রাখ্‌ রাখ্‌, ফিরিয়ে নে ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র! এখনি, এখনি। ওরে ও রাক্ষুসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলি নে কেন! কী দেখলেম! ওগো, কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের

কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে! মাথা হেঁট করে এল! যাক, যাক, এ-সব যাক (পা দিয়ে মন্ত্রের উপকরণ ভেঙে ছড়িয়ে ফেললে)— ওরে, তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিস নে বীরের। জয় হোক তাঁর জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে— তাই এত দুঃখই পেলে— ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে! ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধুলো-লাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেবে মুছে। জয় হোক তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।

মা। জয় হোক, প্রভু। আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই— তোমার ক্ষমার তীরে এসে।

[মৃত্যু

আনন্দ। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো।
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো।
বন্দামি বুদ্ধম্ আহমাদরেণ তম্॥

তাসের দেশ

উৎসর্গ

কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খর বায়ু বয় বেগে,
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বারবার
ঝন্‌ঝন্‌ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দুর্বার
সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
গণি গণি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাহি যাই রে।
সংশয়পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত,
তালে তার দিয়ো তাল,
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

তাসের দেশ

প্রথম দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। আর তো চলছে না, বন্ধু।

সদাগর। কিসের চাঞ্চল্য তোমার, রাজকুমার।

রাজপুত্র। কেমন ক'রে বলব। কিসের চাঞ্চল্য বলো দেখি ঐ হাঁসের দলের, বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

সদাগর। সেখানে যে ওদের বাসা।

রাজপুত্র। বাসা যদি, তবে ছেড়ে আসে কেন। না না, ওড়বার আনন্দ, অকারণ আনন্দ।

সদাগর। তুমি উড়তে চাও?

রাজপুত্র। চাই বই কি।

সদাগর। বুঝতেই পারি নে তোমার কথা। আমি তো বলি অকারণ ওড়ার চেয়ে সকারণ খাঁচায় বন্ধ থাকাও ভালো।

রাজপুত্র। সকারণ বলছ কেন।

সদাগর। আমরা-যে সোনার খাঁচায় থাকি শিকলে বাঁধা দানাপানির লোভে।

রাজপুত্র। তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে না।

সদাগর। আমার ও দোষটা আছে, যা বোঝা যায় না তা আমি বুঝতেই পারি নে। একটু স্পষ্ট করেই বলো-না, কী তোমার অসহ্য হল।

রাজপুত্র। রাজবাড়ির এই একঘেয়ে দিনগুলো।

সদাগর। একঘেয়ে বল তাকে? কতরকম আয়োজন, কত উপকরণ।

রাজপুত্র। নিজেকে মনে হয় যেন সোনার মন্দিরে পাথরের দেবতা। কানের কাছে কেবল একই আওয়াজে বাজছে শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা। নৈবেদ্যের বাঁধা বরাদ্দ, কিন্তু ভোগে রুচি নেই। এ কি সহ্য হয়।

সদাগর। আমাদের মতো লোকের তো খুবই সহ্য হয়। ভাগ্যিস বাঁধা বরাদ্দ। বাঁধন ছিঁড়লেই তো মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হয়। যা পাই তাতেই আমাদের ক্ষুধা মেটে। আর, যা পাও না তাই দিয়েই তোমরা মনে মনে ক্ষুধা মেটাতে চাও।

রাজপুত্র। আর, রোজ রোজ ঐ-যে চারণদের স্তব শুনতে হয় একই বাঁধা ছন্দে—সেই শার্দূলবিক্রীড়িত।

সদাগর। আমার তো মনে হয়, স্তব জিনিসটা বারবার যতই শোনা যায় ততই লাগে ভালো। কিছুতেই পুরোনো হয় না।

রাজপুত্র। ঘুম ভাঙতেই সেই এক বৈতালিকের দল। আর, রোজ সকালে সেই এক পুরুতঠাকুরের ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ। আর আসতে যেতে দেখি, সেই বুড়ো কঞ্চুকীটা কাঠের পুতুলের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। কোথাও যাবার জন্যে একটু পা বাড়িয়েছি কি অমনি কোথা থেকে প্রতিহারী এসে হাজির, বলে—ইত ইতো, ইত ইতো, ইত ইতো। সব্বাই মিলে মনটাকে যেন বুলি-চাপা দিয়ে রেখেছে।

সদাগর। কেন, মাঝে মাঝে যখন শিকারে যাও তখন বুনোজন্তু ছাড়া আর-কোনো উৎপাত তো থাকে না।

রাজপুত্র। বুনোজন্তু বলো কাকে। আমার তো সন্দেহ হয়, রাজশিকারী বাঘগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে। ওরা যেন অহিংস্রনীতির দীক্ষা নিয়েছে। এ পর্যন্ত একটাকেও তো ভদ্ররকম লাফ মারতে দেখলুম না।

সদাগর। যাই বল, বাঘের এই আচরণকে আমি তো অসৌজন্য ব'লে মনে করি নে। শিকারে যাবার ধুমধামটা সম্পূর্ণই থাকে, কেবল বুক দুর্‌দুর্‌ করে না।

রাজপুত্র। সেদিন ভালুকটাকে বহুদূর থেকে তীর বিঁধেছিলুম, তা নিয়ে চার দিক থেকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; বললে, রাজপুত্রের লক্ষ্যভেদের কী নৈপুণ্য! তার পরে কানাকানিতে শুনলুম, একটা মরা ভালুকের চামড়ার মধ্যে খড়বিচিলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। এতবড়ো পরিহাস সহ্য করতে পারি নি। শিকারীকে কারাদণ্ডের আদেশ করে দিয়েছি।

সদাগর। তার উপকার করেছ। তার সে কারাগারটা রানীমার অন্দরমহলের সংলগ্ন, সে দিব্য সুখে আছে। এই তো সেদিন, তার জন্য তিন মন ঘি আর তেত্রিশটা পাঁঠা পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের গদি থেকে।

রাজপুত্র। এর অর্থ কী।

সদাগর। সে ভালুকটার সৃষ্টি যে রানীমারই আদেশে।

রাজপুত্র। ঐ তো। আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে। নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ঐ-যে

ফসলখেতে ওদের চাষ করতে দেখি, আর ভাবি, পূর্বপুরুষের পুণ্যে ওরা জন্মেছে চাষী হয়ে।

সদাগর। আর, ওরা তোমার কথা কী ভাবে সে ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো দেখি। রাজপুত্র, তুমি কী সব বাজে কথা বলছ— মনের আসল কথাটা লুকিয়েছ। ওগো পত্রলেখা, আমাদের রাজপুত্রের গোপন কথাটি হয়তো তুমিই আন্দাজ করতে পারবে, একবার সুধিয়ে দেখো-না।

পত্রলেখার প্রবেশ

গান

পত্রলেখা। গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে।
বিভল হাসিতে
বাজিল বাঁশিতে,
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে।
পত্রলেখা। মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনায় আলোক-পিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয়শতদল
করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে॥

রাজপুত্র। আছে আমার গোপন কথা, সে কথাটা গোপন রয়েছে দূরের আকাশে। সমুদ্রের ধারে বসে থাকি পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে। সেইখানে আমার অদৃষ্ট যা যক্ষের ধনের মতো গোপন ক'রে রেখেছে যাব তারই সন্ধানে।

গান

যাবই আমি যাবই ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই।

সদাগর। ও কী কথা। বাণিজ্য? ও যে তুমি সদাগরের মন্ত্র আওড়াচ্ছ।

রাজপুত্র।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বালুর তীরে।

সদাগর। অকূলের নাবিকগিরি ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়া, এ তো বাণিজ্যের রাস্তা নয়। খবর কিছু পেয়েছ কি।

রাজপুত্র। পেয়েছি বই কি। পেয়েছি আভাসে, পেয়েছি স্বপ্নে।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগরবিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সাত রাজার ধন মানিক পাবই
সেথায় নামি যদি॥

সদাগর। তোমার গানের সুরে বোঝা যাচ্ছে, এ মানিকটি তো সদাগরি মানিক নয়, এ মানিকের নাম বলো তো।

রাজপুত্র। নবীনা! নবীনা!

সদাগর। নবীনা! এতক্ষণে একটা স্পষ্ট কথা পাওয়া গেল।

রাজপুত্র। স্পষ্ট হয়ে রূপ নিতে এখনো দেরি আছে।

গান

হে নবীনা, হে নবীনা।

প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা।

শুনি বাণী ভাসে

বসন্তবাতাসে,

প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা।

সদাগর। তোমার এ স্বপ্নের ধন কিন্তু সংগ্রহ করা শক্ত হবে।

রাজপুত্র। স্বপনে দাও ধরা

কী কৌতুকে ভরা।

কোন্ অলকার ফুলে

মালা গাঁথ চুলে,

কোন্ অজানা সুরে

বিজনে বাজাও বীণা॥

রাজমাতার প্রবেশ

সদাগর। রানীমা, উনি মরীচিকাকে জাল ফেলে ধরবেন, উনি রূপকথার দেশের সন্ধান পেতে চান।

মা। সে কী কথা। আবার ছেলেমানুষ হতে চাস নাকি।

রাজপুত্র। হাঁ, মা, বুড়োমানুষির সুবুদ্ধি-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

মা। বুঝেছি, বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তুমি চাইতে চাও, আজ পর্যন্ত সে সুযোগ তোমার ঘটে নি।

রাজপুত্র। গান

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো

যারে নাহি পাই গো।'

সকল পাওয়ার মাঝে

আমার মনে বেদন বাজে,

'নাই নাই নাই গো।'

হারিয়ে যেতে হবে,

ফিরিয়ে পাব তবে,

সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে
ভোরের তারায় জাগবে ব'লে,
বলে সে, 'যাই যাই যাই গো।'

মা। বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় ক'রে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ। যাই কুলদেবতার পুজো সাজাতে। সন্ধ্যার সময় আরতির কাজল পরাব চোখে। পথে দৃষ্টির বাধা যাবে কেটে।

[রাজমাতার প্রস্থান

রাজপুত্র। গান

হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশমনে
রইব না আর কভু।
অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ ক'রে
অপূর্ব ধন যত—
ভিখারি মন ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেম আর-এক ডাঙায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শুরু হল।

সদাগর। রাজপুত্র, তুমি তো কেবলই নতুন নতুন করে অস্থির হলে। আমি ভয় করি ঐ নতুনকেই। যাই বল, বন্ধু, পুরোনোটা আরামের।

রাজপুত্র। ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে। এটা বুঝলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

সদাগর। রাজতিলক তোমার ললাটে তো নিয়েই এসেছ জন্মমুহূর্তে।

রাজপুত্র। সে তো অদৃষ্টের ভিক্ষেদানের ছাপ। যমরাজ মহাসমুদ্রের জলে সেটা কপাল থেকে মুছে দিয়ে হুকুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে, নতুন দেশে।—

গান

এলেম নতুন দেশে।
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে।
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে
ফাগুনমাসে
বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে,
মাতবে দখিনবায়
মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়
চঞ্চলিত এলোকেশে॥

সদাগর। রাজপুত্র, তোমার গানের সুরে কথাটা শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এদেশে যৌবনের নবীন রূপ দেখলে কোথায়। চারিদিকটা তো একবার ঘুরে এসেছি। দেখে মনে হল, যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা, পা ফেলছে খিট্‌খুট্ খিট্‌খুট্ শব্দে, বোধকরি চৌকুনি নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরি সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ।

রাজপুত্র। এর থেকেই বুঝবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলোস। আমরা এসেছি কী করতে— খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগর। আমরা সদাগর মানুষ, যা পষ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর, যা দেখতে পাও না তারই উপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্যে থেকে আগুন বেরোয় কি না। আমার তো মনে হয়, ফুঁ দিতে দিতে দম ফুরিয়ে যাবে। ঐ দেখো-না, এই দিকেই আসছে— এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

রাজপুত্র। একটু সরে দাঁড়ানো যাক। দেখি-না কাণ্ডটা কী।

তাসের দলের প্রবেশ

তাসের কাওয়াজ

গান

তোলন নামন,
পিছন সামন,
বাঁয়ে ডাইনে
চাই নে চাই নে,
বোসন ওঠন,
ছড়ান গুটন,
উলটো-পালটা
ঘূর্ণি চালটা—
বাস্ বাস্ বাস্।

সদাগর। দেখছ ব্যাপারটা! লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শুচ্ছে বসছে একেবারে অকারণে— ভারি অদ্ভুত। হা হা হা হা।





শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক তাসের দেশের অভিনয়

ছক্কা। এ কী ব্যাপার! হাসি!

পঞ্জা। লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!

ছক্কা। নিয়ম মান না তোমরা! হাসি!

রাজপুত্র। হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু, তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা। অর্থ? অর্থের কী দরকার। চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পার না? পাগল নাকি তোমরা!

রাজপুত্র। খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে।

পঞ্জা। চাল চলন দেখে।

রাজপুত্র। কী রকম দেখলে।

ছক্কা। দেখলেম, কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই।

সদাগর। আর, তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই?

পঞ্জা। জান না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগণ্ড, অর্বাচীন, অজাতশ্মশ্রু।

ছক্কা। গুরুমশায়ের হাতে মানুষ হও নি। কেউ বুঝিয়ে দেয় নি, রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাঁটা আছে খোঁচা আছে— চলন জিনিসটার আপদ বিস্তর।

রাজপুত্র। এ দেশটা তো গুরুমশায়েরই দেশ। শরণ নেব তাঁদের।

ছক্কা। এবার তোমাদের পরিচয়টা?

রাজপুত্র। আমরা বিদেশী।

পঞ্জা। বাস্‌। আর, বলতে হবে না। তার মানে, তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই, গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গুষ্টি নেই, শ্রেণী নেই, পংক্তি নেই।

রাজপুত্র। কিছু নেই, কিছু নেই— সব বাদ দিয়ে এই যা আছে, দেখছই তো। এখন তোমাদের পরিচয়টা?

ছক্কা। আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ।

পঞ্জা। আমি পঞ্জা বর্মণ।

রাজপুত্র। ঐ যারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে?

ছক্কা। কালো-হানো, ঐ তিরি ঘোষ।

পঞ্জা। আর, রাঙা-মতো এই দুরি দাস।

সদাগর। তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছক্কা। ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।

পঞ্জা। এই কারণে কোনো কোনো ম্লেচ্ছভাষায় আমাদের তাসবংশীয় না ব'লে হাইবংশীয় বলে।

সদাগর। আশ্চর্য।

ছক্কা। শুভ গোধূলিলগ্নে পিতামহ চার মুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই।

সদাগর। বাস্ রে। ফল হল কী।

ছক্কা। বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ ক'রে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিঁড়েতন। এঁরা সকলেই প্রণম্য। (প্রণাম)

রাজপুত্র। সকলেই কুলীন ?

ছক্কা। কুলীন বই কি। মুখ্য কুলীন। মুখ থেকে উৎপত্তি।

পঞ্জা। তাসবংশের আদিকবি ভগবান তাসরঙ্গনিধি দিনের চার প্রহর ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন সেই ছন্দের মাত্রা গুনে গুনে আমাদের সাড়ে-সাঁইত্রিশ রকমের পদ্ধতির উদ্ভব।

রাজপুত্র। অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

পঞ্জা। আচ্ছা, তাহলে মুখ ফেরাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম। ভাই ছক্কা, ঠুং মন্ত্র প'ড়ে ওদের কানে একটা ফুঁ দিয়ে দাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম।

তাসের দলের গান

হা-আ-আ-আই।
হাতে কাজ নাই।
দিন যায় দিন যায়।
আয় আয় আয় আয়।
হাতে কাজ নাই॥

রাজপুত্র। আর সহ্য করতে পারছি নে, মুখ ফেরাতে হল।

পঞ্জা। এঃ! ভেঙে দিলে মন্ত্রটা! অশুচি করে দিলে!

রাজপুত্র। অশুচি?

পঞ্জা। অশুচি নয় তো কী। মন্ত্রের মাঝখানটায় বিদেশীর দৃষ্টি পড়ল।

রাজপুত্র। এখন উপায়?

ছক্কা। বাছুড়ে-খাওয়া গাবের আঁটি পুড়িয়ে তিন দিন চোখে কাজল পরতে হবে, তবেই স্বর্গে পিতামহদের উপোষ ভাঙবে।

রাজপুত্র। বিপদ ঘটিয়েছি তো। তোমাদের দেশে খুব সাবধানে চলতে হবে।

ছক্কা। একেবারে না চললেই ভালো হয়, শুচি থাকতে পারবে।

রাজপুত্র। শুচি থাকলে কী হয়।

পঞ্জা। কী আর হবে, শুচি থাকলে শুচি হয়। বুঝতে পারছ না?

রাজপুত্র। আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ পাড়ির উপরে কী করছিলে দল বেঁধে।

ছক্কা। যুদ্ধ।

রাজপুত্র। তাকে বল যুদ্ধ?

পঞ্জা। নিশ্চয়! অতি বিশুদ্ধ নিয়মে। তাসবংশোচিত আচার-অনুসারে।

গান

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র,
অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।

সদাগর। তা হোক। যুদ্ধে একটু রাগারাগি না হলে রস থাকে না।

ছক্কা। আমাদের রাগ রঙে।

আমাদের যুদ্ধ—
নহে কেহ ক্রুদ্ধ,
ঐ দেখো গোলাম
অতিশয় মোলাম।

সদাগর। তা হোক-না, তবু কামান-বন্দুকটা যুদ্ধক্ষেত্রে মানায় ভালো।

পঞ্জা। নাহি কোনো অস্ত্র,
খাকি-রাঙা বস্ত্র।
নাহি লোভ,
নাহি ক্ষোভ,
নাহি লাফ,
নাহি ঝাঁপ।

রাজপুত্র। নাই রইল, তবু একটা নালিশ থাকা চাই তো। তাই নিয়েই তো দুই পক্ষে লড়াই।

ছক্কা। যথারীতি জানি,
সেইমতে মানি,
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র,
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা॥

পঞ্জা। ওহে বিদেশী, শাস্ত্রমতে তোমাদেরও তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল?

সদাগর। নিশ্চিত। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির গোড়াতেই সূর্যকে যেই শানে চড়িয়েছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তিনি কামানের মতো আওয়াজ ক'রে হেঁচে ফেললেন— সেই বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।

ছক্কা। এখন বোঝা গেল! তাই এত চঞ্চল!

রাজপুত্র। স্থির থাকতে পারি নে, ছিটকে ছিটকে পড়ি।

পঞ্জা। সেটা তো ভালো নয়।

সদাগর। কে বলছে ভালো। আদিযুগের সেই হাঁচির তাড়া আজও সামলাতে পারছি নে।

ছক্কা। একটা ভালো ফল দেখতে পাচ্ছি— এই হাঁচির তাড়ায় তোমরা সকাল-সকাল এই দ্বীপ থেকে ছিটকে পড়বে, টিঁকতে পারবে না।

সদাগর। টেঁকা শক্ত।

পঞ্জা। তোমাদের যুদ্ধটা কী ধরনের।

সদাগর। সেটা দুই দুই পক্ষের চার চার জোড়া হাঁচির মাপে।

ছক্কা। হাঁচির মাপে? বাস্ রে, তাহলে মাথা ঠোকাঠুকি হবে তো!

সদাগর। হাঁ, একেবারে দমাদ্দম।

ছক্কা। তোমাদেরও আদিকবির মন্ত্র আছে তো?

সদাগর। আছে বইকি।

গান

হাঁচ্ছোঃ,
ভয় কী দেখাচ্ছ।

ধরি টিপে টুঁটি,
মুখে মারি মুঠি,
বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ ॥

ছক্কা। ওহে ভাই পঞ্জা, একেবারে অসবর্ণ। কী জাতি তোমরা।

সদাগর। আমরা নাশক, নাসা থেকে উৎপন্ন।

পঞ্জা। কোনো উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম তো শুনি নি।

সদাগর। হাইয়ের বাষ্পে তোমরা উড়ে গেছ উচ্চে, পরলোকের পারে; হাঁচির চোটে আমরা পড়েছি নিচে, এই ইহলোকের ধারে।

ছক্কা। পিতামহের নাসিকার অসংযমবশতই তোমরা এমন অদ্ভুত।

রাজপুত্র। এতক্ষণে ঠিক কথাটাই বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকে, আমরা অদ্ভুত।

গান

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল।
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত ॥

ছক্কা-পঞ্জা। (পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না, এ চলবে না।

রাজপুত্র। যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।

ছক্কা। কিন্তু, নিয়ম!

রাজপুত্র। বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব কী করে।

পঞ্জা। ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অম্লানমুখে ব'লে বসল, এগোব।

রাজপুত্র। নইলে চলা কিসের জন্যে।

ছক্কা। চলা! চলবে কেন তুমি! চলবে নিয়ম

গান

চলো নিয়ম-মতে।
দূরে তাকিয়ে নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,
চলো সমান পথে।

রাজপুত্র। হেরো অরণ্য ওই,
হোথা শৃঙ্খলা কই,
পাগল ঝরনাগুলো
দক্ষিণ পর্বতে।

তাসের দল। ওদিকে চেয়ো না চেয়ো না,
যেয়ো না যেয়ো না—
চলো সমান পথে॥

পঞ্জা। আর নয়, ঐ আসছেন রাজাসাহেব, আসছেন রানীবিবি। এইখানে আজ সভা। এই নাও ভুঁইকুমড়োর ডাল একটা ক'রে।

রাজপুত্র। ভুঁইকুমড়োর ডাল? হা হা হা হা— কেন।

পঞ্জা। চুপ। হেসো না, নিয়ম। বোসো ঈশান কোণে মুখ ক'রে, খবরদার বায়ুকোণে মুখ ফিরিয়ো না।

রাজপুত্র। কেন।

ছক্কা। নিয়ম।

রাজা রানী টেক্কা গোলাম প্রভৃতির
যথারীতি যথাভঙ্গীতে প্রবেশ

রাজপুত্র। ওহে ভাই, স্তবগান করে রাজাকে খুশি করে দিই। তুমি ভুঁইকুমড়োর ডালটা দোলাও।

গান

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস,
তন্দ্রাতীরনিবাসী,
সব-অবকাশ ধ্বংস।

তাসের দল। ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা! অকালে সভা দিলে ভেঙে, বর্বর!

রাজা। শান্ত হও, এরা কারা।

ছক্কা। বিদেশী।

রাজা। বিদেশী! তাহলে নিয়ম খাটবে না। একবার সকলে ঠাঁই বদল করে নাও, তাহলেই দোষ যাবে কেটে। সর্বাগ্রে তাসমহাসভার জাতীয় সংগীত।

সকলে। গান

চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন—
অতি সনাতন ছন্দে
করতেছে নর্তন
চিঁড়েতন হর্তন।
কেউ বা ওঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে
করে কালকর্তন।
নাহি কহে কথা কিছু,
একটু না হাসে,
সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোনো উলটা-পালটা,
নাই পরিবর্তন॥

রাজা। ওহে বিদেশী।

রাজপুত্র। কী রাজাসাহেব।

রাজা। কে তুমি।

রাজপুত্র। আমি সমুদ্রপারের দূত।

গোলাম। ভেট এনেছ কী।

রাজপুত্র। এদেশে সব চেয়ে যা দুর্লভ, তাই এনেছি।

গোলাম। সেটা কী শুনি।

রাজপুত্র। উৎপাত।

ছক্কা। শুনলে তো রাজাসাহেব, কথাটা তো শুনলে? লোকটা এগোতে চায়,

বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা হাসে। দুদিনে এখানকার হাওয়া দেবে হালকা করে।

গোলাম। এখানকার হাওয়া যেমন স্থির, যেমন ভারী, এমন কোনো গ্রহে নেই। ইন্দ্রের বিদ্যুৎ পর্যন্ত একে নাড়া দিতে পারে না, অন্যে পরে কা কথা।

সকলে। (একবাক্যে) অন্যে পরে কা কথা।

গোলাম। লঘুচিত্ত বিদেশী এই হাওয়াকে যদি হালকা করে তাহলে কী হবে।

রাজা। সেটা চিন্তার বিষয়।

সকলে। সেটা চিন্তার বিষয়।

গোলাম। হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে। ঝড় এলেই নিয়ম যায় উড়ে। তখন আমাদের পুরুত-ঠাকুর নহলা গোস্বামী পর্যন্ত বলতে শুরু করবেন, আমরা এগোব।

পঞ্জা। এমন-কি, ভগবান না করুন, হয়তো এখানে হাসিটা সংক্রামক হয়ে উঠবে।

রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম। কী রাজাসাহেব।

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা। তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না।

গোলাম। বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতামূলক আইন!

গোলাম। কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

রাজা। আচ্ছা, পরে হবে। বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপুত্র। আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা। কার কাছে।

রাজপুত্র। এই রাজকুমারীদের কাছে।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

রাজপুত্র। গান

ওগো, শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।
কুঞ্জবনে এসো একা,
নয়নে অশ্রু দিক দেখা,
অরুণরাগে হোক রঞ্জিত
বিকশিত বেদনার মঞ্জরী॥

রানী। এ কী অনিয়ম, এ কী অবিচার!

পঞ্জা। রাজাসাহেব, নির্বাসন, ওকে নির্বাসন!

রাজা। নির্বাসন! রানীবিবি, তোমার কী মত। চুপ ক'রে রইলে যে। শুনছ আমার কথা? একটা উত্তর দাও। কী বল, নির্বাসন তো?

রানী। না, নির্বাসন নয়।

টেক্কাকুমারীরা। (একে একে) না, নির্বাসন নয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমাকে যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

রানী। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কেমন-কেমন।

গোলাম। টেক্কাকুমারী, বিবিসুন্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসদ্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

গোলাম। জারি করো বাধ্যতামূলক আইন।

রাজা। অর্থাৎ?

গোলাম। কানমলা মোচড়ের আইন।

রাজা। বুঝেছি। রানীবিবি, তোমার কী মত। বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই?

রানী। বাধ্যতামূলক আইন অন্দরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি— দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।

টেক্কাকুমারীরা। (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।

গোলাম। এ কী হল। হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি।

রাজা। সভা ভেঙে দিলুম। এখনি সবাই চলে এসো। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

[তাসের দলের প্রস্থান

সদাগর। ভাই সাঙাত, এখানে তো আর সহ্য হচ্ছে না। এরা যে বিধাতার ব্যঙ্গ। এদের মধ্যে প'ড়ে আমরা শুদ্ধ মাটি হয়ে যাব।

রাজপুত্র। ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা কি তোমার চোখে পড়ে না। পুতুলের মধ্যে প্রথম প্রাণের সঞ্চার কি অনুভব করছ না। আমি তো শেষ পর্যন্ত না দেখে যাচ্ছি নে।

সদাগর। কিন্তু, এ যে জীবন্মৃতের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন।

রাজপুত্র। ঐ দিকে চোখ মেলে দেখো দেখি।

সদাগর। তাই তো, বন্ধু, লেগেছে সমুদ্রপারের মন্ত্র। ইস্কাবনের নহলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, দেখছি এখানকার নিয়ম গেল উড়ে।

রাজপুত্র। চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ শুনছে আকাশ থেকে। এ সময়ে বোধহয় আমাদের সঙ্গটা ওর পছন্দ হবে না। চলো, আমরা সরে যাই।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রসাধনে রত ইস্কাবনী। টেক্কানীর প্রবেশ

টেক্কানী। গান

বলো, সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে-নাম বাজে তোমার বীণার তানে তানে।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে-নাম মিলে যাবে,
বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়
সে-নাম মদির হবে-যে বকুলঘ্রাণে।
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে-নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে
সে-নাম শুনাইব গানে গানে॥

ইস্কাবনী। ভাই, এ কী হল বলো তো এই তাসের দেশে। ঐ বিদেশীরা কী খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে এল। মনটা কেবলই টলমল করছে।

টেক্কানী। হাঁ, ভাই ইস্কাবনী, আর দু দিন আগে কে জানত তাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছী ছী, কী লজ্জা।

ইস্কাবনী। বলো তো, ভাই, মানুষপনা, এ-যে অনাচার। এ কিন্তু শুরু করেছে তোমাদের ঐ হরতনী। দেখিস নি? আজকাল ওর চলন ঠিক থাকে না, একেবারে হুবহু মানুষের ভঙ্গী। কার পাশে কখন দাঁড়াতে হবে তারও সমস্ত ভুল হয়ে যায়, পাড়ায় টী টী পড়ে গেছে। তাসের দেশের নাম ডোবালে।

চিঁড়েতনীর প্রবেশ

চিঁড়েতনী। কী গো টেক্কাঠাকরুন, শুনেছি, আমাদের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। বলছ, আমরা আচার খুইয়ে, ওঠবার বেলায় বসি, বসবার বেলায় উঠি।

টেক্কানী। তা, সত্যি কথা বলেছি, দোষ হয়েছে কী। ঐ-যে তোমার গাল দুটি টুকটুক করছে, রঙ্গিনী, সে কোন্ রঙে। আর, ঐ-যে তোমার ভুরুর ভঙ্গিমা, ধার করেছ কোন্ বিদেশী অমাবস্যার কাজললতা থেকে। এটা তো সাতজন্মে তাসের দেশের শাস্তরে লেখে না। তুমি কি ভাব', এ কারো চোখে পড়ে না।

চিঁড়েতনী। মরে যাই! আর, তুমি যে তোমার ঐ সখীটিকে নিয়ে বকুলতলায় বসে দিনরাত কানে কানে ফিস্-ফিস্ করছ, এটাই কি তাসের দেশের শাস্ত্রে লেখে না কি। ওদিকে-যে গোলাম বেচারা তার জুড়ি পায় না, মরে হায়-হায় ক'রে।

ইস্কাবনী। আহা, গুরুঠাকরুন, উপদেশ দিতে হবে না। চুলে যে রাঙা ফিতেটা জড়িয়েছ ঐ ফিতে দিয়ে তাসের দেশের আচার বিচার গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এতবড়ো বেহায়াগিরি তাসরমণী হয়ে!

চিঁড়েতনী। তা, হয়েছে কী। আমি ভয় করি নে কাউকে, তোমাদের মতো লুকোচুরি আমার স্বভাব নয়। ঐ-যে তোমাদের দহলানী সেদিন আমাকে মানবী ব'লে টিট্‌কারী দিতে এসেছিল, আমি তাকে পষ্ট জবাব দিয়েছি, তোমাদের তাসিনী হয়ে মরে থাকার চেয়ে মানবী হতে পারলে বেঁচে যেতুম।

ইস্কাবনী। অত গুমোর কোরো না গো কোরো না— জান? তোমাকে জাতে ঠেলবে ব'লে কথা উঠেছে।

চিঁড়েতনী। তাসের জাত তো, আমি তা নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাকে ভয় দেখাবে কিসে।

ইস্কাবনী। সর্বনাশ! এমন ধাষ্টমির কথা তো সাত জন্মে শুনি নি। উনি ঢাক পিটিয়ে মানবী হতে চলেছেন। চল্ ভাই, টেক্কারানী, কে কোথা থেকে দেখবে, ওর সঙ্গে কথা কচ্ছি, আমাদের সুদ্ধ মজাবে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীমতী হরতনী টেক্কার প্রবেশ

হরতনী। গান

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানি নে কী ছিল মনে।
এ তো ফুল তোলা নয়, এ তো ফুল তোলা নয়,
বুঝি নে কী মনে হয়,
জল ভরে যায় দু নয়নে॥

রুইতনের সাহেবের প্রবেশ

রুইতন। এ কী, হরতনী, তুমি এখানে? খুঁজতে খুঁজতে বেলা হয়ে গেল যে।

হরতনী। কেন, কী হয়েছে, কী চাই।

রুইতন। তোমাকে ডাক পড়েছে রাজসভার গরাবুমগুলে।

হরতনী। বলো গে, আমি হারিয়ে গেছি।

রুইতন। হারিয়ে গেছ?

হরতনী। হাঁ, হারিয়ে গেছি, যাকে খুঁজছ তাকে আর খুঁজে পাবে না, কোনোদিনই।

রুইতন। এ কী কাণ্ড। এ কী দুঃসাহস। এই বনে এসেছ তুমি? জান না— নিয়ম নেই?

হরতনী। নিয়ম তো নেই, কিন্তু কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা। হঠাৎ সকালে উঠেই দেখি, নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন তোমাদের দেশের ময়ূর গুনে গুনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম ছড়িয়ে দিয়ে।

রুইতন। কিন্তু, ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ, সেও আজ ফুল তুলতে বেরিয়েছে— এতবড়ো অদ্ভুত কাজ তোমার মাথায় এল কী করে।

হরতনী। হঠাৎ মনে হল, আমি মালিনী, আর-জন্মে ফুল তুলতেম। আজ পুবে হাওয়ায় সেই জন্মের ফুলবাগানের গন্ধ এল। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে॥

রুইতন। আচ্ছা, গরাবুমগুলের জন্যে বিবিসুন্দরীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তারাও কি তবে—

হরতনী। হাঁ, তারাও এইখানেই, নদীর ধারে ধারে, গাছের তলায় তলায়।

রুইতন। কী করছে।

হরতনী। সাজ বদল করছে, আমারই মতো। কেমন দেখাচ্ছে। পছন্দ হয়?

রুইতন। মনে হচ্ছে, পর্দা খুলে গেছে, চাঁদের থেকে মেঘ গেছে সরে, একেবারে নতুন মানুষ।

হরতনী। তোমাদের ছক্কা পঞ্জা আমাদের শাসাবার জন্যে এসেছিলেন, তাঁদের কী দশা হয়েছে দেখো গে যাও।

রুইতন। কেন। কী হল।

হরতনী। খ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, এমন কি গুন্‌গুন্ করে গানও করছে।

রুইতন। গান! ছক্কা-পঞ্জার গান!

হরতনী। সুরে না হোক, বেসুরে। আমি তখন চুল বাঁধছিলুম। থাকতে পারলুম না, চলে আসতে হল।

রুইতন। আশ্চর্য করলে। চুল বাঁধা! এ বিদ্যে কে শেখালে।

হরতনী। কেউ না। ঐ দেখো-না, এবার হঠাৎ শুকনো ঝরনায় নামল বর্ষা। জলের ধারায় ধারায় শুরু হল বেণীবন্ধন। এ বিদ্যা কে শেখাল তাকে। চলো আমার সঙ্গে, ছক্কা-পঞ্জার গান শুনিয়ে দিই তোমাকে।

[প্রস্থান

বিবিদের প্রবেশ

বিবিরা। নাচ ও গান

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।
বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে
হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী।
কোন্ বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে॥

[প্রস্থান

রুইতন-হরতনীর পুনঃপ্রবেশ

রুইতন। দোষ দেব কাকে। আমারই গাইতে ইচ্ছা করছে।

হরতনী। দেখো, সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, শুম্ভে চড়াবে। সে দেখলুম ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বনের খবর নিতে।

রুইতন। দেখো, হরতনী, ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘুচে, কেন কী জানি। একটা কিছু হুকুম করো, তোমার জন্যে দুঃসাধ্য কিছু একটা করতে চাই।

হরতনী। আর যাই কর গান গেয়ো না, বনে জবা ফুটেছে, তুলে এনে দাও। ফুলের রস দিয়ে রাঙাব পায়ের তলা।

রুইতন। দেখো, সুন্দরী, আজ সকালে উঠেই বুঝেছি, আমাদের এই তাসজন্মটা স্বপ্ন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর-এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই বাণী আসছে মুখে, তারই গান শুনছি কানে। ঐ শোনো, ঐ শোনো, আমার সেই যুগের রচিত গান আকাশ থেকে ঐ কে বয়ে আনছে।

গান

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।

যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে।

হরতনী। এ গান কোনোদিন তুমিই বেঁধেছিলে, আর আমারই জন্যে? কেমন ক'রে বাঁধলে।

রুইতন। যেমন করে তুমি বাঁধলে বেণী।

হরতনী। আচ্ছা, মনে কি আসছে, তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো-একটা যুগে।

রুইতন। মনে আসছে, আসছে। এতদিন ভুলে ছিলুম কী করে তাই ভাবি।

গান

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ঐ নাচের লহরীতে।
যদি কাটে রশি,
যদি হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়, নেবই তারে নেবই তারে জিতে॥

রুইতন। দেখো হরতনী, মন ছট্‌ফটিয়ে উঠেছে যমরাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছবি, তুমি পরিয়ে দিলে আমার কপালে জয়তিলক, আমি বেরলুম বন্দিনীকে উদ্ধার করতে, বন্ধ দুর্গের দ্বারে বাজালুম আমার ভেরী। কানে আসছে বিদায়কালে যে গান তুমি গেয়েছিলে।

গান

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘ রাত্রি রইব আমি জাগি।
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী॥

হরতনী। চলো চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে। দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রূকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছী ছী, কেন আছি এখানে। একী অর্থহীন দিন, কী প্রাণ-হীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে।

রুইতন। সাহস আছে তোমার, সুন্দরী?

হরতনী। আছে, আছে।

রুইতন। অজানাকে ভয় করবে না?

হরতনী। না, করব না।

রুইতন। পা যাবে ক্ষতিবিক্ষত হয়ে, পথ ফুরোতে চাইবে না।

হরতনী। কোন্ যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে। রাত্রে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে। আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা।

রুইতন। ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।

[প্রস্থান

ছক্কা-পঞ্জার প্রবেশ

ছক্কা। ওহে পঞ্জা, কী হল বলো দেখি।

পঞ্জা। ভারি লজ্জা হচ্ছে নিজের দিকে তাকিয়ে। মূঢ়, মূঢ়! কী করছিলি এতদিন।

ছক্কা। এতদিন পরে কেন মনে প্রশ্ন জাগছে, এ-সমস্তর অর্থ কী।

পঞ্জা। ঐ-যে দহলা পণ্ডিত আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

দহলার প্রবেশ

ছক্কা। এতকাল যে-সব ওঠাপড়া-শোওয়াবসার কোট্‌কেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম তার অর্থ কী।

দহলা। চুপ।

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) করব না চুপ।

দহলা। ভয় নেই?

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) নেই ভয়, বলতে হবে অর্থ কী।

দহলা। অর্থ নেই— নিয়ম।

ছক্কা। নিয়ম যদি নাই মানি ?

দহলা। অধঃপাতে যাবে।

ছক্কা। যাব সেই অধঃপাতেই।

দহলা। কী করতে।

পঞ্জা। সেখানে যদি অগৌরব থাকে তার সঙ্গে লড়াই করতে।

দহলা। এ কেমন গোঁয়ারের কথা শান্তিপ্রিয় দেশে !

পঞ্জা। শান্তিভঙ্গ করব পণ করেছি।

হরতনীর প্রবেশ

দহলা। শুনছ, শ্রীমতী হরতনী? এরা শান্তি ভাঙতে চায় আমাদের এই অতলস্পর্শ প্রশান্তমহাসাগরের ধারে।

হরতনী। আমাদের শান্তিটা বুড়ো গাছের মতো। পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নির্জীব, তাকে কেটে ফেলা চাই।

দহলা। ছী ছী ছী ছী, এমন কথা তোমার মুখে বেরোল! তুমি নারী, রক্ষা করবে শান্তি; আমরা পুরুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি।

হরতনী। অনেকদিন তোমরা আমাদের ভুলিয়েছ, পণ্ডিত। আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে জমে গেছে আমাদের রক্ত, আর ভুলিয়ো না।

দহলা। সর্বনাশ! কার কাছ থেকে পেলে এ-সব কথা।

হরতনী। মনে মনে তাকেই তো ডাকছি। আকাশে শুনতে পাচ্ছি তারই গান।

দহলা। সর্বনাশ। আকাশে গান! এবার মজল তাসের দেশ। আর এখানে নয়।

[প্রস্থান

ছক্কা। সুন্দরী, তুমিই আমাদের পথ দেখাও।

পঞ্জা। অশান্তিমন্ত্র পেয়েছ তুমি, সেই মন্ত্র দাও আমাদের।

হরতনী। বিধাতার ধিক্কারের মধ্যে আছি আমরা, মূঢ়তার অপমানে। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

ছক্কা। একটু নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে, বলে 'অশুচি'।

হরতনী। দোষ হয় হোক, কিন্তু মরে থাকার মতো অশুচিতা নেই।

[প্রস্থান

ইস্কাবনী ও টেক্কানী ফুল তুলছে

টেক্কানী। ঐ-রে, দহলানী এসেছে। আর রক্ষে নেই।

দহলানীর প্রবেশ

দহলানী। লুকোচ্ছ কোথায়। কে গো, চেনা যায় না যে! এ-যে আমাদের টেক্কানী। আর, উনি কে, উনি যে আমাদের ইস্কাবনী। মরে যাই। কী ছিরি করেছ! মানুষ সেজেছ বুঝি? লজ্জা নেই?

টেক্কানী। সাজি নি, দৈবাৎ সাজ খসে পড়েছে।

দহলানী। তাসের দেশের বন্ধন আঁট বন্ধন— হাজার বছরের হাজার গিরে দেওয়া, খসে পড়ল? কাণ্ডটা ঘটল কী ক'রে।

ইস্কাবনী। একটা হাওয়া দিয়েছিল।

দহলানী। ওমা, কী বলো গো। তাসের দেশের হাওয়ায় বাঁধন ছেঁড়ে! আমাদের পবনদেবের নামে এত বড়ো বদনাম। বলি, এ কি মেলেচ্ছ দেশ পেয়েছ, যেখানে একটু হাওয়া দিলেই গাছের শুকনো পাতা খসে উড়ে যায়।

ইস্কাবনী। স্বচক্ষেই দেখো-না, দিদি, কী বদল ঘটিয়েছেন আমাদের পবনদেব!

দহলানী। দেখো, ছোটো মুখে বড়ো কথা ভালো নয়। আমাদের সনাতন পবনদেব! তবে কিনা পুঁথিতে লিখছে তাঁর এক মহাবীর পুত্র আছেন, তিনি নাকি লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়ে বেড়ান। হয়তো বা তিনিই ভর করেছেন তোমাদের 'পরে।

টেক্কানী। কেবল আমাদের খোঁটা দিচ্ছ কেন। এখনো চোখে বুঝি পড়ে নি? তিনি যে লম্ফ লাগিয়েছেন তাসের দেশময়। তাসিনীদের বুকে আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ইস্কাবনী। সাগরপারের মানুষরা বলছে, তিনিই নাকি ওদের পূর্বপুরুষ।

দহলানী। হতে পারে— ওরা লাফ-মারা বংশেরই সন্তান।

টেক্কানী। আচ্ছা, সত্যি কথা বলো, দিদি— ভিতরে ভিতরে তোমারও মন চঞ্চল হয়েছে? না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

দহলানী। কাউকে ব'লে দিবি নে তো?

টেক্কানী। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলব না।

দহলানী। কাল ভোর রাত্তিরের ঘুমে স্বপ্ন দেখলুম, হঠাৎ মানুষ হয়ে গেছি, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছি ঠিক ওদেরই মতো। জেগে উঠে লজ্জায় মরি আর-কি। কিন্তু—

টেক্কানী। কিন্তু কী।

দহলানী। সে কথা থাক্ গে।

ইস্কাবনী। বুঝেছি, বুঝেছি, দিনের বেলাকার বাঁধা পাখি খোলা পেয়েছিল স্বপ্নে।

দহলানী। চুপ চুপ চুপ, নহলাপণ্ডিত শুনলে স্বপ্নেরও প্রায়শ্চিত্ত লাগিয়ে দেবে। ওটা পাপ যে। কিন্তু, স্বপ্নে কী ফুর্তি।

টেক্কানী। যা বলিস, ভাই, তাসের দেশে সাগরপারের হাওয়া দিয়েছে খুব জোরে। কিছু যেন ধরে রাখতে পারছি নে, সব দিচ্ছে উড়িয়ে।

দহলানী। তা হোক, এখনো কিন্তু কিছু উড়ল, কিছু রইল বাকি। মাথার ঘোমটা যদি বা খসল, পায়ের বাঁক-মল তো সোজা করতে পারল না।

ইস্কাবনী। সত্যি বলেছিস, মনটা সমুদ্রের এপারে ওপারে দোলাদুলি করছে। ঐ দেখ্-না, চিঁড়েতনীর মানুষ হবার অসহ্য শখ, পারে না, তাই মানুষের মুখোষ পরেছে— সেটা তাসমহলেরই কারখানাঘরে তৈরি। কী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে।

দহলানী। আমাদের কাকে কী রকম দেখতে হয়েছে নিজেরা বুঝতেই পারি নে। গাছের আড়াল থেকে কাল শুনলুম, সদাগরের পুত্তুর বলছিল, এরা যে মানুষের সঙ সাজছে।

টেক্কানী। ওমা, কী লজ্জা। রাজপুত্তুর কী বললেন।

দহলানী। তিনি রেগে উঠে বললেন, সে তো ভালোই— সাজের ভিতর দিয়ে রুচি দেখা দিল। তিনি বললেন, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাও তো যাও তাদের কাছে মানুষের মধ্যে যারা তাসের সঙ সেজে বেড়ায়।

ইস্কাবনী। ওমা, তাও কি ঘটে নাকি। মানুষ হয়ে তাসের নকল! আচ্ছা, কী করে তারা।

দহলানী। রাজপুত্তুর বলছিলেন, তারা রঙের কাঠি বুলোয় ঠোঁটে, কালো বাতি দিয়ে আঁকে ভুরু, আরো কত কী, আমাদের রঙ-করা তাসেদেরই মতো। সব চেয়ে মজার কথা, ওরা খুরওয়ালা চামড়া লাগায় পায়ের তলায়।

টেক্কানী। কেন।

দহলানী। পদোন্নতি ঘটে, মাটিতে পা পড়ে না। এ সমস্তই তাসের ঢঙ। এঁকে দেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া কায়দা।

ইস্কাবনী। এ তো দেখি পবনদেবের উলটোপালটা খেলা— তাসীরা হতে চায় রঙ খসিয়ে মানুষ, মানুষ চায় রঙ মেখে তাসী হতে। আমি কিন্তু, ভাই, ঠিক করেছি, মানুষের মন্তর নেব রাজপুত্তুরের কাছে।

টেক্কানী। আমিও।

দহলানী। আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু ভয়ও করে। শুনেছি মানুষের দুঃখ ঢের, তাসের কোনো বালাই নেই।

ইস্কাবনী। দুঃখের কথা বলছিস, ভাই? দুঃখ যে এখনি শুরু করেছে তার নৃত্য বুকের মধ্যে।

টেক্কানী। কিন্তু, সেই দুঃখের নেশা ছাড়তে চাই নে। থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়, কেন যে ভেবেই পাই নে।

গান

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে—
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে অনাদরে—
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে॥

ইস্কাবনী। পালাও পালাও, সম্পাদক আসছে। কাগজে যদি রটে যায় তাহলে মুখ দেখাতে পারব না।

দহলানী। ঐ-যে দলবল সবাই আসছে। বুড়োনিমতলায় আজ সভা বসবে। এখানে আর নয়।

[প্রস্থান

রাজাসাহেব প্রভৃতির প্রবেশ

রাজা। এ জায়গাটা কেমন ঠেকছে। ওটা কিসের গন্ধ।

পঞ্জা। কদম্বের।

রাজা। কদম্ব! অদ্ভুত নাম। ওটা কী পাখি ডাকছে।

পঞ্জা। শুনেছি, ওকে বলে ঘুঘু।

রাজা। ঘুঘু! তাসের ভাষায় ওকে একটা ভদ্র নাম দাও, বলো বিন্‌তি।— আজ তো কাজ করা দায় হয়েছে। আজ আকাশে কথা শোনা যাচ্ছে, বাতাসে সুর উঠেছে। অনেক কষ্টে মনকে শান্ত রেখেছি। রানীবিবিকে তো ঘরে রাখা শক্ত হল, নেচে

বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো। সভ্যগণ, তোমাদের আজ চেনা যায় না— সভার সাজ নেই, অত্যন্ত অসভ্যের মতো।

সকলে। দোষ নেই। ঢিলে হয়ে গেল আমাদের সাজ, আপনি পড়ল খসে— সেগুলো রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে।

রাজা। সম্পাদক, তোমারও যেন গাম্ভীর্যহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

গোলাম। সকাল থেকে আছি বসে, পলাতকাদের নাম সংগ্রহ করার জন্যে। এখানকার হাওয়া লেগেছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখি, লেখনী দিয়ে ছন্দ ঝরছে। শুনেছি, আধুনিক ডাক্তার এইরকম নিঃসারণকেই বলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

রাজা। কী রকম, একটা নমুনা দেখি।

গোলাম।

যে দেশে বায়ু না মানে
বাধ্যতামূলক বিধি,
সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি
কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—
সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি ॥

রাজা। থাক্, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাসবংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।

ছক্কা। রাজাসাহেব, তোমার চতুর্থবর্গের শিশুবিভাগের ছাত্র নই আমরা। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমাদের বয়স হয়েছে। ও ছন্দ মনে লাগছে না।

পঞ্জা। ওগো বিদেশী, সমুদ্রের ওপারের ছন্দ আমাদের কানে দিতে পার?

রাজপুত্র। পারি, তবে শোনো।

গান

গগনে গগনে যায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়
বনস্পতির শাখাতে।
শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অচিন পথের ছন্দ উড়ায়
মুক্ত বেগের পাখাতে।

অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে
সাদার কালোর দ্বন্দ্বে,
নানা ভালো নানা মন্দে,
নানা সোজা নানা বাঁকাতে।
ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধ্‌বীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
রুদ্ররথের চাকাতে ॥

রাজা। কিছু বুঝলে তোমরা ?

তাসের দল। কিছুই না।

রাজা। তবে ?

তাসের দল। মন মেতে উঠল।

রাজা। সেটা তো ভালো নয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ একটা শোনো:—

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়েচেড়ে যায় ফেলে ;
বলে, "মোর নাহি প্রয়োজন।"

শোনো বিদেশী।

রাজপুত্র। আদেশ করো।

রাজা। তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ— জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ— এ-সব কেন।

রাজপুত্র। রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই বা কেন।

রাজা। সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র। এ আমাদের ইচ্ছে।

রাজা। ইচ্ছে ? কী সর্বনাশ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে! বন্ধুগণ, তোমরা-সবাই কী বল।

ছক্কা-পঞ্জা। আমরা ওর কাছে ইচ্ছেমন্ত্র নিয়েছি।

রাজা। কী মন্ত্র।

ছক্কা-পঞ্জা। গান

ইচ্ছে।
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়,
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে ॥

রাজা। যাও, যাও, এখান থেকে চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। হরতনী, কানে পৌঁছল না কথাটা? চিঁড়েতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা? হঠাৎ এমন হল কেন।

হরতনী। ইচ্ছে।

অন্য টেক্কারা। ইচ্ছে।

রাজা। ও কী রানীবিবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।

রানী। আর বসে থাকতে পারছি নে।

রাজা। রানীবিবি, সন্দেহ হচ্ছে, তোমার মন বিচলিত হয়েছে।

রানী। সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।

রাজা। জান? চাঞ্চল্য তাসের দেশে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ।

রানী। জানি, আর এও জানি, এই অপরাধটাই সব চেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস।

রাজা। শাস্তির জিনিসকে তুমি বললে ভোগের জিনিস, তাসের দেশের ভাষাও ভুলে গেছ?

রানী। আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে।

রুইতন। হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে শ্বশুরবাড়ি।

রাজা। চুপ।

হরতনী। এরা হেঁয়ালিকে বলে শাস্তর।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোবাকে বলে সাধু।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোকাকে বলে পণ্ডিত।

রাজা। চুপ।

পঞ্চা। এরা মরাকে বলে বাঁচা।

রাজা। চুপ।

রানী। আর, স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।

সকলে। জয় ইচ্ছের জয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমার বনবাস!

রানী। বাঁচি তাহলে।

রাজা। নির্বাসন!— ও কী, চললে যে! কোথায় চললে।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রানী। ফেলে রেখে যাব কেন।

রাজা। তবে?

রানী। সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।

রাজা। কোথায়।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আর এরা, আমার প্রজারা?

সকলে। যাব নির্বাসনে।

রাজা। দহলাপণ্ডিত কী মনে করছ।

দহলা। নির্বাসনটা ভালোই মনে করছি।

রাজা। আর, তোমার পুঁথিগুলো?

দহলা। ভাসিয়ে দেব জলে।

রাজা। বাধ্যতামূলক আইন?

দহলা। আর চলবে না।

সকলে। চলবে না, চলবে না।

রানী। কোথায় গেল সেই মানুষরা।

রাজপুত্র। এই-যে আছি আমরা।

রানী। মানুষ হতে পারব আমরা?

রাজপুত্র। পারবে, নিশ্চয় পারবে।

রাজা। ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।

রাজপুত্র। সন্দেহ করি। কিন্তু, রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর।

সকলের গান

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ঐ
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরি ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও॥

শান্তিনিকেতন
১৪।১।৩৯

—

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুই কূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল; তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল। যে-সমাজ তাঁহার সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এইপ্রকার লোকেরা বিনাচেষ্টায় আপনার কাছে অন্তত দুটি-একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায় যে-লোক নিজের ভার ষোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না, কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মান-বৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু, এই সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদপরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকঙ্কালের উপর কোনো প্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেকদিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে

বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই— এ কথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের-মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হউক চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতর গিন্নিবান্নি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়নশাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত; নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছু-না-কিছু খর্ব করা

সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুশি হইল তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে— বেশ। ভালো। কিন্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলে, "তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঁৎখুৎ করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে— সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎ গুণ। কিন্তু, স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালোবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর-কিছু না-ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়ূরের পুচ্ছের মতো স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাবু, তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে, ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর-কিছুর জন্য তত নহে যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু, যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো; তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিনা হাওয়ায় সেগুলি বড়ো কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির

অলংকারবাহুল্যকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বানোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিসটিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতোই ছোটো, ছোটো বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে,-তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু, কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন— সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই— বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষ্যে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একযোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমতো মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম

জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার, তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ সুখদাকে বার বার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধুকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধরুক।"

সে চেষ্টা তো পূর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কী।

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে, তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিঁধিল।

সেদিন মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির; বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানের রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে-

রঙিন চাদর ও বেলফুলের গড়েমালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এতবড়ো কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধুকৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে।

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকর শরণাপন্ন হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।" সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে-ই কেবল দুটো এক্‌জামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া

চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়; সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শুরু করিয়া দিল, নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সংস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমানকাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে। ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মতো।"

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দিঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা

কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধু কৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া, নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।" স্বরূপ বলিল তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিশ হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ্য করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নূতন পাস করা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না—আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিঁকিবে কী করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুই থাক্, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে—বোধ করি, নিছক নিজের পৌরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কাণ্ড। বাড়ির বড়োবাবু—বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া।

অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনোদিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর

বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়োবাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লট্‌কানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথায় আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুর্‌দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য।

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, "এ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্‌বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "জান তো, ঠাকুরপো? তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ

আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল, তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপাফুলটির মতো পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সত্যই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্‌যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল, যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়স্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন

হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিশ তাহা জানে, এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমেত অমাবস্যা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমতো তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমতো মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁৎখুঁৎ করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায় রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যেদিকেই সে ছুটিতে চায় সেইদিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্বের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা,

এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধু। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বার বার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটো বউ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্‌বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ

করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্যের একজন ভাড়াটে, যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না, এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্ম-বিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভালো করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে, কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জ্বরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু, এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী তাহা আর-সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ

হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলিতে তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এইজন্য সকল প্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্‌জিক্যুটর, তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরাদ্দমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্‌সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঙ্গে কলিকাতায়।"

"ওমা! সে কী কথা! এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন!"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদু মধু, যত কৈবর্ত এবং মুসলমান জোলার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট্ করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে, সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও!"

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, "বড়োবাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো। হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া

যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁস ছিল না যে, কর্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গি অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, "কর্তার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।"

'মস্ত অধিকার! শ্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কাজেরই না।' বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, "যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী

ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক্।'

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব।"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। 'আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞা, হাঁ, গিয়াছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কী হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার রুমালে-বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো কহিল, "আজ্ঞা, না।"

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যে করিয়া হউক এ কাগজগুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মতো বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, 'উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না, কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল— হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না।

হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল ; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল ; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে

পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল্।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই, জ্যাঠামশায়।"

বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও— উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি হরিদাসের বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে পাইলে।"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে, এই নে।" বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।

বৈশাখ, ১৩২১

হৈমন্তী

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং, বিবাহসম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ্-এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্বাদে পুনঃপুন কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্‌বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিনে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ-সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্‌স্‌ট্‌বুক্-কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী। তাহার-যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী; দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর-অন্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশুরের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো— একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কোম্পানির জবড়জঙ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর, গালিচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নিচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দুটা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায়, শ্বশুরের

ছুটি আর মেলে না। ওদিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার শানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্।

বিবাহসভায় চারি দিকে হট্টগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।' কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার, ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন; বলিলেন, "বুড়ি চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বই-কি। কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে-সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে-সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহারসম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গুটিকয়েক

অপথ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি— বাপকে সেই-সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্‌বেগের সহিত বলিল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখো— রাখবে ?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, "আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।"

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থসমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে

একেবারে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই বুঝিয়াছিলাম, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির— না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্যের মতো ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপনে রাখিয়া— তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেয়ে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অল্পদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নিচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে

দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই— আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশুর রাজার প্রধান মন্ত্রী-গোছের একটা-কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার— সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস-উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।"

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কি কথা। বউমার বয়স সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।"

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।"

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না; বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, "তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগার।"

হৈম চমকিয়া কহিল, "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সাম্‌নে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে 'কখনো না'!" এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন!

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালি ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারি দিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড়ো মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

হায় রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব।"

বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো 'আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।"

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমন ভাবে

চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন, তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম, শরৎপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কী সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চনা চলিতেছে। এ পর্যন্ত সে-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।"

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল, মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এ কী কাণ্ড। এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে, হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা জানেন— সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?"

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পাড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, খৃস্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন-শুনাইয়াছেন, কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসার-যাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইশারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর কাছে শুনিয়াছি, শ্বশুরবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই।" এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি. এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।"

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি. এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে-অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্‌যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্‌সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্মুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক-একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্‌ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই!

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব।

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম-যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও

তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর-কাল অন্তরে বাহিরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেই জন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক্ মনের কথা হয়; এবং এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অন্ত ছিল না— কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, বউমা, তোমার অসুখটা কিসের।"

হৈম বলিল, "অসুখ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, এ কী! হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অসুখ করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ আমার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া

নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিলেন না 'কেমন আছিস'। আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়ি, আমার সঙ্গে যাবি ?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না, একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। বুঝিলাম, কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই ! এত বড়ো অন্যায় অপবাদ !

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা।"

আমার শ্বশুর কহিলেন, "জানেন তো, উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উঁহার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায় !"

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল,

তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতায় কন্যায় আর-একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুই-জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভৎ‌সনা করিয়া বলিল, "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে-কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ— থাক্ আর কাজ কী!

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এই জন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালির ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়; কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয়, সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে— সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে— আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে; আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এই জন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতে-

ছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দর্জির দোকান বানাইয়াছে, ইহার মতো এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুই-চার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল, "আমার ঠাকুরকে দিলাম।"— বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এমনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে, নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে, তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল; সকালের রৌদ্রটি পুবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না; অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়।"

বোষ্টমী পায়ের ধুলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত-ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, "এ আবার কী কাণ্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন।

তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল।"

বুঝিলাম, গাছতলায় এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি; তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"

আমি মুশকিলে পড়িলাম। বলিলাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।"

বোষ্টমী ভারি খুশি হইয়া 'গৌর গৌর' বলিয়া উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ করিলেই সর্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই শহর ছাড়িয়া এখানে আসি।"

বোষ্টমী কহিল, "সেটা আমি বুঝিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।"

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধুলা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধুধু করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সাম্‌নে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম, বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পুব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মতো এক সময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া

বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্‌ করিতে করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সে কী কথা।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইয়াছি না-খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, "যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব, তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম, "লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।"

সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।"

বোষ্টমী যে সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা, মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কী করিয়া।"

উত্তরে শুনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আমার তো সবই ছিল— সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি, আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো।"

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়তাম না। ভিক্ষাজীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু, এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না; আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "না, না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমৃত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে-পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয় না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরিবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি, তাই বলিলাম, "এই-সকল দুর্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উঁচুদরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোষ্টমীর ইহাতে তাক্ লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাহারই পূজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

সে বলিল, "উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো পূজা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।"

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কী হইবে— সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে, আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না, ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি।

কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য প্রণালী।

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন। যখনি আমি দেখিতে পাই, লেখা লইয়াই আছ!"

আমি বলিলাম, "যে লোকটা কোনো কর্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জোড় করিয়া সে বলিল, "গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই— সে কী ঠাণ্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।"

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্‌যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।"

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একান্ত স্নেহে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখো না বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার

বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মতো প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, 'পাগলি, কাকে ভক্তি করিস তুই? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?"

কেবল এক মুহূর্তের জন্য মনটা সংকুচিত হইয়া গেল। কালির ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, "বেণী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মানুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিঁকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যাবসা করিতেন, কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাঁহার

লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কী সুন্দর রূপ তাঁর।

বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিল—

অরুণকিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই, পাড়ার সই-সাঙাতিদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন

বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা, আজ পর্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মতো তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্পবয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত। সে যেন বুঝিত, সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনও ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসি গে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীনকালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাঁতার দিয়া এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দিঘি যখন প্রায় অর্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, "মা।" ফিরিয়া দেখি,

খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস নে, আমি যাচ্ছি।" নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে 'মা' বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি, সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইত ; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলেবয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবয়সের বন্ধু বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথি, ইঁহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা-কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন ; অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন

লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র, সেদিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুশি করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুশি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন, আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুশি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্-একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল

হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন।"

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো, আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি, এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি, আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নিচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রঙ ধরিয়াছে; তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর আমি সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন— কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, "আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।"

স্বামী কহিলেন, "তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।"

আমি বলিলাম, "গুরুঠাকুর।"

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন ; "গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।"

আমি বলিলাম, "আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।"

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আদেশ কেন করিলেন।"

আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।"

স্বামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।"

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরশা হইল তিনি বলিলেন, "চলো-না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।"

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।"

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব-চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আষাঢ় ১৩২১

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি— মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকরা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্‌কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না— সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না— তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল— তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে-কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি

আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত; তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্‌টো— অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে

দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো— দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কতবড়ো অপমান। দায়ে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন্। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের

ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না— রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো সর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে

একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুঁড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক্, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না— মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি— এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম,

সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়েচর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ীর দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই

দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'বিন্দু, তুই ভয় করিস নে— শুনেছি, তোর বর ভালো।"

বিন্দু বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু, ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে— কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, "দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।"

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্যামি জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে "দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন— আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?"

আমি বললুম, "না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক্-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস, বিন্দি?"

"এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না— কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে-রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্‌, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।"

আমি বললুম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।"

তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।"

আমি বললুম, "আমি নিশ্চয় জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে, "বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিশ-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বললুম, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বললুম "আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।"

তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে— কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, "তা দিক্ থানায় খবর!"

এই ব'লে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।"

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু

আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।"

আমি বললুম, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম— কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ ?"

আমি বললুম, "বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে— কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, "বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, "আমিও যাব।"

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, "যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।"

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, "ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব— ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বললুম "কী, শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বললে, "না।"

আমি বললুম, "রাজি করতে পারলি নে?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, "মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।"

তোমরা বললে, "এ সমস্ত নাটক করা।" তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি— মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্— সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন করেই ডাক দিক-না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার— কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশ-বন্ধনেরই হবে জিত— আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল— কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল— তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু— তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন—

মৃণাল।

শ্রাবণ, ১৩২১

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত

গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে, সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না— কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল, সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিল না; এমন-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পর্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মতো কিল্‌বিল্‌ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই— কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের

দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁত। ইহাতে বাল্যলীলায় মস্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মাস্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্তবাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক ; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি, সেও আমার মনে পড়ে ; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত— কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চায় ; তার সেই কচি আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়— হঠাৎ একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভাণ্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয় ; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কী যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, "অনু, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান ! ইহাতে পাপ হয় !" শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু

যখন তার ছোটো বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, "উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি, সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম, বি এল পাশ করা একটি টাটকা মুন্‌সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব— আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্‌ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত, সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম, সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম, এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠকিয়াছি।' খুব কষিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের 'পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে, অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার

স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্‌ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত, ইলেকট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্‌স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এস্টিমেট্ প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মতো ওস্তাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেকদিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনো-টার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর— তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু ঢিল না দিলে ব্যাবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর প্ল্যান এস্টিমেট্ এবং প্রস্পেক্টস্ লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।" প্রসন্নর মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেকদিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি, তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, "ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো, তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক ক্লাসে

না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি, দাদা— কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাত করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছেন। কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বুদ্ধিতেও তুমি পাকা।"

তখন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই; এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে, কেবলমাত্র মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকল প্রকার ব্যাবসা পুরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, "আমার সম্বল নাই যে।"

সে বলিল, "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।"

তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বুঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয়, দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না, কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড়, কাগজ, কালি, বোতাম, সাবান, যতই আনাই, বিক্রি হইয়া যায়— একেবারে পঙ্গপালের মতো খরিদ্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল— ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদগদ্ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষের তিসির

ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত; জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্র-পারে চালান করিতে পারিলে এক লম্ফে কত লাভ হওয়া উচিত— কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালিতে, অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধুলা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, "মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ সব কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু আজ হইতে, দাদা, তোমার সাক্‌রেদ হইলাম।"

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য— মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই, কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোক্‌সান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, মুনফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পঁচিশের নিচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদবশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সততা, তার উপরে সুদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালির রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা, এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তার মতলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়,

কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভৎর্সনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মতো রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে; কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যেরকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে! কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণৎকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা! দুর্বলতার দিনে মানবপ্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন

যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শুনিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অনুকূল— এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, "খোলো দেখি।" খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, "আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন।"— এমনি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নিচে কালি পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশু ভাইফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোঁটা দিয়া যাইব।"

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া

তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ আর সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভয়ংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর-কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শুইয়া। নিচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষা ছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল—আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, "বউদিদি এলেন না?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "সুবোধের জন্য এই যা-কিছু এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখা শুনার কোনো ত্রুটি হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।"

অনু কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে, সুবোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরও কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন, তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।"

আমি কহিলাম, "অনু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে।"

অনু কহিল, "আমি যে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।"

অনু কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, "সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর এই পান্নার কণ্ঠীটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল— আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমন নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া অছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, খবর ভালো তো?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু—"

আমি বলিলাম, "সে জানি না— যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।"

প্রসন্ন বলিল, "তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে লাগিবে।"

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে, মানুষের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উলটা। টিকার আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি একথা যদি বলি যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর, সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু— কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল যে, সুবোধের কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ্য হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ

তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু সুবোধের কী একরকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না— যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ন মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না— তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এইজন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত— যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ। আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ; ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল — সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সামনেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কী একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলাকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি— সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায়; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে শুরু করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু-চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু-চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে সৃষ্টি

করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল যে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারও শান্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্‌বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম "সুবোধকে ডাকিয়া দাও।"

সে বলিল, "সুবোধ শুইয়া আছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শুইয়া আছে? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে!"

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া সুবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এদিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে

চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে— সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়— চলিবার সময় যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্মকুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর।" যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, "সে হচ্ছ তুমি, আলস্যমহাসাগর।" পারৎপক্ষে সুবোধ কোনো দিন আমার কাছে কাঁদে না, কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রূপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময়ে আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, "টাকা পাই নাই।"

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে— কোথাও লুকাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালোমানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে সয়তান।

আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে।"

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কী করিতে পার করো।"

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি

ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি, জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম— আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন; মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম! এ কী করিলাম! ভগবান আমাকে এ কী বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহূর্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতরো নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম, কী সুন্দর তার মুখখানি, কী করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, "আয়, বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!"

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না ; ভাবিল, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "এ তো একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েকদিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখো।" বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

ভাদ্র, ১৩২১

শেষের রাত্রি

"মাসি!"

"ঘুমোও, যতীন, রাত হল যে।"

"হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিলুম, মণিকে তার বাপের বাড়ি— ভুলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—"

"সীতারামপুরে।"

"হাঁ সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতদিন ও রোগীর সেবা করবে। ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।"

"শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন।"

"ডাক্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—"

"তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইশারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।"

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল, সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো।

"বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।

"হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন, আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।"

"ভাবছি, আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে কী কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কী বলেছে শুনেছ তো?"

"ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী ক'রে।"

"আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে— শুনেছি, ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি ব'লে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই— আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।"

"আচ্ছা, বেশ— তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—"

"দেখো, বউ, অনেক সয়েছি— কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও, কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।"

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিকক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি সই, গোসা কেন।"

"দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন— এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।"

"ওমা, সে কী কথা, যাবে কোথায়। স্বামী যে রোগে শুষছে।"

"আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে; বাড়িতে সবাই চুপ চাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন ক'রে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি!"

"তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যা হোক।"

"তা আমি, ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।"

"তা, কী করবে শুনি।"

"আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

"ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে। চললুম, আমার কাজ আছে।"

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে— এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান দিয়া বসিল। বলিল, "মাসি, এই জানলাটা আর-একটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে

চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা— সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ, মণির মন চঞ্চল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু দেখো—"

"না, বাবা, ভুল বুঝেছিলুম— সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়!"

"মাসি!"

"যতীন, ঘুমোও, বাবা।"

"আমাকে একটু ভাবতে দাও, একটু কথা কইতে দাও! বিরক্ত হোয়ো না মাসি।"

"আচ্ছা, বলো, বাবা।"

"আমি বলছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে! একদিন যখন মনে করতুম, আমরা কেউ মণির মন পেলুম না, তখন চুপ ক'রে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—"

"না, বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ্য করেছি।"

"মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—"

"ঠিক কথা, যতীন।"

"সেইজন্যই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।"

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন,

'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না— ও একটু চাহিতে শিখুক— মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।' কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন, যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, সুখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতো, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে।"

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

"আমি ভাবছি, মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে।"

"অল্প বয়স কিসের, যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো, বাছা, অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি— তাতে ক্ষতি হয়েছে কী। তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের!"

"মাসি মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—"

"ভাব কেন, যতীন? মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য!"

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল—

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥

"মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেজেছে।"

"ন'টা বাজবে।"

"সবে ন'টা? আমি ভাবছিলুম, বুঝি দুটো, তিনটে, কি ক'টা হবে। সন্ধ্যার পর

থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন।"

"কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।"

"মণি কি ঘুমিয়েছে।"

"না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি ক'রে তবে ঘুমোতে যায়।"

"বলো কী, মাসি, মণি কি তবে—"

"সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।"

"আমি ভাবতুম, মণি বুঝি—"

"মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।"

"আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম, তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে ক'রে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত! ও তো তাই চায়।"

"মণির শরীরটা বুঝি—"

"ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।"

"মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী ক'রে।"

"আমাকে ও বড্ডো মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়— ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।"

আকাশের তারাগুলি যেন করুণা-বিগলিত চোখের জলের মতো জল্‌জল্‌ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল— এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস্‌ করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—"

"এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।"

"আমি বেশিক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়, কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই; বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যা-বেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে, মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইয়া পড়ে— সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল, আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনে এমনতরো নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে।

৩

"একি, বউ, কোথাও যাচ্ছ না কি।"

"সীতারামপুরে যাব।"

"সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।"

"অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।"

"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।"

"টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে— তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো— আজ যেয়ো না।"

"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।"

"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।"

"বেশ তো, এখনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে ব'লে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।"

"তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন— আজ যদি না যাই তো চলবে না।"

"আমি জোড়হাত করছি, বউ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে— দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।"

"না, তবে থাক্— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিন্তু যত দিন বেঁচে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে— ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।"

"মাসি, তুমি অমন ক'রে শাপ দিয়ো না বলছি!"

"ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ। পাপের যে শেষ নেই— আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।"

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন, যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, "এই এক কাণ্ড ক'রে বসেছে।"

"কী হয়েছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।"

"গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। আমি

বলি, 'হয়েছে কী, আরও তো দুধ আছে।' কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক।"

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল, তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি!"

"কী, বাবা।"

"আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।"

"না, বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয়, এ কথা আমি মনে করি নে।"

"মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।"

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ— সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ. ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপরে সে বসিল; নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মতো পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল। যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, 'এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল— অনেক কাঁদাইয়াছ— সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।'

৪

"কষ্ট হচ্ছে, মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার

জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল ; আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার ব'লে মনে হচ্ছে না— এ দুদিন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।"

"পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি, যতীন।"

"আমার মনে হচ্ছে, মাসি, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছেড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।"

"বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।"

"আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি— ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।"

"মা যখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—"

"সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।"

"কিন্তু এই বাড়িটা—"

"কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।"

"মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—"

"সে কি জানি নে, যতীন। তুই এখন ঘুমো।"

"আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল, মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—"

"ও কী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব? আমার এমনি পোড়া মন? তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে-সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।"

"কিন্তু, তোমাকেও আমি—"

"দেখ্, যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি?"

"মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—"

"দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভ'রে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভ'রে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও— বাড়িঘর, জিনিসপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক— যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও — এ-সব বোঝা আমার সইবে না।"

"তোমার ভোগে রুচি নেই— কিন্তু মণির বয়স অল্প, তাই—"

"ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—"

"কেন ভোগ করবে না, মাসি।"

"না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে, এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, 'এমনিই বটে— আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত-বড়োই ফাঁকি।'

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।"

"কম কী দিয়ে যাচ্ছ, বাছা। এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক'রে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনো দিন বুঝবে না। যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।"

"আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল— আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এসে ছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ বাতাস ক'রে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।"

"আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়েই স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অল্প-একটু ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ— ওকে দেখতে দাও যে আমি মরছি—নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।"

"বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"না, মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।"

"জানিস, যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।"

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

"কিন্তু, মাসি, আমি তো জানতুম, মণি শেলাই করতে পারে না— সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।"

"মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে— ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।"

"তা, ভুল থাক্-না। ও তো প্যারিস্ একজিবিশনে পাঠানো হবে না— ভুল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।"

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে— এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

"মাসি, ডাক্তার বুঝি নিচের ঘরে?"

"হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।"

"কিন্তু আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো, ওতে আমার ঘুম হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেগে থাকতে দাও। জান, মাসি? বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই দ্বাদশী আসছে — কাল সেইদিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই— আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ ক'রে রইলে কেন। বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের

বলেছে, আমার শরীর দুর্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মাসি, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে— তাহলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই, এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয় নি। মাসি, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভ'রে উঠেছে, আমার জীবনে এমন আর কখনোই হয় নি। সেইজন্যই আমি মণিকে ডাকছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলুম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও— এর পরে আর সময় পাব না। না, মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল।"

"ওরে যতীন, ভেবেছিলুম, আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এখনো বাকি আছে, আজ আর পারছি নে।"

"মণিকে ডেকে দাও— তাকে ব'লে দেব কালকের রাতের জন্যে যেন—"

"যাচ্ছি, বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।"

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, আয়— একবার আয়— আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্— সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।"

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মণি!"

"না, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন?"

"একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।"

"কাকে?"

"বউঠাকরুনকে।"

"তিনি তো এখনো ফেরেন নি।"

"কোথায় গেছেন?"

"সীতারামপুরে।"

"আজ গেছেন?"

"না, আজ তিন দিন হল গেছেন।"

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল— সে চোখে অন্ধকার

দেখিল। এতক্ষণ বালিসে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি।"

"কোন্ স্বপ্ন।"

"মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল— কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।"

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিঁকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো— প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।'

"মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়, আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিয়ে চললুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ করব।"

"বলিস কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে— সেই কামনাই কর্-না।"

"না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন ক'রে সাজাব।"

"আর বকিস্ নে, যতীন, বকিস্ নে— একটু ঘুমো।"

"তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।"

"ও তো একেলে নাম হল না।"

"না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে— সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।"

"তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।"

"মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর ?— আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?"

"বাছা, আমার যে মেয়ে মানুষের মন, আমিই দুর্বল— সেইজন্যেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।"

"মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি, তা আমি বুঝেছি।"

"যাই বল, বাছা, তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।"

"মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি সুখের উপরে জবরদস্তি করি নি— কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই— সমস্ত জীবন হাতজোড় ক'রে অপেক্ষাই করলুম; মিথ্যাকে চাই নি ব'লেই এতদিন এমন ক'রে বসে থাকতে হল— এইবার সত্য হয় তো দয়া করবেন। ও কে ও— মাসি, ও কে।"

"কই, কেউ তো না, যতীন।"

"মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—"

"না, বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।"

"আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—"

"কিছু না যতীন— ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

"দেখুন, আপনি ওঁর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাত্রি এমনি ক'রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।"

"না, মাসি, না তুমি যেতে পাবে না।"

"আচ্ছা, বাছা, আমি নাহয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।"

"না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো— আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে— শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।"

"আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীনবাবু। সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হল—"

"সময় হল? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে— এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছ কেন— বিদায় ক'রে দাও, সব বিদায় ক'রে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি — আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না— কোনো মিথ্যাকেই না।"

"আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।"

"তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।— মাসি, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো— আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।"

"আচ্ছা, শোও, বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।"

"না, মাসি, ঘুমোতে বোলো না— ঘুমোতে ঘুমোতে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে। তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে আসছে। এখনই আসবে।"

৫

"বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো— ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।"

"কে এসেছে। স্বপ্ন?"

"স্বপ্ন নয়, বাবা, মণি এসেছে— তোমার শ্বশুর এসেছেন।"

"তুমি কে?"

"চিনতে পারছ না, বাবা, ঐ তো তোমার মণি।"

"মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।"

"সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।"

"না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।"

"শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে— ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর্।— অমন ক'রে কাঁদিস্ নে, বউ, কাঁদবার সময় আসছে— এখন একটুখানি চুপ কর্।"

আশ্বিন, ১৩২১

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন, সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ— বোধ করি, সেইজন্য শেষপর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার

নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এম্. এ. পাস করিয়াছি। সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই— থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে—"। আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এককালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে

উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ্য, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আণ্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্‌তুতো ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার' পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার,' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি, আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপ্‌চাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন, যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল— ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও

চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু, মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্‌, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না, দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ— ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাণ্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত এক-সঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্তহস্তী দ্বারা সংগীত-সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া, আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের।

ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্‌ কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকিল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্‌গদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।— সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয়, তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া, সওগাদ, লোকবিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন, দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফেশানের সূক্ষ্ম কাজ নয়— যেমন মোটা, তেমনি ভারি।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই— এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল, তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে-পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাক্‌রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না, এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন—"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না— এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ ধরণের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু, রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুইচোখ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব, এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহা-নির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না, এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের

আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সৎপাত্রের কপালে এতবড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া, আঁকিয়া দিল? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল— পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্‌সোস মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাসার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল— এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা— এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল; বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না— এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-

একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম, সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইয়াছে বল্ আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই, কিছুই তো হয় নি, বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে— বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।' কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।' তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটি-মাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন; কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহুদূরে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্‌গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাট্‌ফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ

তুমি— চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া— 'গাড়িতে জায়গা আছে।' আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে, আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট্‌ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাট্‌ফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট্‌ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমনসময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন-না— এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া— 'জায়গা আছে।' ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্‌তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল— গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে— কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে, তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক— রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না— ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই— তাহারই কোন্ একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে-প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।— পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া— আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু—"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যাকথা।"

বলিয়া নাম-লেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা

গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত— স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী, মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুইজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা—"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ! এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই স্বরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়— আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কার্তিক, ১৩২১

তপস্বিনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথমরাত্রে গুমট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্‌দব্‌ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নিচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তার পরে বিদ্যারত্নমশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শংকরের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকন্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে— সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প। নামের সঙ্গে মাখনবাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি. এ. পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি শৌখিন। জীবননিকুঞ্জের মধুসঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে

সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতমমুনি। বলা বাহুল্য, সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিতমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাস্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড়ো বড়ো দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি লাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে-তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মাস্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই-যে যৌথতপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্মারা; তারা বরদাকে বড়ো জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাস্টার-মশায়দের মথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখনবাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর এক দল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে, বেতন তো তাঁরা পাইবেনই, তার পরে বরদা যদি ফাস্ট ডিবিজনে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে এক্‌জামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল, এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ, তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে

সে বাঘের মতো ভয় করিত, তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, "এখানে থাকলে আমার পড়াশুনো হবে না।"

মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?"

সে বলিল "বিলাতে।"

মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি. এ. পাশ করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি. এ. পাশ না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি. এ. পাশ না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্মমৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি. এ. পাশ বিন্ধ্য-পর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি. এ. পাশে লাগিয়াছেন।

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, 'বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ।' আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওয়া কী-বইগুলা তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এমনসময় একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!' স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়, কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ খোলা আছে যেটা বি. এ. পাশের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তা-টার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল, স্কুলঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো পরীক্ষা-দুর্গের ভগ্নাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের

উপর এক টুকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

"আমি সন্ন্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দস্বামী।"

মাখনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুকরা সাফ হইয়া গেছে— আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের-দাগে-মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন এট্‌লাসের মলাট পাতা ; এক ধারে একটা শূন্য প্যাক্‌বাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা ; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্টোরিয়ার মুখ-আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্‌ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস-আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্য এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা ; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুরবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র-সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্না— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্‌শাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর ; বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া, এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন, ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে-আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে, সে-কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি

বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মাস্টার-পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তো বুঝি নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কখনোই পাশ করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত, যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন, পিসি বলিলেন, 'ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাস করে— এত বড়ো যে, স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই, ওদিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, 'এই দেখো-না, এল ব'লে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কখ্‌খনো না! ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন; তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল, বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারও মুখে কোনো উদ্‌বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে; আশঙ্কা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এমনি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্‌বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে

লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন, সে-কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু মানুষটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্মল ছিল, এমন-কি সে যে তামাকটা পর্যন্ত খাইত না, এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই তো তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়া ছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের 'পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল, বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সোনার টুকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারসুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বউমা যাতে সুখে থাকে, মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন কিছু ফরমাশ করে যেটা দুর্লভ— অনেকটা কষ্ট করিয়া, লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুশি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মতো হইতে পারে।

২

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্‌নাটা, আল্‌মারিটা— তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে-বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব-চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর'।

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চুপড়ি, শিল-নোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকন্নার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানালার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ 'জয় বিশ্বেশ্বর' বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করো।"

এই শুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আব্‌দারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতেছিল ; কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয়, মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী! বিশেষত জটাধারীরা যখন আহার-আরামের অপরিহার্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত, তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি!— বরদার যে-ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফদাড়ি জটাজূট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, বুঝি কিছু কিছু মেলে ; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়— কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্যরকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবনযৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত

আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়— এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, 'কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে' এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খায় তার মধ্যে ফলমূলই বেশি। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তশর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া শুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না; পণ্ডিতমশায় বলিলেন, "একেই বলে পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা।"

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরেরর মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধুলা ও আশীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল— এমন-কি, স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গায়ের তশরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির্‌ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন্ একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন

হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে, সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালি খস্‌ খস্‌ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ— পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি; যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে; তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস্‌মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে— ষোড়শী তো কৃচ্ছ্রসাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজও সে-পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রঙকে আরও ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিতমশায়কে ধরিয়া পড়িল, "আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।"

পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ-সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকীর মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল, তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে— তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলো তো।"

মাখন বলিলেন, "সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যত দূরে গেছ, সেইখানেই তোমার নাগাল ক-জন লোকে পায়।"

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামুটি তাঁরই মতো— অর্থাৎ খায়-দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর

কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাত্র পালক ছিল, একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাট্‌কিলে। এই পালক তিনটি যে, সত্ত্ব, রজ, তম ; ঋক, যজুঃ, সাম ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ; আজ, কাল, পর্শু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কি লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দুইজন এম. এস্‌-সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন ; একজন সাব্‌জজ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্‌ এই নৈমিষারণ্য-ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গৃহী সভ্য হইতে হইল। গৃহী সভ্যের কর্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহী সভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ-অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ অনেক সময় থার্মোমিটরের পারার মতো সত্য অঙ্কটার উপরে নিচে ওঠানামা করে। অংশ কষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নিচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু, এই ভুলচুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়োকিছু বাকি রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করছ কী। মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্‌বিগ্ন মুখে বলিলেন, "তাই তো, কী করি।"

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিঁকবে।"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্‌বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

৩

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে ; এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা, তা আমি কেমন করে জানব।"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুঝিয়া রহিলেন ; তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন ক'রে জানলেন।"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু, এটা নিশ্চয় জেনো, স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী ক'রে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা কি জানতে পারি।"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন ; তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এসো।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশমতো তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছ ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ যেন কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।"

"সাদা কিছু দেখছ কি।"

"সাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো ?"

"নিশ্চয়ই বরফ ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার

মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়োই সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম, দরকার হবে না, কিন্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোন্‌দিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন— বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয়, এই-যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে; এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কী, বাবা।"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন, ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়-পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারছেন না?"

"এ কী! বরদা নাকি।"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন্ এক কাপড়-কাচা কল-কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় ক'রে দিতে পারি।"

বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই—

যাবজ্জীবেৎ নাই-বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন ক'রে টাইম্‌টেব্‌ল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি ক'রে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়শ্বশুর বাংলা বই বেরবা-মাত্র নির্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যতকিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। 'দীন যথা রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষুর জিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে পাশ করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায় বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়— স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি-এ, এম-এ এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো, আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু-কষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল-রাস্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টারমশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর

কাটাচ্ছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণু নয়— সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসি, জর্মান, ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে এক্স্‌প্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্‌স্‌লি-ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসন্‌কেও বিচার করতে ডরাই নে, এমন-কি, ইব্‌সেন-মেটার্‌লিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল— বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শুনি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত পুরানো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্ছে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নূতন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত— তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়; তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদ্য কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু, যাঁর ভরসায় এই-সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয়, সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘুরছে, যাতে মানবসভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা

কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকন্নার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার একজোড়া মাত্র, তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্ত্রীর ভ্রূচাপে কিরকম চাপল্য উপস্থিত হত, তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে উনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যাকিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল, তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্ছে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়ামপ্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিম্বা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না— যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্‌হন্‌ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈতদলটি জমে নি— তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন— সৌজাত্য-বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল-তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল, তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দলবৃদ্ধির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক, নামটার আসল মানে— আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার

শ্বশুর আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষের ছেলেদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু, অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই— নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।"

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু, অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম, ও বুঝি সাহস করছে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কী করছ।" অনিলা বললে, "মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও যাচ্ছে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁ'ও বললে না, না'ও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাশ করি নি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যাকিছু বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের

মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বললুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গ্‌সঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করছি তখন মনে করেছিলুম, অনিলার জীবনযজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু, আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই, যে-সৃষ্টিকর্তা আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়, তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্‌বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব-চেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা-নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাংশুমৌলী, এবং ধরে নেওয়া যাক, তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এতবড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো

জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত, দু পা, এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেছে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গমর্তকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের 'পরে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম, সিতাংশুমৌলী সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে, তা আমি পূর্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে সে যেন দশ-মুণ্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালি কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান ব'সে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনো-মতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্শ্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্ম-রক্ষা করলুম। দেখলুম, আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা, যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুটি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর, যে-ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক

বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই-পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন-নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা-নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের যে-তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরি বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংযম কিম্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসুষমা, অপর পক্ষে একদা যে-দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে— এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে, দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আমার শার্সির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল, আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। একে ডেকে পাই নে, হেঁকে বিচলিত করতে পারি নে— দুর্লভতার কারণ

জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেলুম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম, কেবল যে আমার শার্সি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অনুচর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে, সেটা তেমন আশ্চর্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণমূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম ক'রে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। বুঝলুম, এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়— শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা-নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বলতুম, সাজসজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙিন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় স'রে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি-এ পাশ করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি এ পাশ-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রীটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলুম না।

পয়লা-নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্নেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সংগীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু, আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি— তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেলুম, আমার দ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা-নম্বরে চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খুশি হলুম। আমার দলের লোকদের বললুম, "দেখেছ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে, "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বললুম, "না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পয়লা-নম্বরের জাঁকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তারপরে জনশ্রুতি শোনা গেল, যতী আর হরেন পয়লা-নম্বরে সংগীতের মজলিসে একজন বক্স-হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অরুণের প্রধান শখের বিষয় হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কী করে বুঝব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পয়লা-নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি— মানসিক সম্পদে সিতাংশুমৌলীকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত— কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম, আর ভাবতুম, 'আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম!' পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝি নে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সীতাংশু এস্রাজ বাজাচ্ছে। ঐ যন্ত্রটার 'পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে— সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে

দিয়েছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্বচনীয়, আমি একে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলতে, কন্সর্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে ন'টা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ারঘরেও পেলুম না, রান্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বললুম, "পর্শুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সবুর করো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে— তার জন্য মনটা উদ্‌বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়িবদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম, সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণভারতে বেড়াতে বেরোবে, সুতরাং দুই-নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্‌নি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বললুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল-সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে না কি।"

আমি বললুম, "হবে বই-কি। সমস্ত তৈরি আছে— ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাটনি পর্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অদ্বৈতবাবু, আমি বলি, আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাশ হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল— সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুনলে ?"

সে বললে, "পয়লা-নম্বর থেকে।"

পয়লা-নম্বর থেকে! বিবরণটা এই— সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না ক'রে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশুমৌলী এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিশকে ঠাণ্ডা ক'রে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম, অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ ক'রে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করছে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম, এক রাত্রে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে।

আমি অভিযোগ করে বললুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন।"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে— কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোটো হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বলত 'তোমাকে ব'লে লাভ কী', তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিপ্লব— সংসারের সুখ দুঃখ— নিয়ে কী ক'রে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি বললুম, "অনিল, এ-সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খুব হবে। আমি এত ক'রে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

২৩।২২

আমি বললুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বললে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম, অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যায় সময় আমার দ্বৈতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা-নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলী চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়-ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম "শোবে না?"

সে বললে "বাসনগুলো তুলতে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার চশমা চাপা দেওয়া এক-টুকরা কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে 'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।'

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স— সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না— এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমেছিল তার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লাবাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝতে পারলুম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম— আমার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিলুম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা

ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানছে। রাজাবাবু ভোররাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাক্ করে উঠল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানব-সমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার্, টলস্টয়, টুর্গেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্পলিখিয়েদের বইয়ে যখন এইরকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তার তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘটতে পারে, তা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হালকা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে ব'লে চোখ বুজে ছিলুম; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, বুদ্‌বুদ্ ফেটে গিয়েছে। গেছে যাক্ গে— কিন্তু জগতে সবই ত বুদ্‌বুদ্ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিঁকে রয়েছে এমন-সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দায় ছাতে পায়চারি করতে করতে, শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুলতেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা-নম্বর থেকে এসেছে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু, যেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার টুক্‌রো করে ছেঁড়া। মনে হল, পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

'আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না, জানি— কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি, এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে, সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাকবে না।'

এমন পঁচিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল, এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠত— কিম্বা তা হলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে, আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোনো দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই—

'বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার

দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।'

বোঝা যাচ্ছে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে— দুজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কত কাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসুরি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান ক'রে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি-মাত্র চিঠি পেয়েছি— সেটি এই দেখুন।"

এই ব'লে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল- করা সোনার কার্ড-কেস খুলে তার ভিতর থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, 'আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।'

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

আষাঢ়, ১৩২৪

পাত্র ও পাত্রী

ইতিপূর্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধুবান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন-কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন

পেলেন ; আমি কৌমার্যের লাস্ট্‌ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এন্‌ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত-পণ্ডিতমশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কী-একটা ব্রত ; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উলটো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মর্মটা এই— আমার তো কল্‌কাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ ক'রে, যত্ন ক'রে তাঁর দিন কাটতে পারে। পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত— কারণ, সে শিশুও বটে, সুশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিতমশায় বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না ; কেননা, রুচির সঙ্গে পুণ্যের

বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারি হল। মা বললেন, মেয়েটি সুলক্ষণা— অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে-পণ্ডিতমশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ— এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবন্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, "সনু, পণ্ডিতমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট— সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়ছে— রঙ শাম্‌লা; ভুরু-জোড়া খুব ঘন; এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো, বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না— বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমানুষের মতো।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল। মনে মনে বুঝলুম, ঐ রাঙতা-জড়ানো বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার— আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ সূত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রীব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন, মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি, কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন, এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব-চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা-কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার

রূপগুণের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি ; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণকালটা অনুশোচনায় গেল।

সেদিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর— কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসানিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ এক মুহূর্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। বাবা যেরকম মাকে কর্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যে-রকম সাবধানে নানাপ্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন, আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক্‌নোট থেকে আরম্ভ ক'রে হীরের গয়না পর্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে ব'সে তার খাওয়াই হল না এবং জানলার ধারে ব'সে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচছে, এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নিচে লিখে রাখছি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল ; এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই— রবিবারে মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নিচে পড়ে গেল।

বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বললুম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁদিকের আল্‌মারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি বললুম 'আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আনলে— সেটা আমি ধপাস্‌ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। আমি গিয়ে দেখলুম, তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বললুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নির্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছুতেই ভুলতে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এ দিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মুহূর্তে কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুব্ধ ব'লে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শুভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এন্‌ট্রেন্স-স্কুলের সেক্রেটারি বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহসম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্‌লাসে প্রবলবেগে মামলা ডিস্‌মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পণ্ডিত-মশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপসে গেল— আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

২

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন— তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে — আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি পুরা দমে এম্‌-এ পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। এতদিন তো শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল, এবার অর্থসাগর-মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব-চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিল না তাই তখন চাকরি থেকে পেন্‌সন্‌ এবং পেন্‌সন্‌ থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা যখন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে, তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষ্যে কমলা লেবু ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য, ডেপুটির এম-এ-পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব

'প্রাংশুলভ্য ফল'। এইজন্যে কন্‌ট্র্যাক্টর বাবু আমার প্রতি 'উদ্বাহু' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধুলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি— অন্তত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়; তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয়, তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহধর্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চার দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দুর্গ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে বিদ্রূপ করে কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সামনে এসে পড়লুম। বাবা বললেন, শুভস্য শীঘ্রং। আমি চুপ করে রইলুম; মনে মনে ভাবলুম, একটু দেখে-শুনে বুঝে-পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম— কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর— সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে, তার ভুরুটি এঁকে, তাকে হাতে করে গড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সংকুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা।

তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়; সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পাল্‌কির ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে, এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বললুম "মা, এ মেয়ের যোগ্যপাত্র আমি নই", তিনি হেসে বললেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বললুম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মা বললেন, "সে কি, সুমু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বললুম, "মা, স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার। এরই মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কী পেলি।"

আমি বললুম, "বুদ্ধি থাকলে মানুষ দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা যদি অত্যন্ত বেশি রাগারাগি জবরদস্তি না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান আহ্নিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত ক'রে কাজ উদ্ধার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বললুম, 'ছেলেবেলা থেকে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চলবে না।' কলেজে

লজিকে পাশ করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনো দিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁহাকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে, পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয়, পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল— তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্‌ম্‌টাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি কিন্তু মনকে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে অবলাজাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে মাথা হেঁট ক'রে বিরক্তির ধাকাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে— যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে ক'রে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার পা'কেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, তুমি আত্মনির্ভর করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললুম, "যে আজ্ঞে।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে

মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যবসা শুরু করে দিলুম। ঠিক উন-আশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল; আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম কিন্তু খবর পেয়েছিলুম, কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তত ব্যারিস্টারের নিচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নিচে ছিলুম। কিন্তু, পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয়, লাঞ্চ খেয়েছি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্‌ খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনেছি। আমার মুশকিল এই যে, র‍্যাসেলস, ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্‌ স্টীল প'ড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরোতেই চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমি সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক, এই-সব বিলিতি গিল্টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি এক্‌সেন্টের একটু খুঁত কিম্বা কাঁটা-চামচের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা

বিলিতি পুতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়েজাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল; আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেছি, ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরও বেশি চোখ আছে— সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে খর্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেছে জানি, কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক, যখন দেখি, কোনো সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিশেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যল্পমাত্র আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধূলিসাৎ হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেছে কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভুলে ছিলুম, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপুরের এক শহরে গিয়ে দেখি, পণ্ডিতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব, এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন।

তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় ষত্বণত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুরবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠলুম। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— কিন্তু তিনি নাতনিতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্ধক্যের অপরাহ্ণকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমরুশতক আর্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চার দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা কী!"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে, শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। বুঝতে পারলুম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পষ্ট জানলুম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাড়িয়ে এসেছি— চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোজানো যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্ছি নে, কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভুলে থাকা যায়। কিন্তু, পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক, আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে, আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ— এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম, পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্ধক্যে নাতনি, নাতবউ। এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধবয়সের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম— দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি— যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার

ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটুখানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে-অংশে মুলতুবি পড়েছে সে-অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতিবাবু ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁশিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। এক-দিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না', এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই।—

নন্দকৃষ্ণবাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল— এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দূরে সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্ত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাবু তাঁকে বললেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেছেন, এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।"

যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন তিনি খুশি হয় নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে ছিলেন— উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না।

প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একটু জমিয়ে বসেছেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "সাধুলোক পাই কোথায় ?"

তিনি বললেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় মারা যান। ডাক্তার বললে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

গল্পের এতটা পর্যন্ত আমার পূর্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেছে— না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইটুকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন— তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার !"

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয়— কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন, তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুকনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ

বের করে পুঁতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে— তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃতস্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বললুম, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।"

"কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—"

"না দেখেই হবে।"

"কিন্তু, পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—"

"সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে; গুণও এতবেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারবারে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি

না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?"

সে বললে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব'লে মনে হল না। আমি বললুম, "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেছি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বললে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করি নে, কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

আমি বললুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু, না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আচ্ছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কল্‌কাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।"

বললুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?"

আমি বললুম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসলুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনছ।'

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে-আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে, এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছুতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফশিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বললুম, "যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।"

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেছি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল, সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কিনা জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিলুম, সময়মতো বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে, কিন্তু দেখলুম, উপরওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো-একটা ক্লাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাতনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জুটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতিবাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

পৌষ, ১৩২৪

প্রবন্ধ

সাহিত্যের পথে

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

রসসাহিত্যের রহস্য অনেক কাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি, ভিন্ন ভিন্ন তারিখের এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার নানারকম করে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে, আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে-যায় না। এমন-কি, সেই অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত; রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানাখানা; রামও হয়, হনুমানও হয়, ঠিকমতো হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু, এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না— সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না-বলি তাতে কিছু আসে-যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে 'ওথেলো' নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদবেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারি দিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারি দিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত, মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা; ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে; লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীট্‌সের বাণী মনে পড়ল: Truth is beauty, beauty truth। অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে, সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ, তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে real সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম,' জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়— সে অসুন্দর হলেও মনোরম ; সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

কিন্তু, এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দসম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাতলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু, আনন্দ-সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব-ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু, মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব

ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।

শান্তিনিকেতন
৮ আশ্বিন, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের পথে

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিকমতো করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে— এই-সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহারনিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মতো উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব, যদি এমন কথা কেহ বলিত যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব, আমিও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্‌বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু, একেবারে আমারই নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক, আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসরঘরে বর এবং পাঠকসভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। সহ্য যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না; এবং যে লেখক তাহার লেখাটা তো রইলই।

অতএব, নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু, এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্য-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা, যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপরদ্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে, আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুশি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল, এমন-সব হতবুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ করিয়া যাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে, কটাক্ষে যাহারা বুঝিতে পারে বস্তু

কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব, যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্স্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু, সমালোচক যত বড়ো বিচক্ষণ হোন-না কেন চিরকালই তাঁহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সামলাইবেন সেটা তো ধাত্রী এবং ধৃত কাহারও পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোন্‌টা বস্তু নয়।

মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার আয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন, সেটা রসবস্তু। বলা বাহুল্য, এখানে রসসাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর-সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, 'আমিই সেই রসিক।' প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে, সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো-আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এইজন্যই সাহিত্যসমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালির কাজে নামিতে কাহারও বাধে না, তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা, সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কী। আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ, তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার বরাত তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলিবে না।

রসবিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্যবস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবি করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপর পক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহারা নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য, কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে, কিন্তু সেই দেওয়ানি আদালতের মতো দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এস্থলে কবিরই জিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাশা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন, 'দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিসটার বস্তু পরিমাণ করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তো প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।'

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে-রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু, বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা, মনে করা যাক, কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম, দেশে সব-চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, ব্রাহ্মণসভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মতো চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণসভা তাহার পৈতা কাড়িবে, এই ঘটনাটা বাংলাদেশে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো। অতএব, বাঙালি কবি যদি ইহাকে তাহার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে, বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

এই বুঝিয়া লিখিলাম দৈত্যসংহার-কাব্য। তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায় রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে ?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে, বাস্তবতা জিনিসটা কী তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল 'গোরা' উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না-আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তাহা সব-চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি, প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি, ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর-কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা স্বামীর প্রতি হিন্দুরমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায় ; অথবা নিন্দা করি, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের জরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়। তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জনবাসী একলা-কবির চিত্তবাঁশিতে বাজিয়াছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজনদরে যাহা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তুপিণ্ড তাহার মধ্যে কী আছে জানিতে চাই।

আর, কীট্‌স্‌, শেলি— ইহাদের কাব্যের বাস্তবতা কী দিয়া নির্ধারণ করিব। ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কি ইহারা বক্‌শিশ ও বাহবা পাইয়াছিলেন। যে-সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালি করিয়া

থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ড্স্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীট্স্‌কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরও আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী ছিল। কিন্তু, ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্যরসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে— সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নহে, অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেইজন্যই এখনকার সাহিত্য দেশের লোকসাধাণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা। কিন্তু, দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেহ তাহাদের তো কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয়তো উত্তরে শুনিব, আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিঁকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের। বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে; তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্তকালও টিঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু, সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ, এ দিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও, সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই-যে কোনো কোনো মানুষ খামখা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ

নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা বাঙালিকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে; সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে-লোক ভয় করে, যে-লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালিই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু, দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু, লোকশিক্ষার কী হইবে।

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখি-কাঙালের ঘরকন্নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড়ো বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো রাক্ষস, বড়ো বড়ো বীর এবং বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো লেজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌নাগাচার্য এই-ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের তো কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তববাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন— কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল— আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না

কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু, কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন— তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কী দশা হইত।

তুমি কি মনে কর, লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না। লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে, সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই। কিন্তু, সে কি সাহিত্য। ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চর ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে— রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে, তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু, সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক— যদি প্রতিকার করিতে পার, করিয়া দাও, কাহারও আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মতলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য, লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব, এ কথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা তো নিজের খেয়াল-মতো এক কথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কী। একটা-কিছুর ’পরে জোর করিয়া তাঁহারা তো ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্বেই বলিয়াছি, বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে

সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফেশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই 'পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারও কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারও কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা; যে-লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে-প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই—সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুশি বসিয়া যেমন-খুশি রায় দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে-উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত আদর্শের নকলে কৃত্রিম নকশা কাটা হয়— এইজন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব, কবি রাগই করুন আর খুশিই হউন, তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে— এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার করিবে—সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে, যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য, পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

১৩২১

কবির কৈফিয়ত

আমরা যে-ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিমসমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

ইহাতে ক্ষতি ছিল না। একটা জিনিসকে আমি যদি বলি নৌকা-চালানো আর তুমি যদি বল দাঁড়-টানা, একটি কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বল রামরাবণের লড়াই, তাহা লইয়া আদালত করিবার দরকার ছিল না।

কিন্তু, মুশকিল হইয়াছে এই যে, কথাটা ব্যবহার করিতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হইতেছে। জীবনটা কেবলই লীলা! এ কথা শুনিলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দলেরা কী বলিবে যাহারা তিন ভুবনে কেবলই তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে!

আমি কবুল করিতেছি, আমার এখানে লজ্জা নাই। ইহাতে আমার ইংরেজি-মাস্টার তাঁর সব-চেয়ে বড়ো শব্দভেদী বাণটা আমাকে মারিতে পারেন— বলিতে পারেন, 'ওহে, তুমি নেহাত ওরিয়েন্টাল।' কিন্তু, তাহাতে আমি মারা পড়িব না।

'লীলা' বলিলে সবটাই বলা হইল, আর 'লড়াই' বলিলে লেজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়াইয়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়। ভাঙখোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টানিয়া এ কি হঠাৎ আমাদের একটা মত্ততা। কেন রে বাপু, কিসের জন্যে খামকা লড়াই।

বাঁচিবার জন্য।

আমার না-হক বাঁচিবার দরকার কী।

না বাঁচিলে যে মরিবে।

নাহয় মরিলাম।

মরিতে যে চাও না।

কেন চাই না।

চাও না বলিয়াই চাও না।

এই জবাবটাকে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোর-জবরদস্তির সব শেষে একটা খুশি আছে— তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। শতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা— মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মতো এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর-কিছু নাই। এমন স্থলে শতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই, তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই যে বেশি বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।

কিন্তু, এ-সব কথা বলা কেন। জীবনটা কিম্বা জগৎটা যে লীলা, এ কথা শুনিতে পাইলেই যে মানুষ একদম কাজকর্মে ঢিল দিয়া বসিবে।

এই কথাটা শোনা না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা না-করা নির্ভর

করিত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন গোড়ায় তাঁরই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সামান্য কবির উপরে রাগ করায় বাহাদুরি নাই।

কেন, সৃষ্টিকর্তা বলেন কী।

তিনি আর যাই বলুন, লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন। মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে, জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি, ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কবির সত্যও নহে, কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্য কবির কথা রাখিয়া দাও, তুমি নিজের হইয়া বলো।

আচ্ছা, ভালো। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই-সব কথা আমার কাব্যে বারবার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে, একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমার আর এড়াইবার জো নাই। অতএব, এখন হইতে আমি বিধাতার মতোই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব। যদি আমাকে বানাইয়া বলিতে হইত তবে ফি বারে নূতন কথা না বলিলে লজ্জা হইত। কিন্তু, সত্যের লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে; নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নাই, এইজন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহংকারের মতো শোনাইতেছে।

সত্যের দোহাই দিয়া নিন্দা করিলে যদি দোষ না হয়, তবে সত্যের দোহাই দিয়া অহংকার করিলেও দোষ নাই। অতএব, এখানে তোমাতে আমাতে শোধবোধ হইল।

বাজে কথা আসিল। যে-কথা লইয়া তর্ক হইতেছিল সেটা—

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা—অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরতকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব-চেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান, জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই ? আমরা তো ঐগুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই ; নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া।

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেইবা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত— অর্থাৎ, কেইবা দুঃখবেদনা লেশমাত্র স্বীকার করিত— আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ, আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব, দুঃখ তো আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা যখন বল, হানাহানি করিতে করিতে যাহা টিঁকিল তাহাই সৃষ্টি, সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন্— আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিঁকিতেছে, এইটেই হইল পুরা সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এটা তো একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে ইহার দাম কী।

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন-কি, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু, যেরকম দিনকাল পড়িয়াছে কবিদের মতো সংসারের নেহাত অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহেতুক অনির্বচনীয় বলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যারা রসের কারবারী তাহাদিগকে এ দেশে প্রয়োজনের হাটের মাসুল দিতে হয় নাই। কিন্তু, শুনিতে পাই, পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলিয়া মানিতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখিয়া নিক্তিতে মাপিয়া তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করিতে চান। সুতরাং, কোনো কথাতেই অনির্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েন্টাল বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। সে নিন্দা অসহ্য নয়, তবু কাজের লোকদিগকে যতটুকু খুশি করিতে পারা যায় চেষ্টা করা ভালো। যদিচ আমি কবি মাত্র, তবুও এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা একটু গোড়ার দিক হইতে বলিতে চাই।

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠবস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার

ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয় ; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ— তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এইজন্যই। এইজন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এইজন্যই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়, ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ, সৌন্দর্যরূপ। তাহা কাজ বটে কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না। বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না। কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। এইজন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুকরা টুকরা করিয়া ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে তাহাকে কোনোপ্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায়। কিন্তু, তাহাতে পুরা সংগীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুকরাগুলার মধ্যেও তালরক্ষা হয় না। ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সব-চেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত, ছেলেদের শিক্ষা। মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নাই। পাখি উড়িতে শেখে, মা-বাপের গান শুনিয়া গান অভ্যাস করে, সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ— বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণান্তিক লড়াই নয়। সে-শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তাহা খেলার বেশে কাজ। গুরুমশায় এবং পাঠশালা কী জিনিস ছিল একবার ভাবিয়া দেখো। মানুষের ঘরে শিশু হইয়া জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে, বিশ বছর ধরিয়া তার শাস্তি পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক না করিয়া আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলিব, এটা বিষম গলদ। কেননা, সৃষ্টিকর্তার মহলে বিশ্বকর্মার দলবল জগৎ জুড়িয়া গান গাহিতেছে—

মোদের, যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি, ভাই।

একদিন নীতিবিৎরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখিতেছি, শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দসুর ক্রমে লাগিতেছে— সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুইজন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে আমার

দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্যন্ত দূষিয়া উঠিল। কিন্তু, তাহারা নিজের স্বার্থ ভুলিয়া আমার দেশের লোকের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ আমার কাছে দাখিল করিত। তাহাদের ফর্দটি জাল ফর্দ নয়, অঙ্কেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে, কিন্তু সেটার মতো নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খাফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভালো। আমি এই কথা বলি, কর্তব্যনীতি যেখানে কর্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন্‌, সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। কেননা, দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু, এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্য হইয়াছে যে, আমরা নির্লজ্জের মতো বলিতে পারি যে, কর্তব্যের সরস না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলেই ভালো চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই! আমাদিগকে বড়াই করিতে হইবে যে, আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এমনি বাহাদুর! চন্দন মাখিতে আমাদের লজ্জা, তাই রাই-সরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরো-আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক, সেখানেই তার আনন্দ; মা যেখানে মা সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশিই হোক-না, সেখানেই তার আনন্দ। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি, যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উলটা দিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্তু, মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে হয় নিজের মনিবকে নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো-আনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর-কেহ কিম্বা আর-কিছুর মতো করিতে বাধ্য। চীনের মেয়ের জুতা তার পায়ের মতো নহে, তার পা তার জুতার মতো। কাজেই পাকে দুঃখ পাইতে হয় এবং কুৎসিত হইতে হয়। কিন্তু, এমনতরো কুৎসিত হইবার মস্ত সুবিধা এই যে, সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নাই; কিন্তু, নীতিতত্ত্ববিৎ যদি সকলকেই সমান করিতে চায় তবে তো লড়াই ছাড়া, কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া, কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নাই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করিতে হইতেছে। কেমন গোলমালে দায়ে পড়িয়া এইরকমটা ঘটিয়াছে। এইজন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলাইয়া বলি, জিন-লাগাম পরিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় মুখ থুব্‌ড়াইয়া মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ-সমস্ত দাসের জাতির দাসত্বের বড়াই। এমনি করিয়া দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আওড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হইয়া উঠে। না, আমরা স্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়ার মতো লাগাম-বাঁধা মরিবার জন্য জন্মাই নাই। আমরা রাজার মতো বাঁচিব, রাজার মতো মরিব।

আমাদের সব-চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চ্যালা কাঠ নহে, তাহা গাছ। তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

আমার কথার জবাবে এ কথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়া তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। যতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপিতে হইবে; ততদিন লাগাম পরিয়া মুখ থুব্‌ড়িয়া মরিতে হইবে। ততদিন ইস্কুলে আপিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের ঢাক-ঢোলই খুব উচ্চৈঃস্বরে বাজাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে ঘুলাইয়া দেওয়া ভালো— বলা ভালো, এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়্গাঘাতই আশীর্বাদ, আর জল্লাদই আমাদের ত্রাণকর্তা।

তা হোক, বলিদানের ঢাক-ঢোল বাজুক আপিসে, বাজুক আদালতে, বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝংকারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া, শুষ্কতালু লইয়া, লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধুলার উপরে। কিন্তু, কবির বীণায় বরাবর বাজিবে: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না: Truth is beauty, beauty truth। ইহাতে আপিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে— সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোকবীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে: আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

১৩২২

সাহিত্য

উপনিষদ্ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল, আমরা আছি; আর-একটি, আমরা জানি; আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে তাই নিয়েই আজকের সভায় আমার আলোচনা। সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়—I am, I know, I express, মানুষের এই তিন দিক এবং এই তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য। সত্যের এই তিন ভাব আমাদের নানা কাজে ও প্রবর্তনায় নিয়ত উন্মত করে। টি'কতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। এই নিয়ে তার নানারকমের সংগ্রহ রক্ষণ ও গঠনকার্য। 'আমি আছি' সত্যের এই ভাবটি তাকে নানা কাজ করায়। এই সঙ্গে আছে 'আমি জানি'। এরও তাগিদ কম নয়। মানুষের জানার আয়োজন অতি বিপুল, আর তা কেবলই বেড়ে চলেছে, তার মূল্য মানুষের কাছে খুব বড়ো। এই সঙ্গে মানবসত্যের আর-একটি দিক আছে 'আমি প্রকাশ করি'। 'আমি আছি' এইটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপের অন্তর্গত; 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের অন্তর্গত; 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপের অন্তর্গত।

'আমি আছি' এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা, তেমনি 'আমি জানি' এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা—কেননা, মানুষের স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান-স্বরূপ। অতএব, মানুষ যে কেবলমাত্র জানবে কী দিয়ে, কী খাওয়ার দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়, তা নয়। তাকে নিজের জ্ঞানস্বরূপের গরজে রাত্রির পর রাত্রি জিজ্ঞাসা করতে হবে, মঙ্গলগ্রহে যে-চিহ্নজাল দেখা যায় সেটা কী। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হয়তো তাতে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত পীড়িত হয়। অতএব, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার জ্ঞানময় প্রকৃতির সঙ্গে সংগত ক'রে জানাই ঠিক জানা, তার প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত যুক্ত করে জানা ঠিক জানা নয়।

আমি আছি, আমাকে টি'কে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে, তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু, যে-পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টি'কে থাকার মধ্যেই আমার টি'কে থাকা, সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়; সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য; সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে

নানা-প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিঁকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।

পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র নিজে নিজে একান্ত টিঁকে থাকবার ব্যাপারেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে অসীমের প্রেরণা সেখানে মানুষের শিক্ষার কত উদ্যোগ, কত পাঠশালা, কত বিশ্ববিদ্যালয়, কত বীক্ষণ, কত পরীক্ষণ, কত আবিষ্কার, কত উদ্ভাবনা। সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু, তার বিশুদ্ধ আনন্দরসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

তবেই একটা কথা দেখছি যে, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন নিজে টিঁকে থাকবার ইচ্ছা প্রবল, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কৌতূহল সর্বদা সচেষ্ট, তেমনি মানুষের আর-একটি জিনিস আছে যা পশুদের নেই— সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র-প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ। লোহা গরম হতে হতে যতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য আছে কোন্‌খানে। যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কৃষ্ণবর্ণ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্ছে, সেই-খানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানারূপে প্রকাশমান। সেই প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে, আমরা সকলেই বলতে পারি— 'এ যে আমার'। সে যখন অশেষকে স্বীকার করে তখনই সে কোনো একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার

মলিন সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। অশেষের প্রসাদ-বঞ্চিত সেই বিশেষভোগ্য টাকার বর্বরতায় বসুন্ধরা পীড়িতা। দৈন্যের ভারের মতো আর ভার নেই। টাকা যখন দৈন্যের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মানুষ ধূলিতে ধূলি হয়ে যায়। সেই দৈন্যেরই নাম প্রতাপ, তা আলোক নয়, তা কেবলমাত্র দাহ— সে যার কেবলমাত্র তারই, এইজন্যে তাকে অনুভব করা যায় কিন্তু স্বীকার করা যায় না। নিখিলের সেই স্বীকার-করাকেই বলে প্রকাশ।

এই প্রতাপের রক্তপঙ্কিল অশুচি স্পর্শকে প্রকৃতি তার শ্যামল অমৃতের ধারা দিয়ে মুছে মুছে দিচ্ছে। ফুলগুলি সৃষ্টির অন্তঃপুর থেকে সৌন্দর্যের ডালি বহন করে নিয়ে এসে প্রতাপের কলুষিত পদচিহ্নগুলোকে লজ্জায় কেবলই ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'আমরা ছোটো, আমরা কোমল, কিন্তু আমরাই চিরকালের। কেননা, সকলেই আমাদের বরণ ক'রে নিয়েছে— আর, ঐ-যে উদ্যতমুষ্টি বিভীষিকা, যে পাথরের 'পরে পাথর চাপিয়ে আপনার কেল্লাকে অভ্রভেদী ক'রে তুলছে সে কিছুই নয়, কেননা ওর নিজে ছাড়া আর কেউই ওকে স্বীকার করছে না—মাধবীবিতানের সুন্দরী ছায়াটিও ওর চেয়ে সত্য।'

এই যে তাজমহল— এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহবেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল; তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে-কোঠাতেই রাখুন তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন-পর নেই, সে অনন্তের বেদি। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক তাতে ক'রে তার নিজের থলিটারও পেট ভরে না, সুতরাং ক্ষুধার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর, যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধ'রে রেখে দিতে পারে না। সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত্র হচ্ছে ওঁ— অর্থাৎ, হাঁ। তাজমহল হচ্ছে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ— নিখিলের সেই গ্রহণ-মন্ত্র মূর্তিমান। সাজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত্র পড়া হয় নি; একদিন তার যতই শক্তি থাক্-না কেন, সে তো 'না' হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। তেমনি কত কত বড়ো বড়ো নামধারী 'না'এর দল আজ দম্ভভরে বিলুপ্তির দিকে চলেছে, তাদের কামান-গর্জিত ও বন্দীদের শৃঙ্খল-ঝংকৃত কলরবে কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু তারা মায়া, তারা নিজেরই মৃত্যুর নৈবেদ্য নিয়ে কালরাত্রিপারাবারের কালীঘাটে সব যাত্রা ক'রে

চলেছে। কিন্তু, ঐ শাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ।

কিন্তু, আমরা দান করতে চাইলেই কি দান করতে পারি। যদি বলি 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে', তা হলেই কি বর এসে হাত পাতেন। নিত্যকাল এবং নিখিলবিশ্ব এই কথাই বলেন— 'যদেতৎ হৃদয়ং মম' তার সঙ্গে তোমার সম্প্রদানের মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তম্ যা দেবেন আমি তাই নিতে পারি। তিনি মেঘদূতকে নিয়েছেন—তা উজ্জয়িনীর বিশেষ সম্পত্তি না, তাকে বিক্রমাদিত্যের সিপাই শাস্ত্রী পাহারা দিয়ে তাঁর অন্তঃপুরের হংসপদিকাদের মহলে আটকে রাখতে পারে নি। পণ্ডিতরা লড়াই করতে থাকুন, তা খৃস্টজন্মের পাঁচশো বছর পূর্বে কি পরে রচিত। তার গায়ে সকল তারিখেরই ছাপ আছে। পণ্ডিতেরা তর্ক করতে থাকুন, তা শিপ্রাতীরে রচিত হয়েছিল না গঙ্গাতীরে। তার মন্দাক্রান্তার মধ্যে পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত। অপর পক্ষে এমন-সব পাঁচালি আছে যার অনুপ্রাসছটার চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গবর্ষণে সভাস্থ হাজার হাজার লোকে মুগ্ধ হয়ে গেছে; তাদের বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতায় আমরা যতই উত্তেজিত হই-না কেন, সে-সব পাঁচালির দেশ ও কাল সুনির্দিষ্ট; কিন্তু সর্বদেশ ও সর্বকাল তাদের বর্জন করাতে তারা কুলীনের অনূঢ়া মেয়ের মতো ব্যর্থ কুল-গৌরবকে কলাগাছের কাছে সমর্পণ ক'রে নিঃসন্ততি হয়ে চলে যাবে।

উপনিষদ যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলেছেন অনন্তম্, সেখানে তাঁর প্রকাশের কথা কী বলেছেন। বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এইটে হল আমাদের আসল কথা। সংসারটা যদি গারদখানা হত তা হলে সকল সিপাই মিলে রাজদণ্ডের ঠেলা মেরেও আমাদের টলাতে পারত না। আমরা হরতাল নিয়ে বসে থাকতেম, বলতেম 'আমাদের পানাহার বন্ধ'। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই দেখছি, কেবল যে চারি দিকে তাগিদ আছে তা নয়।

বারে বারে আমার হৃদয় যে মুগ্ধ হয়েছে। এর কী দরকার ছিল। টিটাগড়ের পাটকলের কারখানায় যে মজুরেরা খেটে মরে তারা মজুরি পায়, কিন্তু তাদের হৃদয়ের জন্যে তো কারও মাথাব্যথা নেই। তাতে তো কল বেশ ভালোই চলে। যে-মালিকেরা শতকরা ৪০০ টাকা হারে মুনাফা নিয়ে থাকে তারা তো মনোহরণের জন্য এক পয়সাও অপব্যয় করে না। কিন্তু, জগতে তো দেখছি, সেই মনোহরণের আয়োজনের অন্ত নেই। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, এ কেবল বোপদেবের মুগ্ধবোধের সূত্রজাল নয়, এ যে দেখি কাব্য। অর্থাৎ, দেখছি ব্যাকরণটা রয়েছে দাসীর মতো পিছনে, আর রসের লক্ষ্মী রয়েছেন সামনেই। তা হলে কি এর প্রকাশের মধ্যে দণ্ডীর দণ্ডই রয়েছে না রয়েছে কবির আনন্দ?

এই-যে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, এই-যে আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের প্লাবন, এর মধ্যে তো কোনো জবরদস্ত্ পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন দেখতে পাই নে। ক্ষুধার মধ্যে একটা তাগিদ আছে বটে, কিন্তু ওটা তো স্পষ্টই একটা 'না'এর ছাপ-মারা জিনিস। 'হাঁ' আছে বটে ক্ষুধা-মেটাবার সেই ফলটির মধ্যে, রসনা যাকে সরস আগ্রহের সঙ্গে আত্মীয় বলে অভ্যর্থনা করে নেয়। তা হলে কোন্‌টাকে সামনে দেখব আর কোন্‌টাকে পিছনে? ব্যাকরণটাকে না কাব্যটিকে? পাকশালকে না ভোজের নিমন্ত্রণকে? গৃহকর্তার উদ্দেশ্যটি কোন্‌খানে প্রকাশ পায়— যেখানে, নিমন্ত্রণপত্র হাতে, ছাতা মাথায় হেঁটে এলেম না যেখানে আমার আসন পাতা হয়েছে? সৃষ্টি আর সর্জন হল একই কথা। তিনি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন করেছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন ব'লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন— তাই আমাদের হৃদয় বলে 'আঃ বাঁচলেম'।

শুক্ল সন্ধ্যার আকাশ জ্যোৎস্নায় উপছে পড়েছে— যখন কমিটি-মিটিংয়ে তর্ক বিতর্ক চলেছে তখন সেই আশ্চর্য খবরটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তারপর যখন দশটা রাত্রে ময়দানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি তখন ঘন চিন্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যে প্রকাশটি আমার মনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর কী বলব। বলি, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সেই যে যৎ আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ। সে কি শক্তি-পদার্থ।

রান্নাঘরে শক্তির প্রকাশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু, ভোজের থালায় সে কি শক্তির প্রকাশ। মোগলসম্রাট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শক্তিকে। সেই বিপুল কাঠ-খড়ের প্রকাশকে কি প্রকাশ বলে। তার মূর্তি কোথায়। আওরঙজেবের নানা আধুনিক অবতাররাও রক্তরেখায় শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে অতি বিপুল আয়োজন করেছেন। কিন্তু যিনি আবিঃ, যিনি প্রকাশস্বরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন, তিনি সেই রক্তরেখার উপরে রবার বুলোতে এখনি শুরু করেছেন। আর, তাঁর আলোক-রশ্মির সম্মার্জনী তাদের আয়োজনের আবর্জনার উপর নিশ্চয় পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কেননা, তাঁর আনন্দ যে প্রকাশ, আর আনন্দই যে তাঁর প্রকাশ।

এই প্রকাশটিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর শক্তিকে যদি তিনি সামনে রাখতেন তা হলে তাঁকে মানার মতো অপমান আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। যখন জাপানে যাচ্ছিলাম জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ে। আমি ছিলেম ডেকে বসে। আমাকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে পবনের একটা ছোটো নিশ্বাসই যথেষ্ট; কিন্তু কালো সাগরের বুকের উপরে পাগলা ঝড়ের যে-নৃত্য তার আয়োজন হচ্ছে আমার ভিতরে যে পাগল মন আছে তাকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে। ঐ বিপুল সমারোহের দ্বারাই পাগলের সঙ্গে পাগলের

মোকাবিলায় রহস্যালাপ হতে পারল। নাহয় ডুবেই মরতেম— সেটা কি এর চেয়ে বড়ো কথা। রুদ্রবীণার ওস্তাদজি তাঁর এই রুদ্রবীণার শাক্‌রেদকে ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডবের মধ্যে দুটো-একটা চক্র-হাওয়ার দ্রুত-তালের তান শুনিয়ে দিলেন। সেইখানে বলতে পারলেম, 'তুমি আমার আপনার।'

অমৃতের দুটি অর্থ— একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় মাত্র। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন— অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। সবাই দেখাচ্ছে কালের ভয়। কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।

এইবারে আমাদের কথা। কাব্য যেটি ছন্দে গাঁথা হয়, রূপদক্ষ যে-রূপ রচনা করেন, সেটি যদি আনন্দের প্রকাশ হয় তবে সে মৃত্যুজয়ী।— এই 'রূপদক্ষ' কথাটি আমার নূতন পাওয়া। ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্‌ অর্থাৎ একটা প্রাচীনলিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।—

কাব্যের বা চিত্রের তো সমাপ্তিতে সমাপ্তি নেই। মেঘদূত শোনা হয়ে গেল, ছবি দেখে বাড়ি ফিরে এলেম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অবসাদকে তো নিয়ে এলেম না। গান যখন সমে এসে থামল তখন ভারি আনন্দে মাথা ঝাঁকা দিলেম। সম মানে তো থামা, তাতে আনন্দ কেন— তার কারণ হচ্ছে, আনন্দরূপ থামাতে থামে না। কিন্তু, টাকাটা যেই ফুরিয়ে গেল তখন তো সমে মাথা নেড়ে বলি নে— 'আঃ'।

গান থামল— তবু সে শূন্যের মতো অন্ধকারের মতো থামল না কেন। তার কারণ, গানের মধ্যে একটি তত্ত্ব আছে যা সমগ্র বিশ্বের আত্মার মধ্যে আছে— কাজেই সে সেই 'ওঁ'কে আশ্রয় করে থেকে যায়; তার জন্যে কোনো গর্ত কোথাও নেই। এই গান আমি শুনি বা নাই শুনি, তাকে প্রত্যক্ষত কেউ নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে-যায় না। কত অমূল্যধন চিত্রে কাব্যে হারিয়ে গেছে কিন্তু সেটা একটা বাহ্য ঘটনা, একটা আকস্মিক ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে এই যে, তারা আনন্দের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের দৈন্যকে করে নি। সেই দৈন্যের রূপটা যদি দেখতে চাও তবে পাটকলের কারখানায় গিয়ে ঢোকো যেখানে গরিব চাষার রক্তকে ঘূর্ণীচাকার পাক দিয়ে বহুশতকরা হারের মুনাফায় পরিণত করা হচ্ছে। গঙ্গাতীরের বটচ্ছায়াসমাশ্রিত যে-দেউলটিকে লোপ ক'রে দিয়ে ঐ প্রকাণ্ড-হাঁ-করা কারখানা কালো ধোঁয়া উদ্‌গীর্ণ করছে সেই লুপ্ত দেউলের চেয়েও ঐ কারখানা-ঘর মিথ্যা। কেননা, আনন্দলোকে ওর স্থান নেই।

বসন্তে ফুলের মুকুল রাশি রাশি ঝরে যায়; ভয় নেই, কেননা ক্ষয় নেই। বসন্তের

ডালিতে অমৃতমন্ত্র আছে। রূপের নৈবেদ্য ভরে ভরে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে-সব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তপ্তপঙ্ক উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল তারা আর ফিরে এল না; যে-সব অগ্নিনাগিনী রসাতলের আবরণ ফুঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে ফণা তুলে পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিল তারা কোন্ বাঁশি শুনে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু, কচি কচি শ্যামল ঘাসের কোমল চুম্বন আকাশের নীল চোখকে বারে বারে জুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা দিনে দিনে ফিরে ফিরে আসে। আমার ঘরের দরজার কাছে কয়েকটি কাঁটাগাছে বসন্তের সোহাগে ফুল ফুটে ওঠে। সে হল কণ্টিকারীর ফুল। তার বেগুনি রঙের কোমল বুকের মাঝখানে একটুখানি হলদে সোনা। আকাশে তাকিয়ে যে-সূর্যের কিরণকে সে ধ্যান করে সেই ধ্যানটুকু তার বুকের মাঝখানটিতে যেন মধুর হয়ে রইল। এই ফুলের কি খ্যাতি আছে। আর, এ কি ঝরে ঝরে পড়ে না। কিন্তু, তাতে ক্ষতি হল কী। পৃথিবীর অতি বড়ো বড়ো পালোয়ানের চেয়ে সে নির্ভয়। অন্তরের আনন্দের মধ্যে সে রয়েছে, সে অমৃত। যখন বাইরে সে নেই তখনও রয়েছে।

মৃত্যুর হাতুড়ি পিটিয়েই মহাকালের দরবারে অমৃতের যাচাই হতে থাকে। খৃস্টের মৃত্যুসংবাদে এই কথাটাই না খৃষ্টীয় পুরাণে আছে। মৃত্যুর আঘাতেই তাঁর অমৃতের শিখা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ হল না কি। কিন্তু, একটি কথা মনে রাখতে হবে— আমার কাছে বা তোমার কাছে ঘাড়-নাড়া পাওয়াকেই অমৃতের প্রকাশ বলে না। যেখানে সে রয়ে গেল সেখানে আমাদের দৃষ্টি না যেতেও পারে, আমাদের স্মৃতির পরিমাণে তার অমৃতত্বের পরিমাণ নয়। পূর্ণতার আবির্ভাবকে বুকে করে নিয়ে সে যদি এসে থাকে তা হলে মুহূর্তকালের মধ্যেই সে নিত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে— আমার ধারণার উপরে তার আশ্রয় নয়।

হয়তো এ-সব কথা তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় পড়ে— আমার মতো আনাড়ির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া অসংগত। কিন্তু, আমি সেই শিক্ষকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি নে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তরে বাহিরে রসের যে-পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। তাই আমি এখানে আহরণ করছি। আমাদের দেশে পরমপুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে; তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সব-শেষের কথা, এর পরে আর-কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।

তথ্য ও সত্য

সাহিত্য বা কলা-রচনায় মানুষের যে-চেষ্টার প্রকাশ, তার সঙ্গে মানুষের খেলা করবার প্রবৃত্তিকে কেউ কেউ এক করে দেখেন। তাঁরা বলেন, খেলার মধ্যে প্রয়োজন-সাধনের কোনো কথা নেই, তার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ অবসরবিনোদন; সাহিত্য ও ললিত-কলারও সেই উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

আমি কাল বলেছি যে, আমাদের সত্তার একটা দিক হচ্ছে প্রাণধারণ, টিঁকে থাকা। সেজন্যে আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বেগ আবেগ আছে। সেই তাগিদেই শিশুরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ে, আরও একটু বড়ো হলে অকারণে ছুটোছুটি করতে থাকে। জীবনযাত্রায় দেহকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে প্রকৃতি এইরকম অনর্থকতার ভান করে আমাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ছোটো মেয়ে যে-মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে তার পরিচালনার জন্যেই সে পুতুল নিয়ে খেলে। প্রাণধারণের ক্ষেত্রে জিগীষাবৃত্তি একটি প্রধান অস্ত্র; বালকেরা তাই প্রকৃতির প্রেরণায় প্রতিযোগিতার খেলায় সেই বৃত্তিতে শান দিতে থাকে।

এইরকম খেলাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ আছে; তার কারণ এই যে, প্রয়োজন-সাধনের জন্য আমরা যে-সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাদের খেলায় প্রকাশ করতে পাই। এই হচ্ছে ফলাসক্তিহীন কর্ম; এখানে কর্মই চরম লক্ষ্য, খেলাতেই খেলার শেষ। তৎসত্ত্বেও খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্যে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে। কুকুরের জীবনযাত্রায় যে-লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখতে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। খেলার ক্ষেত্র জীবযাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।

অপর পক্ষে, যে-প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি। বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের যে-মূলধন আছে তারই একটা উদ্বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন-ব্যবসায়েরই নকল করে থাকি, এ কথা বলতে তো মন সায় দেয় না। কবিতার বিষয়টি যাই হোক-না কেন, এমন-কি, সে যদি দৈনিক একটা তুচ্ছ ব্যাপারই হয়, তবু সেই বিষয়টিকে শব্দচিত্রে নকল করে ব্যক্ত করা তার উদ্দেশ্য কখনোই নয়।

বিদ্যাপতি লিখছেন—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলি-বেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে—আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দরচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি। জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য। তা কখনোই স্বীকার করতে পারি নে। বস্তুত, মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্যমাত্র করে ছন্দে-বন্ধে বাক্য-বিন্যাসে উপমাসংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।

ইংরেজ কবি কীট্স্ একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন। যে-শিল্পী সেই পাত্রকে রচনা করেছিল সে তো কেবলমাত্র একটি আধারকে রচনা করে নি। মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ মাত্র ঘটাবার জন্যে এই পাত্রের সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ, মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োজনসাধন এর দ্বারা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যেই এ নিঃশেষ হয় নি। তার থেকে এ অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বড়ো। গ্রীক শিল্পী সুষমাকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা দান করেছে; রূপলোকে অপরূপকে ব্যক্ত করেছে। সে কোনো সংবাদ দেয় নি, বহিঃসংসারের কোনো-কিছুর পুনরাবৃত্তি করে নি। অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে-চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি; প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি নয়। তাতে মানুষের নিত্যকর্মের, দৈনিক জীবনের সম্বন্ধ থাকতেও পারে। কিন্তু, সেটা অবান্তর।

আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা জানার অস্পষ্টতা সেখানে জানি, মিলিয়ে জানতে না পারাই তার কারণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জ্ঞানে ভাবে এই-যে একের বিহার, সেই এক যখন লীলাময় হয় যখন সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন এককে বাহিরে সুপরিস্ফুট করে তুলতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ্য ক'রে, উপাদানকে

আশ্রয় ক'রে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয় ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়। যে-মানুষ অরসিক সে এই চরম এককে দেখতে পায় না; সে কেবল উপাদানের দিক থেকে, প্রয়োজনের দিক থেকে এর মূল্য নির্ধারণ করে।—

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যুথি
মত্তমধুপভোরনী।

বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সম্মিলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদি সেই একের আবির্ভাবই চরম হয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে, যদি এই কাব্য খণ্ড খণ্ড হয়ে উল্কাবৃষ্টির দ্বারা আমাদের মনকে আঘাত না করতে থাকে, যদি ঐক্যরসের চরমতাকে অতিক্রম করে আর-কোনো উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে না ওঠে, তা হলেই এই কাব্যে আমরা সৃষ্টিলীলাকে স্বীকার করব।

গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর-কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

গোলাপের মধ্যে সুনিহিত সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে-ঐক্য নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্তের সংগীতের সঙ্গে এই গোলাপের সুরটুকুর মিল আছে; নিখিল এই ফুলের সুষমাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।

এই কথাটাকে আর-এক দিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি যখন টাকা করতে চাই তখন আমার টাকা করবার নানা প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করে। বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষ্যের ঐক্য অর্থকামীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু, এই ঐক্য আপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই খণ্ডিত, নিখিলের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যুক্ত নয়। ধনলোভী বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে খাবলে নিয়ে আপন মুনফার মধ্যে সঞ্চিত করতে থাকে। অর্থকামনার ঐক্য বড়ো ঐক্যকে আঘাত করতে থাকে। সেইজন্যে উপনিষদ যেখানে বলেছেন, নিখিল বিশ্বকে একের দ্বারা পূর্ণ করে দেখবে, সেইখানেই বলেছেন, মা গৃধঃ— লোভ করবে না। কারণ, লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হতে হয়। লোভীর হাতে কামনার

সেই লণ্ঠন যা কেবল একটি বিশেষ সংকীর্ণ জায়গায় তার সমস্ত আলো সংহত করে; বাকি সব জায়গার সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য গভীর অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতএব, লোভের এই সংকীর্ণ ঐক্যের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্যের, রস-সাহিত্য ও ললিতকলার ঐক্যের সম্পূর্ণ তফাত। নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস। লক্ষপতি টাকার থলি নিয়ে ভেদ ঘোষণা করে; আর গোলাপ নিখিলের দূত, একের বার্তাটি নিয়ে সে ফুটে ওঠে। যে এক অসীম, গোলাপের হৃদয়টুকু পূর্ণ করে সেই তো বিরাজ করে। কীট্‌স্ তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীকপাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> Thou silent form, dost tease us out of thought,
> As doth eternity.

হে নীরব মূর্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল করে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও, যেমন নিয়ে যায় অসীম।

কেননা, অখণ্ড একের মূর্তি যে-আকারেই থাক্-না অসীমকেই প্রকাশ করে; এইজন্যই সে অনির্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।

অসীম একের সেই আকৃতি যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হল না, সেই সৃষ্টির আকৃতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম একের আকুতিই তো সেই বেদনা যা বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করে রয়েছে। সে 'রোদসী', 'ক্রন্দসী'— সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে আবর্তিত— সূর্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে পরমাণুতে, সুখে দুঃখে, জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে ব'লেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল; অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্বচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে-রস মানুষের কাছে এসে পৌছবে সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে-জল তার জন্যে, ভাঁড় হোক, গণ্ডূষ হোক, কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কী; কী বিচিত্র এর গড়ন, কত রঙ দিয়ে আঁকা। এ'কে সময় নষ্ট করা বললে প্রতিবাদ করা যায় না। রূপদক্ষ আপনার চিত্তকে এই একটি ঘটের উপর

উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে ; বলতে পার, সমস্তই বাজে খরচ হল। সে কথা মানি ; সৃষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাস-তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গি। যারা মুনফার হিসাব রাখে তারা বলে, এটা লোকসান ; যারা সন্ন্যাসী তারা বলে, এটা অসংযম। বিশ্বকর্মা তাঁর হাপর হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না। বিশ্বকবি এই বাজে-খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হল না।

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে, 'আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন করে পার আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও।' এই ব্যাকুল প্রার্থনা যার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌঁচেছে সে আপিসের তাড়া, ব্যবসায়ের তাগিদ, হিতৈষীর কড়া হুকুম ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু না, একখানি তম্বুরা হাতে নিয়ে ঘড় ছেড়ে বাইরে এসেছে। কী যে করবে কে জানে। সুরের পর সুর, রাগের পর রাগ যে তার অন্তরে বাজিয়ে তুলবে সে কে। সে তো বিজ্ঞানে যাকে প্রকৃতি ব'লে থাকে সেই প্রকৃতি নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের জমা-খরচের খাতায় তার হিসাব মেলে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন তার জঠরের মধ্যে হুকুম জাহির করছে। কিন্তু, মানুষ কি পশু যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাবুকের চোটে প্রকৃতির নির্দিষ্ট পথে চলবে। লীলাময় মানুষ প্রকৃতিকে ডেকে বললে, 'আমি রসে ভোর, আমি তোমার তাঁবেদার নই, চাবুক লাগাও তোমার পশুদের পিঠে। আমি তো ধনী হতে চাই নে, আমি তো পালোয়ান হতে চাই নে, আমার মধ্যে সেই বেদনা আছে যা নিখিলের অন্তরে। আমি লীলাময়ের শরিক।'

এই কথাটি জানতে হবে— মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন-মনে গান গেয়েছি তখন কীট্‌সের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল করে তুলেছে, জিজ্ঞাসা করেছি— এ কি একটা মায়ামাত্র না এর কোনো অর্থ আছে। গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন। কেননা, গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না ব'লেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারি নে। নিত্য-অভ্যাসের স্থূল পর্দায় তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের

নিয়ে যায়; সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।

একটু বেশি কবিত্ব লাগছে? শ্রোতারা মনে ভাবছেন, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর-একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য; সেই তথ্য যাকে অবলম্বন ক'রে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।

আমার ব্যক্তিরূপটি হচ্ছে আমাতে বদ্ধ আমি। এই-যে তথ্যটি এ অন্ধকারবাসী, এ আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে পারে না। যখনই এর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে তখনই একটি বড়ো সত্যের দ্বারা এর পরিচয় দিতে হবে, যে সত্যকে সে আশ্রয় করে আছে। বলতে হবে, আমি বাঙালি। কিন্তু, বাঙালি কী। ও তো একটা অবাচ্ছিন্ন পদার্থ, ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। তা হোক, ঐ ব্যাপক সত্যের দ্বারাই তথ্যের পরিচয়। তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র— সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।

যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হল আমার সীমার দিকের কথা; এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মানুষ, এটা হল আমার অসীমের অভিমুখী কথা; এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশমান।

চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকু মাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ্য ক'রে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিশুদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। এই ছন্দটি বিশ্বের নিত্যবস্তু; এই ছন্দের ঐক্যসূত্রেই তথ্যের মধ্যে আমরা সত্যের আনন্দ পাই। এই বিশ্বছন্দের দ্বারা উদ্ভাসিত না হলে তথ্য আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটি মাত্র আমাদের কাছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনি নে; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের

চিত্তে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই খবরটির পুনরাবৃত্তি করে, তা হলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী।' অর্থাৎ, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি নে ব'লে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু, যে-মুহূর্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্য কথাটাই একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে, 'তাতে আমার কী।' কারণ, সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই নে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোধূলিবেলায় বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল, এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হত তা হলে হয়তো আরও অনেক কথা বলতে হত; আশপাশের অধিকাংশ খবরই বাদ গিয়েছে। কবি হয়তো বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার খিদে পেয়েছিল এবং মনে মনে মিষ্টান্নবিশেষের কথা চিন্তা করছিল। হয়তো সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু, তথ্যসংগ্রহ কবির কাজ নয়। এইজন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাঁটা পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে ব'লেই সংগীতের বাঁধনে ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।

যথার্থ গুণী যখন একটা ঘোড়া আঁকেন তখন বর্ণ ও রেখা সংস্থানের দ্বারা একটি সুষমা উদ্ভাবন ক'রে সেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যরূপে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটির বিক্ষিপ্ততা বাদ পড়ে যায়, একখানা ছবি আপনার নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে। তথ্যগত ঘোড়ার বহুল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই ঐক্যটি বাধামুক্ত বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয়।

কিন্তু, তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ। ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরি লাগে না। ঘোর অরসিক ঘোড়ার কানের ডগা থেকে আরম্ভ করে তার লেজের শেষ পর্যন্ত হিসাব করে মিলিয়ে দেখতে পারে। হিসাবে ত্রুটি হলে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে মার্কা কেটে দেয়। ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তা হলে পুরাপুরি হিসাব মেলে। আর, ঘোড়া যদি উপলক্ষ্য হয় আর ছবিই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে হিসাবের খাতা বন্ধ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যখন ঘোড়ার পরিচয় দিতে চান তখন তাঁকে একটা শ্রেণীগত সত্যের আশ্রয় নিতে হয়। এই ঘোড়াটি কী। না, একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ।

এইরকম ব্যাপক ভূমিকার মধ্যে না আনলে পরিচয় দেবার কোনো উপায় নেই।

সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখা-গীতের সুষমা-যুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।

জাপানি কোনো ওস্তাদের ছবিতে দেখেছিলুম, একটি মূর্তির সামনে সূর্য কিন্তু পিছনে ছায়া নেই। এমন অবস্থায় যে লম্বা ছায়া পড়ে, এ কথা শিশুও জানে। কিন্তু বস্তুবিদ্যার খবর দেবার জন্যে তো ছবির সৃষ্টি নয়। কলা-রচনাতেও যারা ভয়ে ভয়ে তথ্যের মজুরি করে তারা কি ওস্তাদ।

অতএব, রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে, তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়। একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে এর উদাহরণ দিতে চাই—

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

জুতা জিনিসটা তথ্যের কোঠায় পড়ে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। চীনে মুচির দোকানে নগদ কড়ি দিলেই মাপসই জুতা পছন্দসই আকারে পেতে সবাই পারে। কিন্তু, জুতুয়া? চীনেম্যান দূরে থাক্‌, বিলিতি দোকানের বড়ো ম্যানেজারও তার খবর রাখে না। জুতুয়ার খবর রাখে মা, আর রাখে খোকা। এইজন্যই এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে ব'লে জুতা শব্দের ভদ্রতা নষ্ট করতে হল। তাতে আমাদের শব্দাবুধি বিক্ষুব্ধ হতে পারে, কিন্তু তথ্যের জুতা সত্যের মহলে চলে না ব'লেই ব্যাকরণের আক্রোশকেও উপেক্ষা করতে হয়।

কবিতা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।

জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার

আছে ; রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়। আর, চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের বন কোন দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কী উপায়ে। যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ কেঁদে বসে আছে ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র ক'রে নানা ফাঁকে, নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই—

একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তীনগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিলে ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে প'ড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, "অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।"

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা প'ড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন ; বলেছিলেন, "এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন কি, আমার মতো কবি যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না এবং তথ্যের জগতে পাগলা-গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানিমাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত ; কিন্তু, সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে ; এবং তার পরে

সে মেয়ে যে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না— সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায়; তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাঁটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উলটো-পালটা কাণ্ড।

তথ্যজগতে একজন ভালো ডাক্তার সব হিসাবেই খুব যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁর পয়সা এবং পসার যতই অপর্যাপ্ত হোক-না কেন, তার উপরে চোদ্দ লাইনের কবিতা লেখাও চলে না। নিতান্ত যে উমেদার সে যদি বা লিখে বসে তা হলে বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও চোদ্দ দিনও সে কবিতার আয়ুরক্ষা হয় না। অতএব, রসের জগতের আলোকরশ্মি এতবড়ো ডাক্তারের মধ্য দিয়েও পার হয়ে যায়। কিন্তু, এই ডাক্তারকে যে তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভালো বেসেছে তার কাছে ডাক্তার রসবস্তু হয়ে প্রকাশ পায়। হবামাত্র ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল।

আহ্নিক বলছেন, লাখ লাখ যুগ পূর্বে ডারুয়িনের মতে ডাক্তারের পূর্বতন সত্তা যে কী ছিল সে কথা উত্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ না হলেও রুচিবিরুদ্ধ। যা হোক, সোজা কথা হচ্ছে, ডাক্তারের কুষ্ঠিতে লাখ লাখ যুগের অঙ্কপাত হতেই পারে না।

তর্ক করা মিছে, কারণ শিশুও এ কথা জানে। ডাক্তার যে সে তো সেদিন জন্মেছে; কিন্তু বন্ধু যে সে নিত্যকালের হৃদয়ের ধন। সে যে কোনো-এক কালে ছিল না, আর কোনো-এক কালে থাকবে না, সে কথা মনেও করতে পারি নে।

জ্ঞানদাসের দুটি পংক্তি মনে পড়ছে—

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই,
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই।

এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু, রসসত্যের ক্ষেত্রে যে-প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাত্ম্য নেই।

অতএব, কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে-বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের

চার দিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীরা চিরকাল তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে—

ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ ॥

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে হানিবে, অবিচল রব তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে ॥

সৃষ্টি

আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব ব'লে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লৌহপথে কুশ্রীতার রথযাত্রা চলছে না, যেন দরদাম কেনাবেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হল না; পর্দাটা তুলে দিলে— এই ট্রাম-চলাচলের, কেনা-বেচার, হাঁক-ডাকের পর্দা। বরবধূকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে।

তুচ্ছতার সংসারে, কেনাবেচার জগতে, বরবধূরাও তুচ্ছ; কেই বা জানে তাদের নাম, কেই বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু, রসের নিত্যলোকে তারা রাজারানী। চারি দিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের বরণ করে নিতে হবে। প্রতিদিন তারা তুচ্ছতার অভিনয় করে, এইজন্যেই প্রতিদিন তারা ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর। আজ তারা সত্যরূপে প্রকাশমান; তাদের মূল্যের সীমা নেই; তাদের জন্যে দীপমালা সাজানো, ফুলের ডালি প্রস্তুত, বেদমন্ত্রে চিরন্তন কাল তাদের আশীর্বাদ করবার জন্যে উপস্থিত।

এই বরবধূ, এই দুটি মানুষ যে সত্য, কোনো রাজা-মহারাজার চেয়ে কম সত্য নয়, সমস্ত সংসার তাদের এই পরিচয়টি গোপন করে রাখে। কিন্তু, সেই নিত্যপরিচয় প্রকাশ করবার ভার নিয়েছে বাঁশি। মনে করো-না কেন, এক কালে তপোবনে থাকত একটি মেয়ে; সেদিনকার হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে সেও ছিল সামান্যতার কুহেলিকায় ঢাকা। তাকে দেখে একদিন রাজার মন ভুলেছিল, আর-একদিন রাজা তাকে ত্যাগ

করেছিল। সেদিন এমন কত ঘটেছে তার খবর কে রাখে। তাই তো রাজা নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছে, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।' রাজার সকৃৎপ্রণয়ের প্রাত্যহিক উচ্ছিষ্টদের লক্ষ্য ক'রে দেখবার, মনে ক'রে রাখবার, এত সময় আছে কার। কাজকর্ম তো থেমে থাকে না, কেনাবেচা তো চলছেই, হাটের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি ভিড়। সেই সংসারের পথে হংসপদিকাদের পদচিহ্ন কোথাও পড়ে না, তাদের ঠেলে সরিয়ে ফেলে জীবনযাত্রার অসংখ্য যাত্রী ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু, একটি তপোবনের বালিকাকে অসংখ্যের তুচ্ছলোক থেকে একের সত্যলোকে সুস্পষ্ট ক'রে দাঁড় করালে কে। সেও একটি কবির বাঁশি। যে সত্য প্রতিদিন ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি ও দরদামের হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে, খাম্বাজের করুণ রাগিণী আমাদের গলির মোড়ে সেই সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে সুরের অমৃত বর্ষণ করছে।

তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে অমনি তার মূল্যের কত পরিবর্তন হয়, সে কি আমরা দেখি নে। রাখাল যখন ব্রজের রাখাল হয়ে দেখা দেয় তখন কি মথুরার রাজপুত্র ব'লে তার মূল্য। তখন কি তার পাঁচনির মহিমা গদাচক্রের চেয়ে কম। তার বাঁশি কি পাঞ্চজন্যের কাছে লজ্জা পায়। সত্য যে সে কি মণিমালা ফেলে দিয়ে বনফুলের মালা পরতে কুণ্ঠিত। সেই রাখালবেশের সত্যকে প্রকাশ করতে পারে কে। সে তো কবির বাঁশি। রাজাধিরাজ মহারাজ নিজের মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে কী আয়োজনই না করলে। তবু আজ বাদে কাল সেই বিপুল আয়োজনের বোঝা নিয়ে ঝঞ্ঝাশেষের মেঘের মতো দিগন্তরালে সে যায় মিলিয়ে। কিন্তু, সাহিত্যের অমরাবতীতে কলার নিত্য-নিকেতনে একটি পথের ভিক্ষু যে অখণ্ড সত্যে বিরাজ করে সেই সত্যের ক্ষয় নেই। রোমিয়ো-জুলিয়েটকে যখন সাহিত্যভুবনে দেখি তখন কোনো মূঢ় জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাঙ্কে তাদের কত টাকা জমা আছে, ষড়্‌দর্শনে তাদের ব্যুৎপত্তি কত দূর, এমন-কি দেবদ্বিজে তারা ভক্তিমান কি না এবং নিত্য নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিকে তাদের কী পরিমাণ নিষ্ঠা। তারা সত্য এইমাত্র তাদের মহিমা; সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে। সেই সত্যে যদি তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে, অথচ নায়ক নায়িকা দোঁহে মিলে যদি দশাবতারের সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা গীতার শ্লোক থেকে দেশাত্মবোধের আশ্চর্য অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে পারে, তবু তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

শুধু কেবল মানুষ কেন, অজীব সামগ্রীকে যখন আমরা কাব্যকলার রথে তুলে তথ্যসীমার বাহিরে নিয়ে যাই তখন সত্যের মূল্যে সে মূল্যবান্ হয়ে ওঠে। কলকাতায় আমার এক কাঠা জমির দাম পাঁচ-দশ হাজার টাকা হতে পারে, কিন্তু সত্যের রাজত্বে সেই

দামকে আমরা দাম ব'লেই মানি নে—সে দাম সেখানে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়। বৈষয়িক মূল্য সেখানে পরিহাসের দ্বারা অপমানিত। নিত্যলোকে রসলোকে তথ্যবন্ধন থেকে মানুষের এই-যে মুক্তি এ কি কম মুক্তি। এই মুক্তির কথা আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানুষ গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে; আপন সত্য ঐশ্বর্যকে হাট-বাজার থেকে বাঁচিয়ে এনে সুন্দরের নিত্য ভাণ্ডারে সাজিয়ে রেখেছে; তার নিকড়িয়া ধনকে নিকড়িয়া বাঁশির সুরে গেঁথে রেখেছে। আপনাকে আপনি বারবার বলেছে, 'ঐ আনন্দলোকেই তোমার সত্য প্রকাশ।'

আমি কী বোঝাব তোমাদের কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে চিত্রকলা। বিশ্লেষণ ক'রে কি এর মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারি। কোন্ আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায়, যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম, বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই; এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, 'আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ।' এ কথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরমিয়া কবি। সকালবেলায় প্রভাতকিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী। না, নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকরগুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হয়ে এসে ধাক্কা দিল, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যামেঘে অস্ত-সূর্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এত সাজসজ্জা এই দূতের, এত ফুলের মালা, এত গৌরবের মুকুট। কার জন্যে। আমার জন্যে। আমি রাজা নই, জ্ঞানী নই, গুণী নই— আমি সত্য, তাই আমার জন্যে সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি। সে উত্তর ঐ আনন্দধামের বাণীতেই যদি না লিখি তা হলে কি গ্রাহ্য হবে। মানুষ তাই মধুর করেই বললে, 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল; হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক'রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক'রে তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্বাণ তারকার প্রদীপ জেলে তোমার দূতের হাতে দিয়েছ, আমাকেও তেমনি করে আলো জ্বালতে হবে যে-আলো নেবে না, মালা গাঁথতে হবে যে-মালা শুকোতে জানে না। আমি মানুষ, আমার ভিতর যদি অনন্তের শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির ঐশ্বর্য দিয়েই তোমার আমন্ত্রণের উত্তর দেব।' মানুষ এমন কথা সাহস করে বলেছে, এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব।

আজ যখন আমাদের গলিতে বরবধূর সত্যস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করবার ভার নিলে ঐ বাঁশি, তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেম, কী মন্ত্রে বাঁশি আপনার কাজ সমাধা করে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানী তো বলে, অনিশ্চিতের দোলায় সমস্ত সংসার দোদুল্যমান ; বলে, যা দেখ কিছুই সত্য নয়। আমাদের নীতিনিপুণ বলে, ঐ-যে ললাটে ওরা চন্দন পরেছে, ও তো ছলনা, ওর ভিতর আছে মাথার খুলি। ঐ যে মধুর হাসি দেখতে পাচ্ছ, ঐ হাসির পর্দা তুলে দেখো, বেরিয়ে পড়বে শুকনো দাঁতের পাটি। বাঁশি তর্ক ক'রে তার কোনো জবাব দেয় না ; কেবল তার খাম্বাজের সুরে বলতে থাকে, খুলি বল, দাঁতের পাটি বল, যত কালই টি঳কে থাক্-না কেন, ওরা মিছে ; কিন্তু ললাটে যে আনন্দের সুগন্ধলিপি আছে, মুখে যে লজ্জার হাসির আভা দিচ্ছে, যা এখন আছে তখন নেই, যা ছায়ার মতো মায়ার মতো, যাকে ধরতে গেলে ধরা যায় না, তাই সত্য, করুণ সত্য, মধুর সত্য, গভীর সত্য। সেই সত্যকেই সংসারের সমস্ত আনাগোনার উপরে উজ্জ্বল ক'রে ধরে বাঁশি বলছে, 'সত্যকে যেদিন প্রত্যক্ষ দেখবে সেই দিনই উৎসব।'

বুঝলুম। কিন্তু, বিনা তর্কে বাঁশি এতবড়ো কথাটাকে সপ্রমাণ করে কী করে। এ কথাটা কাল আলোচনা করেছিলুম। বাঁশি একের আলো জ্বালিয়েছে। আকাশে রাগিণী দিয়ে এমন একটি রূপের সৃষ্টি করেছে যার আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেবল ছন্দে সুরে সুসম্পূর্ণ এককে চরমরূপে দেখানো। সেই একের জীয়নকাটি যার উপরে পড়ল আপনার মধ্যে গভীর নিত্যসত্যের চিরজাগ্রত চিরসজীব স্বরূপটি সে দেখিয়ে দিলে ; বরবধূ বললে, 'আমরা সামান্য নই, আমরা চিরকালের।' বললে, 'মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যারা আমাদের দেখে তারা মিথ্যা দেখে। আমরা অমৃতলোকের, তাই গান ছাড়া আমাদের পরিচয় আর কিছুতে দিতে পারি না।' বরকনে আজ সংসারের স্রোতে ভাসমান খাপছাড়া পদার্থ নয় ; আজ তারা মধুরের ছন্দে একখানি কবিতার মতো, গানের মতো, ছবির মতো আপনাদের মধ্যে একের পরিপূর্ণতা দেখাচ্ছে। এই একের প্রকাশতত্ত্বই হল সৃষ্টির তত্ত্ব, সত্যের তত্ত্ব।

সংগীত কোনো-একটি রাগিণীতে যতই রমণীয় সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করুক-না কেন, সাধারণ ভাষায় এবং বাহিরের দিক থেকে তাকে অসীম বলা যায় না। রূপের সীমা আছে। কিন্তু, রূপ যখন সেই সীমামাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জ্বালিয়ে ধরে তখনি সত্য প্রকাশ পায়।

আজকেকার সানাই বাজনাতেই এ কথা আমি অনুভব করছি। প্রথম দুই-একটা তানের পরই বুঝতে পারলুম, এ বাঁশিটা আনাড়ির হাতে বাজছে, সুরটা খেলো সুর।

বার বার পুনরাবৃত্তি, তার স্বরের মধ্যে কোথাও সুরের নম্রতা নেই, তরুহীন মাটির মধ্যে ছায়াহীন মধ্যাহ্নরৌদ্রের মতো। যত ঝোঁক সমস্তই আওয়াজের প্রখরতার উপর। সংগীতের আয়তনটাকেই বড়ো ক'রে তোলবার দিকে বলবান প্রয়াস। অর্থাৎ, সীমা এখানে আপনাকেই বড়ো করে দেখাতে চাচ্ছে— তারই 'পরে আমাদের মন না দিয়ে উপায় নেই। তার চরমকে সে আপনার পালোয়ানির দ্বারা ঢেকে ফেলছে। সীমা আপন সংযমের দ্বারা আপনাকে আড়াল ক'রে সত্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্যে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। সংযমই হচ্ছে সীমার তর্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দেশ করা। কোনো জিনিসের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম। সেটাই হল একের বিরুদ্ধে অনেকের বিদ্রোহ। সেই বাহ্য অনেকের পরিমাণ যতই বড়ো হতে থাকে অন্তর্যামী এক ততই আচ্ছন্ন হয়। যিশু বলেছেন, 'বরঞ্চ উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে গলতে পারে কিন্তু ধনের আতিশয্য নিয়ে কোনো মানুষ দিব্যধামে প্রবেশ করতে পারে না।' তার মানে হচ্ছে, অতিমাত্রায় ধন জিনিসটা মানুষের বাহ্য অসংযম। উপকরণের বাহুল্য দ্বারা মানুষ আত্মার সুসম্পূর্ণ ঐক্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অধিকাংশ চিন্তা চেষ্টা খণ্ডিত ভাবে বহুল সঞ্চয়ের মধ্যে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। যে-এক সম্পূর্ণ, যে-এক সত্য, যে-এক অসীম, আপনার মধ্যে তার প্রকাশকে ধনী বহুবচিত্রের মধ্যে ছড়াছড়ি ক'রে নষ্ট করে। জীবন-বাঁশিতে সেই তো খেলো সুর বাজায়— তানের অদ্ভুত কসরত, দুন-চৌদুনের মাতামাতি, তারস্বরের অসহ্য দাম্ভিকতা। এতেই অরসিকের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। রূপের সংযমের মধ্যে যারা সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে চায় তারা রূপের জঙ্গলের প্রবলতার দস্যুবৃত্তি দেখে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। সেখানে রূপ হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে দেখো'। কেন দেখব। জগতে রূপের সিংহাসনে অরূপকে দেখব বলেই এসেছি। কিন্তু, জগতে বিজ্ঞান যেমন অবস্তুকে খুঁজে বের করে বলছে 'এই তো সত্য', রূপজগতে কলা তেমনি অরূপ রসকে দেখিয়ে বলছে 'ঐ তো আমার সত্য'। যখন দেখলুম সেই সত্য তখন রূপ আর আমাকে লোভ দেখাতে পারে না, তখন কস্‌রতকে বলি 'ধিক্'।

পেটুক মানুষের যখন পেটের ক্ষুধা ঘোচে তখনও তার মনের ক্ষুধা ঘোচে না। মেয়েরা খুশি হয়ে তার পাতে যত পারে পিটেপুলি চাপাতে থাকে। অবশেষে একদিন অম্লশূলরোগীর সেবার জন্য সেই মেয়েদের 'পরেই ডাক পড়ে। সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে— তাদের মুক্তি নেই। কারণ, রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়। যারা

ফর্মা গণনা ক'রে পুঁথির দাম দেয় তাদের মন পুঁথি চাপা পড়ে কবরস্থ হয়।

কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে— রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা; অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দেখা; ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখা, এবং মা গৃধঃ—লোভ কোরো না— এই অনুশাসন গ্রহণ করা। সৃষ্টির তত্ত্বই এই; জগৎসৃষ্টিই বল আর কলাসৃষ্টিই বল। রূপকে মানতেও হবে, না'ও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।

এই যে আমাদের একটা আশ্চর্য দেহ, এর ভিতরে আশ্চর্য কতকগুলো কল— হজম করবার কল, রক্তচালনার কল, নিশ্বাস নেবার কল, চিন্তা করবার কল। এই কলগুলোর সম্বন্ধে ভগবানের যেন বিষম একটা লজ্জা আছে। তিনি সবগুলোই খুব ক'রে ঢাকা দিয়েছেন। আমরা মুখের মধ্যে খাবার পুরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই, এ কথাটাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের মুখ ভাবের লীলাভূমি, অর্থাৎ মুখে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা রক্তমাংসের অতীত, যা অরূপ ক্ষেত্রের; এইটেতেই মুখের মুখ্য পরিচয়। মাংসপেশী খুবই দরকারি, তার বিস্তর কাজ, কিন্তু মুগ্ধ হলুম কখন। যখন আমাদের সমস্ত দেহের সংগীতকে তারা গতিলীলায় প্রকাশ করে দেখালে। মেডিকেল কলেজে যারা দেহ বিশ্লেষণ ক'রে শরীরতত্ত্ব জেনেছে সৃষ্টিকর্তা তাদের বলেন, 'তোমাদের প্রশংসা আমি চাই নে।' কেননা, সৃষ্টির চরমতা কৌশলের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, 'জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে আমি যে ভালো এঞ্জিনিয়ার এটা নাই বা জানলে।' তবে কী জানব। 'আনন্দরূপে আমাকে জানো।' ভূস্তরসংস্থানে বড়ো বড়ো পাথরের শিলালিপিতে তার নির্মাণের ইতিহাস গুপ্ত অক্ষরে খোদিত আছে। মাটির উপর মাটি দিয়ে সে সমস্তই বিধাতা চাপা দিয়েছেন। কিন্তু, উপরটিতে যেখানে প্রাণের নিকেতন, আনন্দনিকেতন, সেইখানেই তাঁর সূর্যের আলো চাঁদের আলো ফেলে কত লীলাই চলছে তার সীমা নেই। এই ঢাকাটা যখন ছিল না তখন সে কী ভয়ংকর কাণ্ড। বিশ্বকর্মার কী হাতুড়ি-ঠোকাঠুকি, বড়ো বড়ো চাকার সে কী ঘুরপাক, কী অগ্নিকুণ্ড, কী বাষ্পনিশ্বাস। তার পরে কারখানাঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে, সবুজ নীল সোনার ধারায় সমস্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে, তারার মালা মাথায় প'রে, ফুলের পাদপীঠে পা রেখে, তিনি আনন্দে রূপের আসন গ্রহণ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর যে-সভ্যতা তাল ঠুকে মাংসপেশীর গুমর ক'রে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, কারখানাঘরের চোঙাগুলোকে ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড বানিয়ে আলোকের আঙিনায় কালী লেপে দিচ্ছে, সেই বেআব্রু

সভ্যতার 'পরে সৃষ্টিকর্তার লজ্জা দেখতে পাচ্ছ না কি। ঐ বেহায়া যে আজ দেশে বিদেশে আপন দল জমিয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে টোকিও পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে, ঘাটিতে ঘাটিতে, তার উদ্ধত যন্ত্রগুলো উৎকট শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা সৃষ্টির মঙ্গলশঙ্খধ্বনিকে ব্যঙ্গ করছে। উলঙ্গশক্তির এই দৃপ্ত আত্মম্ভরিতা আপন কলুষ-কুৎসিত মুষ্টিতে অমৃতলোকের সম্মান লুট করে নিতে চায়। মানবসংসারে আজকের দিনের সব-চেয়ে মহৎ দুঃখ, মহৎ অপমান এই নিয়েই।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করছে, মিস্ত্রি করছে, মহাজন করছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে। মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। ব্যবসায়ের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠতে থাকে তখন আত্মার বাণী নিরস্ত হয়ে যায়। ধনী তখন দিব্যধামের পথের চিহ্ন লোপ করে দেয়, সকল পথকেই হাটের দিকে নিয়ে আসে।

কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়—যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্যে সমগ্র মানুষের তপস্যা। যেখানে মহাসাধকেরা সাধন করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে। যেখানে একজন ধনী দশ জনকে শোষণ করছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ ক'রে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ, শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

যে মানুষ লোভী চিরদিনই সে নির্লজ্জ; যে লোক শক্তির অভিমানী, সত্যযুগেও নিখিলের সঙ্গে আপন অসামঞ্জস্য নিয়েই সে দম্ভ করেছে। কিন্তু সেকালে তার লজ্জাহীনতাকে, তার দম্ভকে তিরস্কৃত করবার লোক ছিল। মানুষ সেদিন লোভীকে, শক্তিশালীকে, এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হয় নি— 'পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে, তুমি তাতে বেসুর লাগিয়ো না; জগতে আনন্দলক্ষ্মীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।' এই কথাই বলছে কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্রকলা। আজ বিবাহের দিনে বাঁশি বলছে, 'বরবধূ, তোমরা যে সত্য এই কথাটাই অন্য সকল কথার চেয়ে বড়ো করে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করো। লাখ দু-লাখ টাকা ব্যাঙ্কে

জমছে বলেই যে সত্য তা নয়; যে-সত্যের বাণী আমি ঘোষণা করি সে সত্য বিশ্বের ছন্দের ভিতর, চেক-বইয়ের অঙ্কের মধ্যেই নয়। সে-সত্য পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অমৃত সম্বন্ধে— গৃহ সজ্জার উপকরণে নয়। সেই হচ্ছে সম্পূর্ণের সত্য, একের সত্য।'

আজ আমি সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব, তার রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব মনে স্থির করেছিলুম। এমন সময় বাজল বাঁশি। ইন্দ্রদেব সুন্দরকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'ব্যাখ্যা করেই যে সব কথা বলা যায়, আর তপস্যা করেই যে সব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় এমন-সব লোক-প্রচলিত কথাকে তুমি কি কবি হয়েও বিশ্বাস কর। ব্যাখ্যা বন্ধ ক'রে তপস্যা ভঙ্গ ক'রে যে ফল পাওয়া যায় সেই হল অখণ্ড। সে তৈরি-করা জিনিস নয়, সে আপনি ফলে-ওঠা জিনিস।' ধর্মশাস্ত্রে বলে, ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিরকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, 'এ জিনিস লড়াই ক'রে তৈরি ক'রে তোলবার জিনিস নয়; এ ক্রমে ক্রমে থাকে থাকে গ'ড়ে ওঠে না। সত্য সুরে গানটিকে যদি সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে চাও, তা হলে রাতদিন বাঁও-কষাকষি ক'রে তা হবে না। তম্বুরার এই খাঁটি মধ্যম-পঞ্চম সুরটিকে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করো এবং অখণ্ড সম্পূর্ণতাটিকে অন্তরে লাভ করো, তা হলে সমগ্র গানের ঐক্যটি সত্য হবে।' মেনকা উর্বশী এরা হল ঐ তম্বুরার মধ্যম-পঞ্চম সুর— পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিসটা কী রকমের। স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও? তাই তোমার তপস্যা? কিন্তু, স্বর্গ তো পরিশ্রম ক'রে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হয় নি। স্বর্গ যে সৃষ্টি। উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে। তুমি মুক্তিকামী মুক্তি চাও? একটু একটু ক'রে অস্তিত্বের জাল ছিঁড়ে ফেলাকে তো মুক্তি বলে না। মুক্তি তো বন্ধনহীন শূন্যতা নয়। মুক্তি যে সৃষ্টি। মেনকার কবরীতে যে-পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্তিটি দেখতে পাবে। বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে— সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ ক'রে সম্পূর্ণ হয়েছে।

বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমের তলায় ব'সে কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তখন তাঁর পীড়িত চিত্ত বলেছে 'হল না', 'পেলুম না'। তাঁর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে পেলেন কখন। যখন সুজাতা অন্ন এনে দিলে। সে কি কেবল দেহের অন্ন। তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য ছিল— সেই পায়স-অন্নের মধ্যেই অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেল। ইন্দ্রদেব কি সুজাতাকে পাঠান নি। সেই সুজাতার

মধ্যেই কি অমরাবতীর সেই বাণী ছিল না যে, কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে। সেই ভক্তহৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃপ্রাণের যে-সত্য ছিল সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেন নি 'এক পুত্রের প্রতি মাতার যে-প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন ক'রে দেখাকেই বলে ব্রহ্মবিহার'? অর্থাৎ, মুক্তি শূন্যতায় নয়, পূর্ণতায়; এই পূর্ণতাই সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না।

মানবাত্মার যে প্রেম অসীম আত্মার কাছে আপনাকে একান্ত নিবেদন ক'রে দিয়েই আনন্দ পায়, তার চেয়ে আর কিছুই চায় না, যিশুখৃস্ট তারই সহজ স্বরূপটিকে বাহিরের মূর্তিতে কোথায় দেখেছিলেন। ইন্দ্রদেব আপন সৃষ্টি থেকে এই মূর্তিটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। মার্থা আর ম্যারি দুজনে তাঁর সেবা করতে এসেছিল। মার্থা ছিল কর্তব্যপরায়ণা, সেবার কঠোরতায় সে নিত্যনিয়ত ব্যস্ত। ম্যারি সেই ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে আত্মনিবেদনের পূর্ণতাকে বহু প্রয়াসে প্রকাশ করে নি। সে আপন বহুমূল্য গন্ধতৈল খৃস্টের পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে। সকলে বলে উঠল, 'এ যে অন্যায় অপব্যয়।' খৃস্ট বললেন, 'না, না, ওকে নিবারণ কোরো না।' সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়। গানে কি কারও কোনো লাভ আছে। চিত্রকলায় কি অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়। কিন্তু, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য লাভ করে। সেই ঐশ্বর্য শুধু তার সাহিত্যে ললিতকলায় নয়, তার আত্মবিসর্জনের লীলাভূমি সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। সেই সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে— তা অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। যিশুখৃস্ট ম্যারির চরম আত্মনিবেদনের সহজ রূপটি দেখলেন; তখন তিনি নিজের অন্তরের পূর্ণতাকেই বাহিরে দেখলেন: ম্যারি যেন তাঁর আত্মার সৃষ্টিরূপেই তাঁর সম্মুখে অপরূপ মাধুর্যে প্রকাশিত হল। এমনি করেই মানুষ আপন সৃষ্টিকার্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্ছে। কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, উপকরণসংগ্রহে নয়। তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক— লক্ষপতির কোষাগার নয়, পৃথ্বীপতির জয়স্তম্ভ নয়। তাকে যেন লোভে না ভোলায়, দম্ভে অভিভূত না করে; কেননা সে সংগ্রহকর্তা নয়, নির্মাণকর্তা নয়, সে সৃষ্টিকর্তা।

১৩৩৭

সাহিত্যধর্ম

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র, এই তিনজনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুত রাজকন্যা ব'লে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্‌টিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে ; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় পৃথিবীর সকল কন্যাই সমান দরের মানুষ— ঘুঁটেকুড়োনির সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্নজিজ্ঞাসা।

আর-একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন ; আছে মুনফার হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন— অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি— তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, 'তুমি কেন।' সে বলে 'তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।' রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে ; কিন্তু, যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দ-বোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না।— আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আপিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে।

কাঠা-বিঘের দরে তার বেচাকেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে অখণ্ড আকাশে তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীব-লীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য, মাটির নিচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানবকীটও আছে, আকাশের কৃপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেছে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু, রূপকথার রাজপুত্রের মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপবিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে অনির্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অন্যদের ব্যবহার অন্যরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যার হৃৎস্পন্দন কোন্ ছন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মন্থন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বন্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু, রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবন্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখলেও নিশ্চয় দম আটকে ঘেমে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্তত চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।

অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা— তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের স্বরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেতঝংকারে বাজতে থাকে 'অলম্'— অর্থাৎ, 'বাস, আর কাজ নেই।' এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ

সত্য হল এক, আর সার্থক সত্য হল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ 'লাখে না মিলল এক'। করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তখন সেই ছন্দকে ধন্য করবার জন্যে নারদঋষির কাছ থেকে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা, ছন্দ অলংকার। যথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে, এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ ব'লে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক ক'রে দেখাতে পারেন। যে-জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক। এক টুকরো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে ভোলবার জন্যে বৈদ্য ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁত-গুলো আঁত্‌কে ওঠে— তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়কে বরণ ক'রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্‌নে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজ্‌নে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো। বক ফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজ্‌নেমঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন, বক ফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা— কেননা, পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডাল্‌নায় লাগত তা হলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হত। তিসিফুল শর্ষে ফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষ ফুলের সঙ্গে গোলাপজাম ফুলের রূপে গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল; কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজনলোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্বনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের

মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি, অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখি ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়; কিন্তু, রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হল। সকল ব্যবহারের অতীত বলেই মকর বেঁচে গেছে— ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হল না, নির্বাচনের সময় রুই কাত্‌লাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাখনায় জোর কম বলেই এমনটা ঘটেছে তা তো মানতে পারি নে। কেননা, লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন বলে বেছে নিলেন তার দৌর্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচু গাছ আঁকতে রূপকারের তুলিতে সংকোচ নেই। কিন্তু, বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচু গাছের নাম করা মুশকিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন ব'লে সামলে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানা ভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে কুর্‌চি ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্তত করেছি, কিন্তু কুর্‌চি ফুল আঁকতে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ কথাটা বলা দরকার, য়ুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিসটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখি নে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হলেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমসলা; গৃহকর্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে, কার্পেট পেতে, তার উপরে নিজের সাধ্যমতো সর্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে; তার দ্বারাই সে সকলের কাছে পরিচিত হতে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে যে খায় বা খাদ্যসঞ্চয় করে, এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে, এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলংকৃত।

জীবধর্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক ব্যাপক হোক, সাহিত্যে

ও অন্য কলায় ব্যঙ্গের ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয় নি। মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয় নি।

স্ত্রীপুরুষের মিলন আহার ব্যাপারের উপরের কোঠায়; কেননা, ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীরবিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রীপুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখতে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেছে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা 'প্রজনার্থং' নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবি ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা চলছেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেছি ওটা নৈতিক ভালোমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু, সে হল বিজ্ঞানের কথা; মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু, রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল, এ কথাও বিজ্ঞানের; সংসারে এ কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অনুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌন-মিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ, যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলংকৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হল বিচার্য।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্য কারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিভূত করে দেয়।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হতেই পারে না; দেখতে দেখতে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্রশৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্যসূর্য তারই কলঙ্কলেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু, সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতিসত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্যের চারি দিকে পৃথিবী ঘোরে, এ কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল; ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য, তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানবমনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাতধর্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ ক'রে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টি঳কতে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালংকারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসা-কাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয়, তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রঙ নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন

ঈশ্বরগুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-শহর কলকাতার বাবুমহলে কিরকম তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পংক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না; পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয়, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকারশব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্যকারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু, মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাত্‌লামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচোখচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সংগীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়; কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু, ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।

উপসংহারে এ কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে, সে-দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু, যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে। ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায় 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন,' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!' ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি।'

১৩৩৪

সাহিত্যে নবত্ব

সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান কাজ হচ্ছে শোনবার লোকের আসনটি বড়ো ক'রে তোলা, যেখান থেকে দাবি আসে। নইলে লেখবার লোকের শক্তি খাটো হয়ে যায়। যে-সব সাহিত্য বনেদি তারা বহু কালের আর বহু মানুষের কানে কথা কয়েছে। তাদের কথা দিন-আনি-দিন-খাই তহবিলের ওজনে নয়। বনেদি সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরি ক'রে তোলে। যে-সমাজে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরি হয়েছে সে-সমাজে বড়ো ক'রে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়, কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যাবসা সেখানে চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা নিয়ে নয়, পুরো নিয়ে। তাদের আধা'র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।

বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা হল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক-না, তার বলবার আদর্শটা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে-আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য প'ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী, কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক

রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার ক'রে নিতে বাধা পায় না। শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়; সেইজন্যে তাঁর গল্প-সাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প-বলার সর্বজনীন আদর্শটাই ফলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হলেই নিমন্ত্রণটা ছোটো হয়; সেটা পারিবারিক ভোজ হতে পারে, স্বজাতের ভোজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের যে-তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে-তীর্থের মহাভোজ হবে না।

কিন্তু, মানুষের কানের কাছে সর্বদাই যারা ভিড় ক'রে থাকে, যাদের ফরমাশ সব-চেয়ে চড়া গলায়, তাদের পাতে জোগান দেবার ভার নিতে গেলেই ঠকতে হবে; তারা গাল পাড়তে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যাবার মতো মনের জোর থাকা চাই। যাদের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষণকালবিহারী, যাদের উপস্থিত গরজের দাবি অত্যন্ত উগ্র, তাদেরই হট্টগোল সব-চেয়ে বেশি শোনা যায়। সকালবেলার সূর্যালোকের চেয়ে বেশি দৃষ্টিতে পড়ে যে-আলোটা ল্যাম্প-পোস্টের উপরকার কাচফলক থেকে ঠিকরে চোখে এসে বেঁধে। আবদারের প্রাবল্যকেই প্রামাণ্য মনে করার বিপদ আছে।

যে-লেখকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তা হলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তা হলে বাইরের নিত্যমুখরকে তিনি দূর থেকে নমস্কার ক'রে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।

ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে-সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শ ছিল এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারব না যে, এই আদর্শ য়ুরোপে সকল সময়েই সমান উজ্জ্বল থাকে। সেখানেও কখনো কখনো গরজের ফরমাশ যখন অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যে খর্বতার দিন আসে। তখন ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেক্‌চারার, সোশিয়লজির গোল্‌ড্‌ মেডালিস্‌ট্‌ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় ক'রে ধর্‌না দিয়ে বসেন।

সকল দেশের সাহিত্যেই দিন একটানা চলে না; মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলেই বেলা পড়ে আসতে থাকে। আলো যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখনি অদ্ভুতের প্রাদুর্ভাব হয়। অন্ধকারের কালটা হচ্ছে বিকৃতির কাল। তখন অলিতে-গলিতে আমরা কন্ধকাটাকে দেখতে পাই, আর তার কুৎসিত কল্পনাটাকেই একান্ত ক'রে তুলি।

বস্তুত সাহিত্যের সায়াহ্নে কল্পনা ক্লান্ত হয়ে আসে ব'লেই তাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসে; কেননা, যা-কিছু সহজ তাতে তার আর সানায় না। যে-অক্লিষ্ট শক্তি থাকলে আনন্দসম্ভোগ স্বভাবতই সম্ভবপর সেই শক্তির ক্ষীণতায় উত্তেজনার প্রয়োজন ঘটে।

তখন মাত্‌লামিকেই পৌরুষ ব'লে মনে হয়। প্রকৃতিস্থকেই মাতাল অবজ্ঞা করে; তার সংযমকে হয় মনে করে ভান, নয় মনে করে দুর্বলতা।

বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালাটি। যখনি সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি— এতে মাঝিগিরির দরকার নেই— এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্‌। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি, এ কথা মানতেই হয়। কিন্তু, তা নিয়ে শঙ্কা না ক'রে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনি বুঝি, সর্বনাশ হল ব'লে।

য়ুরোপের সাহিত্যে চিত্রকলায় এই-যে বিহ্বলতা ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে বীভৎস হয়ে উঠছে এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে, যেমন ক'রে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে। আমার ভয়, দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে।

ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্র-মানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি প'রে বা যে কোনো উগ্রসাজেই হোক তবে আমাদের দেশের ইস্কুল-মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। শাশুড়ির শাসনে যার চামড়া শক্ত হয়েছে সেই বউ শাশুড়ি হয়ে উঠে নিজের বধূর 'পরে শাসন জারি ক'রে যেমন আনন্দ পান, এঁরাও তেমনি স্বদেশের যে-সব নিরীহ মানুষকে নিজেদের স্কুলবয় ব'লে ভাবতে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপরওয়ালা রাশিয়ান হেড্‌মাস্টারদের কড়া বিধান জারি ক'রে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন। সেই হেড্‌মাস্টারের গদ্‌গদ ভাষার অর্থ

কী ও তার কারণ কী, সে কথা বিচার করবার অভ্যাস নেই, কেননা সেই হল আধুনিক কালের আপ্তবাক্য।

আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।

কিন্তু, শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নিচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধিবুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।

অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে; যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ' এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের মতো হয়ে উঠছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র-নারায়ণের' ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি; ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন; দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই

ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।

সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু, ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ, ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এই জন্যেই, পাঠকসমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি, তা হলে এজন্যে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না—সাহস দেখিয়ে বাহাদুরি করবার নেশা যাদের লাগবে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে। সাহসটা সমাজেই কী, সাহিত্যেই কী, ভালো জিনিস। কিন্তু, সাহসের মধ্যেও শ্রেণীবিচার, মূল্যবিচার আছে। কোনো-কিছুকে কেয়ার করি নে ব'লেই যে সাহস, তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে একটা-কিছুকে কেয়ার করি ব'লেই যে সাহস। মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে সব সংস্কার জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরোনো, প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে-না ছুঁতেই তারা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে ওঠে। মেঘনাদবধের নরকবর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষ্যে মাইকেল এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন ক'রে উদ্‌গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে—এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন করে না, কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে জায়গা পাবে না, এ কথা বলব না। কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয় তা হলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।

তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই; তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু, কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো

সমান দামের হয়ে ওঠে। কেননা, অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা— খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এইজন্যে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলোন হলে মাকাল দিতে পারি নে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতুম এবং দিয়ে যদি বাহাবা পাওয়া যেত, তাহলে সস্তায় ব্রাহ্মণভোজন করানো যেত, কিন্তু পুণ্য খতিয়ে দেখবার বেলায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয় পাতঞ্জলদর্শনের মতে হিসাব করতেন না। পুণ্যলাভ করতে শক্তির দরকার। সাহিত্যেও একটা পুণ্যের খাতা খোলা আছে।

ভালোরকম বিদ্যাশিক্ষার জন্যে মানুষকে নিয়ত যে-প্রয়াস করতে হয় সেটাতে মস্তিষ্কের ও চরিত্রের শক্তি চাই। সমাজে এই বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ একটা আদর আছে ব'লেই সাধারণত এত ছাত্র এতটা শক্তি জাগিয়ে রাখে। সেই সমাজই যদি কোনো কারণে কোনো একদিন ব'লে বসে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করাটাই আদরণীয়, তা হলে অধিকাংশ ছাত্র অতি সহজেই সাহস প্রকাশ করবার অহংকার করতে পারে। এই রকম সস্তা বীরত্ব করবার উপলক্ষ্য সাধারণ লোককে দিলে তাদের কর্তব্যবুদ্ধিকে দুর্বল করাই হয়। বীর্যসাধ্য সাধনা বহুকাল বহু লোকেই অবলম্বন করেছে ব'লে তাকে সামান্য ও সেকেলে ব'লে উপেক্ষা করবার স্পর্ধা একবার প্রশ্রয় পেলে অতি সহজেই তা সংক্রামিত হতে পারে— বিশেষভাবে, যারা শক্তিহীন তাদেরই মধ্যে। সাহিত্যে এইরকম কৃত্রিম দুঃসাহসের হাওয়া যদি ওঠে তা হলে বিস্তর অপটু লেখকের লেখনী মুখর হয়ে উঠবে, এই আমাদের আশঙ্কা।

আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই-সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানি নে'— এটা তরুণের ধর্ম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে; সেই শক্তির অহংকার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে; সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু, যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সব-চেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি

তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।

প্রান্‌সিউজ জাহাজ
২৩ আগস্ট, ১৯২৭

সাহিত্যবিচার

সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই; স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ-বা সুস্পষ্ট, কেউ-বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে-মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়; বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি; জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুর জিনিস, ভাবের জিনিস, সমস্তই ব্যক্তি— নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হল তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ— সেই গুণটিই সাহিত্যরচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে, অসংখ্য জিনিসকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই নে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিস্পৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি, যাদের প্রতি তারা কর্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে। সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্তমান অবস্থার বাইরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু, সাহিত্যরচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত করে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী বলে নয়, মানী বলে নয়, জ্ঞানী বলে নয়, সৎ বলে নয়, সত্ত্ব রজ বা তমোগুণান্বিত বলে নয়,

তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পেরেছে বলেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এইজন্যেই সাহিত্যবিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের দুরূহ কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না; বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়োলোক বলি যার বড়ো পদ, বড়োমানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর; যূথীজাতি-মল্লিকামালতীবিকশিত বসন্তঋতু; তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন; তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারি নে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য-রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।

সেইজন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।

সাহিত্যে ভালো-লাগা মন্দ-লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু, ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে; এর উপরে আর-কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে। এই কারণে জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্যরচয়িতা। মৃদুস্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে ছাপার অক্ষরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই; নিজের অনিবার্য কর্মফলের উপরে জোর খাটে না।

রুচির মার যখন খাই তখন চুপ ক'রে সহ্য করাই ভালো; কেননা সাহিত্যরচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দিষ্ট স্থান। কিন্তু, বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি, এ যে মারের উপরি-পাওনা। বাংলাসাহিত্যের অন্তঃপুরে শ্রেণীর যাচনদার বাহির হতে ঢুকে পড়েছে; কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউলকবি দুঃখ

ক'রে বলেছে, ফুলের বনে জহুরী ঢুকেছে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায় ফুলকে দেয় লজ্জা।

আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর-সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়েই অতি অযোগ্য মানুষও ঘরে ঘরে বরমাল্য লুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা সপ্রমাণ হয় না। লোকটা কুলীন কিনা কুলপঞ্জিকা দেখলেই সকলেই সেটা বলতে পারে, অথচ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ণয় করতে যে সমজদারের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে মেলা ভার। এইজন্যে সমাজে সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মানুষকে বিভক্ত করে; জাতিকুলের মর্যাদা দেওয়া, ধনের মর্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্যব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পংক্তির নিচে পড়ে। কিন্তু, সাহিত্যে জগন্নাথের ক্ষেত্র; এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চলবে না। এমন-কি, এখানে বর্ণসংকর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না; তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দিরপ্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সংকোচ করে না। হয়তো ব'লে বসে, এ লেখাটার চাল কিম্বা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে যবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল-বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডারা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে; কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিত্বটি দেখো, যদি রূপব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তা হলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল। মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারি দিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়— তাতে চিত্তের নির্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভৎর্সনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েছে। সে মরু থাক্ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের

বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে, দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক।

এটা অন্ধ অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, 'কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।' অবস্থাবৈগুণ্যে এরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক— ওটা হল খণ্ডিতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু, যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হল য়ুরোপীয়ত্ব— এই ব'লে সাহিত্যে খানাতল্লাশি করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজসিকতার প্রমাণ বের ক'রে কাব্যের উপরে একঘরে করবার দাগা দয়ে দেন, কাউকে জাতে রাখেন, কাউকে জাতে ঠেলেন, তখন একেবারে হতাশ হতে হয়।

এক সময়ে ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব এশিয়া তার নিকট-সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এশিয়ায় এনেছিল নবজাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্তী এসিয়ার কোনো অংশ যেন কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়। কারণ, যে-কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে-কোনো লোক যদি যথার্থভাবে আপন ক'রে স্বীকার করতে পারে তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণশক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারি দিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। সেই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু, সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়— তাকে স্বকীয় ক'রে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই গোলেবকাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত; যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি,

সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরও একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষ্যে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেছেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম ক'রে দলপতিদের চাটূক্তির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কিনা এই সাহিত্যসংগত প্রশ্নটা কারও কারও লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কুমু মানবসমাজে নারী-নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কিনা—অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কিনা। মানবপ্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের। অবশ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য, নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামি। বস্তুত, সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় তো সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু ব'লেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি ব'লে নয়।

কথা উঠেছে, সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আলোচ্য এই— কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান-অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয়; কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত, অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম

ক্রোধ অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন ক'রে দেখলে যে বস্তুপরিচয় পাওয়া যায় সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্ব দ্বারা নয়, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কামপ্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ। যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জনের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে-পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে বলতে হবে যে, সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক, আম। যে-ভাবে সেটা ভোগ্য সে-ভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফ্‌রান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে; কিন্তু সেটা জড় পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রসবিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বলতে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাত্ত্বিকতায় প্রমাণ হয়; আর র‍্যাস্‌পবেরি গুস্‌বেরি বিলাতি, কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়, পরের তুষ্টির চেয়ে ওরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক। এই কথাটা দেশাত্মবোধের

অনুকূল কথা হতে পারে; কিন্তু, এইরকমের অমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসংগত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই— সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

১৩৩৬

আধুনিক কাব্য

মডার্‌ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্‌নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্‌ন্‌স্‌ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ কোল্‌রিজ শেলি কীট্‌স্‌।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে— রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটাতিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্‌ন্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে-যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। 'কুমুদকহ্লারসেবিত সরোবর' হচ্ছে সাধু-কারখানায় তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে, বুলি সরিয়ে, পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন

ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে, 'ধিক্।'

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে-তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে-আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্‌সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে-অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে-আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরুপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্যসংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের জন্য ব্যাঙ্কে-জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না; চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা; নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা; তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে-সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়,

তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ড্স্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্স্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়; সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয়; সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।

কিন্তু, আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্যভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়; কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায় মোহ জিনিসটাতে আর-কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ; সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু, বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে। ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল; লজ্জার যে-আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে; ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সংকোচ লাগে। এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই। সৃষ্টিতে যে-আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না।

কিন্তু, আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই

মানুষের হু হু ক'রে কাজ, হুড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে-মানুষ একদিন রয়ে-বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, 'মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ।' জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিক মতো কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে-ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব-চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন : I am the greatest laugher of all। বলছেন, 'আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, এ্যাপলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apollo এটা হল ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে ক'রে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হত সমুদ্র, তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি ক'রে বলতে পারত, ওটা দস্তুরমতো কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো ছাঁদের দস্তুরমতো কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু, কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার

দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ এ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন-কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্ হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে, প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু, অতিবড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে-হাসি সূর্যের, যে-হাসি ওক্‌বনস্পতির, যে-হাসি এ্যাপলোর, সে-হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে; সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' বললে প্রায় বারো আনা অত্যুক্তি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা ক'রে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না—

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো—
তোমার ঐ মিলে মিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝক্‌মকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে

বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেককালের যে-মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়। তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, 'অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো।' ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাঁচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটিজুতোর মালা— like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু, দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'মানে কী হল, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, নাহয় হলই বা তার রঙ লাল।' উত্তরে বলতে হয়, 'চেয়েই দেখো-না'। 'দেখে লাভ কী' তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে, সে থাকতে পারল না; বলে উঠল, "দেখ্‌ চেয়ে রে, কী সুন্দর।' এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, 'স্থির হয়ে বোস্‌।' তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, 'কী সুন্দর।' কবি বল্‌ছেন, 'শুনে I was mildly abashed।'

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও; একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক—নিছক দেখা; এর পঙ্‌ক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ, এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর; কেউ কাজের, কেউ অকাজের; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই-রকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর-কোনো জবাবদিহি নেই; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখছেন—

এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা—

ধোঁয়াটে দিন পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা সার্শি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধ-ওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই—

His soul stretched tight across the skies
That fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock ;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল। বললেন—

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling ;

The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিঁকল না। এইখানে কূপমণ্ডূকের মক্‌মক্ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া—

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি না'ও ফোটে, তা হলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে— এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোমান্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে, নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে, অনাবৃত আকাশে, পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্নরকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে; কেউ বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে-আকৃতি তারও

অন্তরে কেউ-বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে ; মনে করে না, গূঢ় ব'লে কিছুই নেই ; মনে করে না, যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত-কিছু আদব ও আব্রু তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল ; দীর্ঘকাল যে-সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল ; মানুষ যে-সকল শোভন রীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে, অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল ; বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু, আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না, ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু, এ'কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক ; তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন—

> এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
> প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।
> যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—

সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচগাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।

আর একটা ছবি—

নীল জল···নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল ;
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর একটা—

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইনগাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার 'পরে।

একটি বধূর কথা—

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।
চাঙ্কানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট ক'রে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভ্রূকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম।···
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।

আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙফেঙ্‌শার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার 'পরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। স্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা আধুনিক হত। কেননা, সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব, আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুকনো চিংড়িমাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে। এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুট্‌কি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী হল।' একেলে কবি উত্তর করত, 'এমনতরো হয়েই থাকে।' 'অন্যটাও তো হয়।' 'হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকালে কাব্যের বাবুগিরি ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে-বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে; বলে, আসল জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা, সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল, সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো-খান্‌সামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো-ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু, তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্‌ট্ এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে, নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারও এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই ক'রে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে ; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না— প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব-সাধনা ব'লে বাহাদুরি করতে হবে।

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন—

> রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন
> পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
> ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত,
> ছিপছিপে যেন রাজপুত্র।
> সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা—
> কিন্তু যখন বলতেন 'গুড্‌মর্নিং', আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।
> চলতেন যখন ঝলমল করত।

ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত মনে হত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে—
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে,
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।[১]

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু, এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নিচে গলিত দেহকে কেমন ক'রে পোকায় খাচ্ছে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-রসরক্তের কদর্য সমাবেশ, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়, এইরকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু, এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া— এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়,

১ মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জমা করতে হল, কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে।

গাঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো যত-কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ ক'রে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক'রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত ক'রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্যে-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি আতভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ কর তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয় অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বল আর আর্টেই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

১৩৩৯

সাহিত্যতত্ত্ব

আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি নে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি, এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিসের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারি নে, যাতে আমার ঔৎসুক্য অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে, সে যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশি— তা সে হোক-না ঘুড়ি-ওড়ানো, হোক-না লাটিম-ঘোরানো। কেননা, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র ক'রে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এঁকেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে-এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়; উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর-কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-হওয়ার কাছাকাছি আসে। 'আমি আছি' এবং 'না-আমি আছে' এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে; অন্তর-বাহিরের এই সম্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত ক'রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু, এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক, এ আলোচনাটা আপাতত থাক্, পরে হবে।

আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেইজন্যে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সংকীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ— সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা, যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাবমোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে; সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে 'চাই-চাই'য়ের হাট বসে গেছে, এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে 'চাই নে', অর্থাৎ এমন কিছু চাই নে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত ক'রে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে-রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত ক'রে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানি নে।

লোকে বলে, সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে-কথা বিচার ক'রে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্যরহস্যকে বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্ট্‌স্‌কে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার-আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি, বোঁটা; তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই-সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই-সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্‌বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তিপুরুষ। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে, বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে; সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত ক'রে অখণ্ড এক।

উচ্চ-অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে-একটি গভীর সৌষম্য, যে-একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু

জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির ; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ, জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি। এ কেন কাব্যসাহিত্যের বিষয় হয় নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয় নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ, এ সর্বসাধারণের অগোচর। যে-ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক, বহু লোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠে নি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে-ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অন্তর্নিহিত সুঘটিত সুসংগতিকে অবলম্বন ক'রে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর। যে-মানুষ তাকে, যান্ত্রিক জ্ঞানের দ্বারা নয়, অনুভূতির দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অনুরাগে আপন ব্যক্তিপুরুষকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন-তত্ত্ব এ জাতের নয়। এ-সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু, সে আনন্দটি হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ার আনন্দ ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্দর-মহলের জিনিস নয়, ভাণ্ডারের জিনিস।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলেছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে ; কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ। সে আপন অনুভূতির জন্যে অবকাশ রচনা করছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিত্য প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাত্ম্য তাকে কাঁধে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে

তাহলে ঘড়া হয় আমাদের অনাত্মীয়। মানুষ তাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলল। জল বহনের জন্য সৌন্দর্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু, এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারি দিকে ফাঁকা এনে দিল। যে-ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিসকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয়, শিল্পকলার সাহায্যে বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ ক'রে আছে।

কিন্তু, বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কাকে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা, বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেস্তা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে-মানুষ সুন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহায় ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চার দিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিশ্বাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্বচনীয়। সেই প্রাণশিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে, রঙ নিয়ে, তাপ নিয়ে, চলমান চিত্রে বার-বার ভরে দিচ্ছে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি; এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না; যার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্যামলতা, তার হিল্লোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য— যে-সৃষ্টিতে জানা নয়, পাওয়া নয়, কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি, অনুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি; আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই-সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিরুচি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ

করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষ্যে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায়ে প্রস্তুত তখনও সেই হিংস্রতার অনুভূতিকে ব্যবহারের উর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হয়তো সেটা তার সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয়, বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অনুভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালোবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরোয় সাগরসংগমে পর্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয়; লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে নবদূর্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জন করতে সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্‌বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে ক'রে দিতেও সংকোচ নেই। কেননা, সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, 'আমি ধনী' এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মতো ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গি সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয়; কিন্তু, যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্যন্ত সম্ভব, কেননা এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচা করি বিবেচনাপূর্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি তখন তহবিলের সসীমতা সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করিনে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যুক্তি আর-কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল। 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' বস্তুজগতে এ কথাটা অতথ্য, কিন্তু ব্যক্তিজগতে তথ্যের খাতিরে এর চেয়ে কম করে যা বলতে যাই তা সত্যে পৌঁছয় না।

বিশ্বসৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু, সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে; তার হিসাবের আদর্শ নেই, পরিমাণ নেই।

ঊর্ধ্ব-আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য, কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে 'ধূমজোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অকারণ অত্যুক্তি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্বচনীয়তায় পরিণত করে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এইজন্যে সে যখন বলে 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে', তখন তাকে পাগলামি ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি নে। এইজন্য সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেননা আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক ক'রে বলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে, ভাষার ভঙ্গিতে, ছন্দের ইশারায় এমন-কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায়, যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তি-পুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তর ছিল বৈষয়িকতার দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার; প্রবল উদ্‌বেগ, প্রবল উদ্যম ছিল তাদের বেষ্টন ক'রে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না, সৌজন্যের অত্যুক্তি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে— যেমন ক'রে আমরা সম্ভ্রমবোধের পরিতৃপ্তি সাধন করি রাজচক্রবর্তীর নামের আদিতে পাঁচটা শ্রী যোগ ক'রে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিম্নভূমির সমতলক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে-পরিচয় চিরকালের

দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের রেখায়, শব্দের ভাষায় তারই সম্বর্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক, সাময়িক, বর্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায় নি, যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্নারাতে ভেসে-যাওয়া নৌকোর সেই সারিগান—

মাঝি, তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখির সেই গান, যে-গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে—

Listen Eugenia,
How thick the burst comes crowding through the leaves.
Again— thou hearest ?
Eternal passion !
Eternal pain !

পূর্বেই বলেছি, রসমাত্রেই অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে, যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ। দুঃখকে, ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহার্য মনে করি তার কারণ, তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ন হলে সেটা দুঃসহ হয়। এইজন্যে দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয়, প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে। কোনো দুর্লভ ধন অর্জন করবার জন্যে নয়, ভয়-বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্যে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়; কীট পতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না; তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধারূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হলেই দেখা যায়, হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহৈতুক আনন্দ নিন্দুকদের;

নিজের কোনো বিশেষ ক্ষতির উত্তেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে, তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করে নি, তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলে-বলে নিন্দাসাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য, কিন্তু তীব্র তার আস্বাদন। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এইহেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়, কেন মহিষের মতো অত বড়ো প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, এ কথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে ; ভিড় জমছে কত ; আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

এত কাল আমি রেখেছিনু তারে যতনভরে
শয়ন-'পরে ;
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন কুসুমথরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে

যতনভরে।
শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশবশে।
তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে ঝুলন-খেলা
নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন—

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন-কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে 'আমি আছি'। বিরহের শূন্যতায় যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি, 'অয়মহং ভোঃ।' এই-যে আমি আছি। সে বাণী পৌঁছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না, 'এই যে আমিও আছি।' দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে। সংসারে

'আমি আছি' এই বাণী যদি স্পষ্ট থাকে তা হলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত উত্তর মেলে, 'আমি আছি।' 'আমি আছি' এই বাণী প্রবল সুরে ধ্বনিত হয় কিসে। এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ। আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কেননা, আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেদ্যং পুরুষং ; তা হলে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে, আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার 'কৃষ্টি'র ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।

ক্লাসঘরের দেয়ালে মাধব আর-এক ছেলের নামে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছে 'রাখালটা বাঁদর'। খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্য-সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড়ো হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি-অনুসারে আপন রাগের অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়ো করে জানাচ্ছে, মাধব রাগ করেছে ; যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতি-কবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে যে অপরিণত পঙ্গু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমার বেশি তার কলমে আর এগোল না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুছবে না যতই চুনকাম করা যাক। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ করে দিতে পারেন, শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই

ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সাক্ষ্য দেবে, সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ুদত্তও বাঁদর বই-কি। কবিকঙ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু, এই বাঁদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষগোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোনো মানবচরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো অমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহৈতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাক্‌বেথ, হিড়িম্বা বা শূর্পনখা, নারী, 'মায়ের জাত', এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয়; কেবল এই জবাবটা পেলেই হল, যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো-এক খেয়ালে সৃষ্টিকর্তা জিরাফ জন্তুটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক বলতে পারে, এর গলাটা না গোরুর মতো, না হরিণের মতো, বাঘ ভালুকের মতো তো নয়ই, এর পশ্চাদ্‌ভাগের ঢালু ভঙ্গিটা সাধারণ চতুষ্পদ-সমাজে চলতি নেই, অতএব, ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তুটা জীবসৃষ্টিপর্যায়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ। ও বলছে 'আমি আছি'; 'না থাকাই উচিত ছিল' বলাটা টিঁকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ত। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল; সেই সৃষ্টিতে উট জন্তুটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখিরও হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য জবাবদিহি নেই।

মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যুক্তিসংগত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যাবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity।

ওপারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌,
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে—
গুণবতী ভাই, আমার মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু, ছন্দের দোল খেয়ে এ যেন একটা স্পর্শযোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের ভুল থাকা সত্ত্বেও।

ডালিমগাছে পর্‌ভু নাচে,
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।

শুনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিস, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ; সে আছে, সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো'; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপ-কথাই সে বটে; তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ত নেই। সে কোনো-একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে; সে বাস্তব। গল্প শুরু করা গেল—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নজরে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।
ঢেঁকিশালে মাসি ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, 'চাই গ্লিসেরিন সোপ!'

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত ক'রে হাঁ ক'রে শোনে। আমি বলি, 'আজ এই পর্যন্ত।' সে অস্থির হয়ে বলে, 'না, বলো, তারপরে।' সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরই 'পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবি গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীবৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা খ্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অনুভব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠছে। এ'কেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রসসাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি।

সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়; তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ। এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন-কি, সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয়তো গভীরতর। ঠুংরির টপ্পা শোনাবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্‌বুদ্ধ করে। 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' মধুর হতে পারে, কিন্তু 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' মনোহর। একটা কানের, আর-একটা মনের; একটাতে চরিত্র নেই, লালিত্য আছে, আর-একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার করে।

যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্যে তাকে অসামান্য হতে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির ক'রে দেয়, তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু, আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই সাহিত্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সন্তানস্নেহে কর্তব্যবিস্মৃত মানুষ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু, রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা সূক্ষ্ম স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়; এই মানুষের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টিমন্ত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্যসদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন্ সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অন্ত পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণশ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে; তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মানুষমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আস্তরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি সুনিশ্চিত, আমি বিশেষ; অন্য কেউ যখন তার বিশিষ্টতা নিয়ে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্যায়ে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই, এবং তার অনুবর্তী যে-বাহন সেও। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিপুরুষের সম্যক্ অনুভূতির বাইরে।

পূর্বে অন্যত্র এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান সে-পদার্থ সাধারণশ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায় প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য ব'লে একটা সাধারণ ভাবে। চালতা-ফুল এখনও কাব্যের দ্বারের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। জামরুলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্যায়ের খাদ্য ফলেরই পূর্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হত তা হলে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগি পাখির সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত, সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অন্য-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত ক'রে দেখে।

যাঁরা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হলেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল, তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের জল তোলা হয় নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় ছিলি।' সে বললে, 'আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে।' ব'লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ ক'রে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল; সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাস্‌পোর্ট আছে; সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু, এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব। সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য; সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না, অসুন্দরও না। কিন্তু, সেদিন করুণ-রসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল; প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধুম পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অভূতপূর্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদবীথিকায় উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক, তবু এই বহুব্যয়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে 'মেয়ের বিয়ে' নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু, 'কন্যার বিবাহ' নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আশুম্লানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে দীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন, তা হলে প্রতিদিনের হাজার-লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ ক'রে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমারসম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাংকোপাঞ্জা ডন্‌কুইক্‌-সোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না— তখন হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ-শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। ডন্‌কুইক্‌সোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এপর্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ। বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অস্তলাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিসাবে সে একটা মস্ত তথ্য; কিন্তু যুদ্ধে-পঙ্গু একটি-মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত তাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্ত্রণা-ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি, যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্‌বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে-সমস্তের আজ চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য, এবং আরও কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ-নামক একটিমাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন-নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ-নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা

আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে; কারণ, সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে— সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম-শব্দের মোহযবনিকার অন্তরালে যে-সকল নিদারুণ ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। ইস্কুলে ক্লাস-নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে; সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারণতার আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন-নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ-বিদ্যার পেষণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মতো শুকোতে থাকে, আমরা থাকি উদাসীন। গবর্মেন্টের আমলাতন্ত্র নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে; সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়সম্পর্কহীন নামের নিচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিত্তের এই-সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকাক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে। রূপে সেই-সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব; এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থাকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত— আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে; আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম ক'রে; তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে-সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না; তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত যে-রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই-সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই-সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে, সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তায়।

১৩৪০

সাহিত্যের তাৎপর্য

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায়, ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে

হতে তা লুপ্ত হয়ে যায় ; ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদবহনে তার সমাপ্তি। আর-একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই মতো ; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য।

ভাষার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্ছি, তা ছাড়া জানাচ্ছি ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগছে, মন্দ লাগছে, রাগ করছি, ভালোবাসছি, এটা যথাস্থানে ব্যক্ত না ক'রে থাকতে পারি নে। মূক পশুপাখিরও আছে অপরিণত ভাষা ; তাতে কিছু আছে ধ্বনি, কিছু আছে ভঙ্গি ; এই ভাষায় তারা পরস্পরের কাছে কিছু খবরও জানায়, কিছু ভাবও জানায়। মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগসীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সন্ধান ও যুক্তির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে। হবা-মাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন ঘুচে গেল। যে জগৎটা 'আমি আছি' এইমাত্র ব'লে আপনাকে জানান দিয়েছে, মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে। বিশ্বজগতে মানুষের যে-যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনায়, সেইটেকে জ্ঞানের যোগে বিশেষভাবে অধিকার ক'রে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি।

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুশি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল ; তাতে সে আশু উদ্‌বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। তার আপন ভালোমন্দ-লাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্যজগৎ করে নিলে।

সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্ভাবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু, আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।

সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাকসবজির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ।

ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সব্‌জি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে-উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, মন তার সঙ্গে মিলতে চায়— সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়।

এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

ব্যাবসাদার গোলাপ-জলের কারখানা করে, শহরের হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্যমহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অহৈতুক মিলনে এই হিসাবের চিন্তাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপ-জলের কারখানাটা সাহিত্যের সামগ্রী হল না। হতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোটে চলেছি পদ্মায়। শরৎকালের সন্ধ্যা; সূর্য মেঘ-স্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বর্যের সর্বস্বদান পণ ক'রে সদ্য অস্ত গেছেন। আকাশের নীরবতা অনির্বচনীয় শান্তরসে কানায় কানায় পূর্ণ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই; শুব্ধ চিক্কণ জলের উপর সন্ধ্যাভ্রের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া ম্লান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেছে অন্য পারের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে; পাড়ির গায়ে শত শত গর্তে গাঙশালিকের বাসা; হঠাৎ একটা বড়ো মাছ জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে বঙ্কিম ভঙ্গিতে তখনই তলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই জলযবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্তেই তপসিমাঝি চাপা আক্ষেপের স্বরে সনিশ্বাসে বলে উঠল, 'ওঃ! মস্ত মাছটা।' মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্ছে রান্নার জন্যে, এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল; চার দিকের অন্য ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল স'রে। বলা যেতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে। আহারে তার আসক্তি তাকে আপন জঠরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু, তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া— নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে-মহিমান্বিত দিনাবসানকে সমস্ত

মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে— এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, যে-মানুষ সাহিত্যসংগীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ— মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।

আমি যে-টেবিলে বসে লিখছি তার এক ধারে এক পুষ্পপাত্রে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আর-একটাতে আছে ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা গন্ধরাজ। লেখবার কাজে এর প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনের আয়োজনে আমার একটা আত্মসম্মানের ঘোষণা আছে মাত্র। ঐটেতে আমার একটা কথা নীরবে রয়ে গেছে; সে এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন আমার চার দিকে আপন নীরন্ধ্র প্রাচীর তুলে আমাকে আটক করে নি। আমার মুক্ত স্বরূপ আপনাকে প্রমাণ করছে ঐ ফুলের পাত্রে। চৈতন্য যার বন্দী, বিশ্বের সঙ্গে যথার্থ সাহিত্যলাভের মাঝখানে তার বাধা আছে— তার রিপু, তার দুর্বলতা, তার কল্পনাদৃষ্টির অন্ধতা। আমি বন্দী নই, আমার দ্বার খোলা, তার প্রমাণ দেবে ঐ অনাবশ্যক ফুল; ওর সঙ্গে যোগ বিশ্বের সঙ্গে যোগেরই একটি মুক্ত বাতায়ন। ওকে চেয়েছি সেই অহৈতুক চাওয়ায় মানুষ যাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে। এই আপন নিষ্কাম সম্বন্ধটি স্বীকার করবার জন্যে মানুষের কত উদ্যোগ তার সংখ্যা নেই। এই কথাটাই ভালো করে প্রকাশ করবার জন্যে মানবসমাজে রয়েছে কত কবি, কত শিল্পী।

সদ্য-তৈরি নতুন মন্দির, চুনকাম-করা। তার চার দিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্যামল পরিবেষের সঙ্গে মিলছে না। সে আছে উদ্ধত হয়ে, স্বতন্ত্র হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাক্, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলুক। বর্ষার জলধারায় প্রকৃতি তার অভিষেক করুক, রৌদ্রের তাপে তার বালির বাঁধন কিছু কিছু খসতে থাক্, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে; তখন ধীরে ধীরে বন-প্রকৃতির রঙ লাগবে এর সর্বাঙ্গে, চারি দিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হতে থাকবে। বিষয়ী লোক আপনার চার দিকের সঙ্গে মেলে না, সে আপনাতে আপনি পৃথক; এমন-কি জ্ঞানী লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র; মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে

বিশ্বের দেহে আপন রঙ লাগায়, মানুষের রঙ। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু, মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে অর্থাৎ তার এসোশিয়েশনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নেই। প্রকৃতিকে আমাদের মানবভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগছে জাপান-বন্দরে। চেয়ে দেখলুম দেশটার দিকে— নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানি এসে দাঁড়ালো ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না; সে দেখলে যে-জাপানের গাছপালা নদী পর্বত যুগে যুগে মানবমনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে সেটা প্রকৃতির নয়, সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য ঘটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয়, তা মানবিক, সেইজন্যে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয়— তেমনি মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে, সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা, রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা ক'রে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখনই বিশ্বের যে-কোনো বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখনই সে আর যন্ত্রের দেখা থাকে না; ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথাতথ দেখা তার থেকে তার স্বতই প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চোখে দেখা খোকার পায়ে ছোট্টো লাল জুতোকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হল—

খোকা যাবে নায়ে,
লাল জুতুয়া পায়ে।

অভিধানের কোথাও এ শব্দ নেই। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দিভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছু বা বলে, কিছু বা গোপন করে; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলোট-পালোট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন 'দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়।' দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিস ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়। আগ্রহ যে পাখির মতন ধায় এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

গোধূলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন দ্বন্দ্ব প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন এ'কে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।

কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের গদ্য অনুবাদ দিচ্ছি, ইংরেজি তর্জমার থেকে: আপেল গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুরুঝুরু বইছে শরতের হাওয়া; থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে— ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো। এই-যে কম্পমান ডালপালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি, এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন ক'রে তুলে তবেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীনদেশীয় কবি বলছেন—

পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে;
সরোবর চলে গেছে শত মাইল,
কোথাও তার ঢেউ নেই;
বালি ধূ ধূ করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র;
শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার-বন;
নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার;

গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা ক'রে এসেছে—
হঠাৎ এরা একটি পথিকের মন থেকে
জুড়িয়ে দিল সব দুঃখবেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
চালিয়ে দিল তার লেখনীকে।

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিল নদী পর্বত সরোবর। সম্ভব হয় কী ক'রে। নদী-পর্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ আছে কিন্তু সান্ত্বনার মানসিক গুণ তো নেই। মানুষের আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সান্ত্বনা সৃষ্টি করে। যা বস্তুগত জিনিস তা মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের জিনিস হয়ে ওঠে। সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।

বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ, যে-শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ। যখন মানুষ বলে 'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' তখন বুঝতে হবে, যে-মানুষকে মন দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন ক'রে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয় নি—সেইজন্যে 'হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।' মন তাকে মনের ক'রে নিতে পারে নি ব'লেই বাইরে বাইরে ঘুরছে। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে আপন ক'রে নেয় তখনই তার ভাষায় শুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। নানা অবস্থার ঘাতে প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে মানবলোকে হৃদয়াবেগের ঢেউখেলা চলেছে। সমগ্র ক'রে, একান্ত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখার দুটি মস্ত ব্যাঘাত আছে। পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভ্ ভাবে; আমাদের সঙ্গে তাদের যে-ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে মানসিক কিছু নেই, এইজন্যে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আপন ভাবে ভাবিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু, মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের যে-সম্পর্ক

ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে-অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তা হলে তাকে আমরা মানবভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো ক'রে দেখতে পারি নে। নিত্যঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা অন্যায় ব্যাপার ব'লেই তাকে জানি, সে একটা পুলিস-কেস রূপেই আমাদের চোখে পড়ে— ঘৃণার সঙ্গে ধিক্কারের সঙ্গে প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জনার মধ্যে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খাণ্ডববন-দাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে— সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি ক'রেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন ক'রে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু, যদি খবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার ক'রে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

মানবঘটনাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখবার আর-একটি ব্যাঘাত আছে। সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনাগুলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাই নে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য হয়তো জেনেছি বা খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু, এই ঘটনাটি তার পূর্ব-বর্তী পরবর্তী দূর-শাখা-প্রশাখাবর্তী একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডিকে অধিকার ক'রে হয়তো রয়েছে— আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই— এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে পিতামাতার চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুকরো টুকরো ক'রে, মাঝখানে বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন; সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোন্‌গুলি সার্থক, কোন্‌গুলি নিরর্থক, তা আমরা বাছাই ক'রে নিতে পারি নে। এইজন্যে তার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র ক'রে দেখি তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটছিল সেদিন তাদের চরম অর্থ কেই বা দেখতে পেয়েছে; কার্লাইল তাদের বাছাই ক'রে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকায় যখন দেখালেন, তখন আমাদের মন এই-সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পেলে। খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে, অনেক অত্যুক্তি অনেক ঊনোক্তি হয়তো আছে এর মধ্যে; বিশুদ্ধ তথ্যবিচারের পক্ষে যে-সব দৃষ্টান্ত অত্যাবশ্যক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে।

কিন্তু, কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হতে বাধা পায় না; এইজন্যে ইতিহাসের দিক থেকে যদি বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

এই বর্তমানকালেই আমাদের দেশে চার দিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। ফৌজদারি শাসনতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুনছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আশুবিলীয়মান মর্মরধ্বনির মধ্যে। ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে, তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি; যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্য, সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা, সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠবে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে। তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট, আইনের বই, পুলিসের যষ্ঠি, সমস্ত হবে গৌণ; তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোটোবড়ো দ্বন্দ্ববিরোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ ক'রে নিত্যকালের মানবমনে বিরাটমূর্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে। সে একটা মানসজগৎ, বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে, বিচার ক'রে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। সে হল তথ্য-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশবৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প বলো'; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানবপরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষায় তার বিঘ্ন, এ-সমস্ত হৃদয়বোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে; এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্যে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্য-দানব, বস্তুত তারা মানুষ; ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি, তারাও তাই। এই-সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎ-রূপে দেখা দেয়; শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে। মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত ক'রে তাতে বাসা বাঁধে; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না।

মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে, সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে— তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে-শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য ক'রে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হল, রচিত হল মহাভারত। রামকে পেলুম ; সে তো একটি মাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে-সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্যমানুষ হয়ে ওঠেন। মন তাঁকে যেমন ক'রে স্বীকার করে প্রত্যক্ষ হাজার হাজার লোককে তেমন ক'রে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা-কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে ; আমাদের পাঁচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহু লোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে ; তারা আসে, তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা প'ড়ে তারা অগোচর হতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ ক'রে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে ; তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে। শেক্‌স্‌পীয়রের রচিত ফল্‌স্‌টাফ্ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস অছে, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ্ চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরি নয়, কল্পনার রসে জারিত ক'রে তার সৃষ্টি ; তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হতে পারে, সাবেক কালের কাব্য-নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত ; তাই তারা একই-জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরি। কিন্তু, আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে-চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণীবিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু ক'রে ব্যক্তিকেই যদিবা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হলে তাতে আর্টিস্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিস্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না।

এই সৃষ্টিতে যে-মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরি হত তা হলে তার মধ্যে অনেক বাহুল্য থাকত; সে বাস্তব যদি হত তবু সত্য হত না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক ব'লে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক-কিছু থাকত যা নিরর্থক, আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার ঐক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হত না। শতদল পদ্মে যে-ঐক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্তেই বলি সুন্দর, তা সহজ— তার সংকীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর দ্বন্দ্ব নেই, এমন-কিছু নেই যা অযথা; আমাদের হৃদয় তাকে অধিকার করতে পারে অনায়াসে, কোথাও বাধা পায় না। মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্য আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোনো একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তা হলে আর্টিস্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ, বাস্তবে যা আছে বাইরে তাকে পরিণত ক'রে তুলতে হবে মনের জিনিস ক'রে। আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর— সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমতো। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে; কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন ক'রে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে; সেই নৈকট্য ঘটায় ব'লেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে-বিশ্বে জন্মেছে, তাকে দুই দিক থেকে কেবলই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ জ্বালল আগুন নিজের হাতে; আকাশের আলো যেখানে অগোচর সেখানে সে বৈদ্যুতিক আলোককে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে; প্রকৃতি আপনি যে-ফলমূল-ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে; পর্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি—সে নিজের সুবিধা ও রুচি অনুসারে আপন বাসা আপনি নির্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অযাচিত পেয়েছিল। কিন্তু, সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায় নি; তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী ক'রে তুলছে— সেজন্যে তার কত কলবল, কত নির্মাণনৈপুণ্য। এখানকার জলে স্থলে আকাশে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত ক'রে দিচ্ছে। উপকরণ পাচ্ছে সেই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা ক'রে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে

দিচ্ছে। মানুষের নগরপল্লী, শস্যক্ষেত্র, উদ্যান, হাট-ঘাট, যাতায়াতের পথ, প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে; এমনি করে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্ব-জয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর-একটা পালা। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে এক দিকে তার জয়স্তম্ভ, আর-এক দিকে শিল্পে সাহিত্যে।

যে-দিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেই দিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যাবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি; অর্থাৎ তার চার দিকে যা-তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে, হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিস হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি। হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে; অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি; সেই উপলব্ধি করা, সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলছি, জ্যোৎস্নারাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে, মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার— দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গিতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি। সেই সঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন—পাখির বাসায় হঠাৎ পাখা ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝর্‌ঝরানি, অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠছে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেছে তারই দাঁড়ের ঝপ্‌ঝপ্, দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক। বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনো তারই মাঝে মাঝে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে জানা ফুলের পরিচয়। বহুপ্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ক'রে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির একটা স্বরূপ দেখতে পায় আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনা-দৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে সমগ্র ক'রে দেখার জ্যোৎস্নারাত্রি মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিস। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার, মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপ-ফুল অসামান্য; সে আপন সৌন্দর্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু, যা সামান্য, যা অসুন্দর, তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্যদৃষ্টিতে বিশিষ্ট ক'রে দেখাতে পারে; বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে। জঙ্গলে-আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্‌দি বুড়ি

বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ ক'রে আপন ঝুড়িতে তুলছে, আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি ক'রে বিরক্ত করছে— এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, এ'কে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক ক'রে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি, তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে।

বস্তুত, আর্টিস্ট্‌রা বিশেষ আনন্দ পায় এইরকম সৃষ্টিতেই। যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না। যা আপনিই ডাক দেয় না তার মুখে সে আমন্ত্রণ জাগিয়ে তোলে; বিধাতার হাতের পাস্‌পোর্ট্‌ নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় মনোলোকে। অনেক সময় বড়ো আর্টিস্ট্‌ অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে। মানুষ বস্তুজগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার ক'রে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অনুগত একটি ব্যাবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেছে। তেমনি মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য। ব্যাবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজনসাধনে এর মূল্য নয়; এর মূল্য আত্মীয়তাসাধনে, সাহিত্যসাধনে।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক্‌। সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে; সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হল।

কল্পনা করা যাক্‌, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে সহসা জ্যোতি উঠল জেগে। এই জ্যোতির আছে অফুরান বেগ, আছে প্রকাশশক্তি। স্বতই প্রশ্ন উঠল, অনন্তের মধ্যে এই জ্যোতি নিয়ে কী করা যাবে। তারই উত্তরে জ্যোতিরাত্মক অণুপরমাণুর সংঘ নিত্য-অভিব্যক্ত বিচিত্র রূপ ধরে আকাশে আকাশে আবর্তিত হয়ে চলল— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহিমা সেই আদিজ্যোতিরই উপযুক্ত।

কবিঋষির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হল তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হল রামচরিত। অর্থাৎ, এমন-কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।

মানুষের নির্মাণশক্তি বলশালী, আশ্চর্য তার নৈপুণ্য। এই শক্তি নিয়ে, এই নৈপুণ্য নিয়ে, সে বড়ো বড়ো নগর নির্মাণ করেছে। এই নগরের মূর্ত যেন মানুষের গৌরব

করবার যোগ্য হয়, এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা ক'রে থাকতে পারে নি যাদের শক্তি আছে, যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, যারা সভ্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাকা-সত্ত্বেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায়— মুনফা করবার লোভ আছে, সস্তায় কাজ সারবার কৃপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য আছে, অশিক্ষিত বিকৃতিরুচি বর্বরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে; তাই নির্লজ্জ নির্মমতায় কুৎসিত পাটকল উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাতীরের পবিত্র শ্যামলতাকে পদদলিত ক'রে, তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে নানাজাতীয় দুর্দৃশ্য বস্তিপাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন কলুষিত আশ্রয়ে, যেমন-তেমন কদর্যভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি তেলকল নোংরা-দোকান গলিঘুঁজি চোখের ও মনের পীড়া বিস্তারপূর্বক দেশে ও কালে আপন স্বত্বাধিকার পাকা করতে থাকে। কিন্তু, রিপুর প্রবলতা ও অক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে এই-সমস্ত ব্যত্যয়কে স্বীকার ক'রে তবুও মোটের উপরে এ কথা মানতে হবে যে, সমস্ত শহরটা শহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত যাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বলবে না, শহরের সত্য তার কদর্য বিকৃতিগুলো। কেননা, শহরের সঙ্গে শহরবাসীর অত্যন্ত নিকটের যোগ; সে যোগ স্থায়ী যোগ, সে-যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় যাতে তার আত্মাবমাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে সেখানে; কিন্তু, তবু সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে-সাহিত্যে সমগ্র ভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক; চিরকালের মানুষের মনে যে-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তা হলে লজ্জা পেতে হবে; কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো; তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।

শান্তিনিকেতন

১২. ৭. ৩৪

সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্যসাধনার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্মকাণ্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব করে দরবার জমানো, গ্রন্থাবলী সম্পাদন করা, সংবাদপত্র পরিচালনা করা, এগুলি হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই মার্গের যাঁরা পথিক তাঁরা জানেন কেমন করে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যসংসারের কাজ চালাতে হয়। তার পরের মার্গ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, যেমন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা। এর দ্বারাও সাহিত্যিক সভা জমিয়ে তুলে কীর্তিখ্যাতি হাততালি লাভ করা যায়।

আমি শিশুকাল থেকেই এই উভয় মার্গ থেকে ভ্রষ্ট। এখন বাকি রইল আর-এক মার্গ, সেটি হচ্ছে রসমার্গ। এই মার্গ অবলম্বন করে রসসাহিত্যের আলোচনা, আমি পারি বা না পারি, করে যে এসেছি সে কথা আর গোপন রইল না। বহুকাল পূর্বে নির্জনে বিরলপথে এই রসাভিসারে বার হয়েছিলুম, দূরে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে। কিন্তু, এই অভিসারপথ যে নিকটের লোকনিন্দা ও লাঞ্ছনার দ্বারা দুর্গম, তা যাঁরা রসচর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন।

ঘরের সীমা হতে, প্রয়োজনের শাসন থেকে, অনেক দূরে বের করে নিয়ে যায় যে-তান সেই তান কানে এসে পৌঁচেছিল, তাই নিকটের বাধা সত্ত্বেও বাহির হতে হয়েছিল। তাই আজ এত বয়স পর্যন্ত বংশীধ্বনি ও গঞ্জনা দুই-ই শুনে এসেছি। যে-পথে চলে-ছিলাম তা হাট-ঘাটের পথ নয়। তাই আমি নিয়মের রাজ্যের ব্যবস্থা ভালো বুঝি নে। রসমার্গের পথিককে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে হয়, সেই কু-অভ্যাসটি আমার অস্থিমজ্জাগত। তাই নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারি নে।

তবে কেন সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি হওয়া। এর প্রথম কারণ হচ্ছে যে, যিনি[১] আমাকে এই পদে আহ্বান করেন তিনি আমার সম্মানার্হ, তাঁর নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালির আহ্বান যখন আমার কাছে পৌঁছল, তখন আমি সে আমন্ত্রণ নাড়ীর টানে অস্বীকার করতে পারি নি। এই ডাক শুনে আমার মন কী বলেছিল, আজকার অভিভাষণে সেই কথাটাই সবিস্তারে জানাব।

আজ যেমন বসন্ত-উৎসবের দিনে দক্ষিণসমীরণের অভ্যর্থনায় বিশ্বপ্রকৃতি পুলকিত

১ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি

হয়ে উঠেছে, ধরণীর বক্ষে নবকিশলয়ের উৎস উৎসারিত হয়েছে, আজকার সাহিত্য-সম্মিলনের উৎসবে তেমনি একটি বসন্তেরই ডাক আছে। এ ডাক আজকের ডাক নয়।

কত কাল হল একদা একটি প্রাণসমীরণের হিল্লোল বঙ্গদেশের চিত্তের উপর দিয়ে বয়ে গেল, আর দেখতে দেখতে সাহিত্যের মুদ্রিত দলগুলি বাধাবন্ধ বিদীর্ণ করে বিকশিত হয়ে উঠল। বাধাও ছিল বিস্তর। ইংরাজিসাহিত্যের রসমত্ততায় নূতন মাতাল ইংরাজি-শিক্ষিত ছাত্রেরা সেদিন বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। আবার সংস্কৃতসাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু, বহুকালের উপেক্ষিত ভিখারি মেয়ে যেমন বাহিরের সমস্ত অকিঞ্চনতা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন নিজের অন্তর হতে উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে আপন আসন অধিকার করে, অনাদৃত বাংলাভাষা তেমনি করে একদিন সহসা কোন্ ভাবাবেগের ঔৎসুক্যে আপন বহুদিনের দীনতার কূল ছাপিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠল। তার সেদিনকার সেই দৈন্যবিজয়ী ভাবযৌবনের স্বরূপটিকেই আজকার নিমন্ত্রণপত্র আমার স্মৃতিমন্দিরে বহন করে এনেছে।

মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু, প্রকাশ তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে অন্য-সকলের সত্য সম্বন্ধে। ঐক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সত্যতা নিয়েই, কি ব্যক্তিবিশেষের কি সমূহবিশেষের যথার্থ পরিচয়। এই ঐক্যকে ব্যাপক ক'রে, গভীর ক'রে পেলেই আমাদের সার্থকতা।

ভূবিবরণের অর্থগত যে-বাংলা তার মধ্যে কোনো গভীর ঐক্যকে পাই না, কেননা বাংলাদেশ কেবল মৃণ্ময় পদার্থ নয়, তা চিন্ময়ও বটে। তা যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতিতে আছে তা নয়, তার চেয়ে সত্যরূপে আমাদের চিৎলোকে আছে। মনে রাখতে হবে যে, অনেক পশুপক্ষীও বাংলার মাটিতে জন্মেছে। অথচ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয় বলেই বাঙালিকে ভক্ষণ করতে তার যেমন আনন্দ তেমন আর কিছুতে নয়। কোনো সাধারণ ভূখণ্ডে জন্মলাভ নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়েই কোনো মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

তার পর মানুষ জাতিগত ঐক্যের মধ্য দিয়েও আপন পরিচয়কে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। যে সব মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের যোগে এমন একটি রাজতন্ত্র রচনা করে যার দ্বারা পররাজ্যের সঙ্গে স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে, এবং সেই স্বরাজ্যসীমার শাসন ও পরস্পর সহকারিতার দ্বারা নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থকে নিয়মে

বিধৃত ও বিস্তীর্ণ করতে পারে, তারাই হল এক নেশন। তাদের মধ্যে অন্য যতরকম ভেদ থাক্ তাতে কিছুই আসে যায় না। বাঙালিকে নেশন বলা যায় না, কেননা বাঙালি এখনো আপন রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে নি। অপর দিকে সামাজিক ধর্ম-সম্প্রদায়-গত ঐক্যের মধ্যেও বিশেষ দেশের অধিবাসী আত্মপরিচয় দিতে পারে; যেমন, বলতে পারে, আমরা হিন্দু, বা মুসলমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধেও বাংলায় অনৈক্য রয়েছে। তেমনি বর্ণভেদ হিসাবে যে-জাতি সেখানেও বাংলায় ভেদের অন্ত নেই। তার পরে বিজ্ঞানবাদ-অনুসারে বংশগত যে-জাতি তার নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ, নাকের উচ্চতা, মাথার বেড় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মাপজোখ করে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে-হিসাবে আমরা বাঙালিরা যে কোন্ বংশে জন্মেছি, পণ্ডিতের মত নিয়ে তা ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশলাভ করি। এই প্রকাশের পূর্ণতা জীবনের পূর্ণতা। রোগতাপ দুর্বলতা অনশন প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে যতই সম্পূর্ণরূপে জীবধর্ম পালন করতে পারি ততই আমার জৈব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমার এই জৈব-প্রকাশের আধার হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।

কিন্তু, জলস্থল-আকাশ-আলোকের সম্বন্ধসূত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে-প্রকাশ সেই তো আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিত্তলোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সর্বজনীন চিত্তলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে ব্যক্তিগত চিত্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্ময় প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্ময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।

তাই বলছি, বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়; বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকার দিনে মাতৃভাষার গৌরববোধ বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে; কারণ, ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের পরিচয়সাধন হতে পেরেছে এবং অপরকেও তারা আপনার যথার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।

মানুষের প্রকাশের দুই পিঠ আছে। এক পিঠে তার স্বানুভূতি; আর-এক পিঠে অন্য সকলের কাছে আপনাকে জানানো। সে যদি অগোচর হয় তবে সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। যদি নিজের কাছেই তার প্রকাশ ক্ষীণ হল তবে সে অন্যের কাছেও নিজেকে গোচর করতে পারল না। যেখানে তার অগোচরতা সেখানেই সে

ক্ষুদ্র হয়ে রইল। আর যেখানে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারল সেখানেই তার মহত্ত্ব পরিস্ফুট হল।

এই পরিচয়ের সফলতা লাভ করতে হলে ভাষা সবল ও সতেজ হওয়া চাই। ভাষা যদি অস্বচ্ছ হয়, দরিদ্র হয়, জড়তাগ্রস্ত হয়, তা হলে মনোবিশ্বে মানুষের যে-প্রকাশ তা অসম্পূর্ণ হয়। বাংলাভাষা এক সময়ে গেঁয়োরকমের ছিল। তার সহযোগে তত্ত্বকথা ও গভীর ভাব প্রকাশ করবার অনেক বাধা ছিল। তাই বাঙালিকে সেদিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই যাঁরা সংস্কৃতভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গভাষায় একান্ত-আবদ্ধ চিত্তের সম্মান করতে পারেন নি। বাংলার পাঁচালি-সাহিত্য ও পয়ারের কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরণীয় বলে বিশ্বাস করে; মনে করে, স্বভাবতই সে জ্যোতির্হীন। কিন্তু, এ কথাটা তো গভীর ভাবে সত্য নয়; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিস্মৃতি। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ্য পায় তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না। উপযুক্ত আধারটি না পেলে প্রদীপ আপনার শিখা সম্বন্ধে আপনি অন্ধ থাকে। অতএব, যে-হেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে তার ভাষা তাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ— ভাষার দৈন্য দূর করে আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করা এবং সেই পূর্ণ পরিচয়টি বিশ্বের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা। আমার মনে পড়ে, আমাদের বাল্যকালে বাংলাদেশে একদিন ভাবের তাপস বঙ্কিমচন্দ্র কোন্‌ এক উদ্‌বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে হঠাৎ যেন বহু দিনের কৃষ্ণপক্ষ তার কালো পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে দিয়ে শুক্লপক্ষরূপে আবির্ভূত হল। তখন যে-সম্পদ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল শুধু তার জন্যেই যে আমাদের আনন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু, হঠাৎ সম্মুখে দেখা গেল, একটি অপরিসীম আশার ক্ষেত্র বিস্তারিত। কী যে হবে, কত যে পাব, ভাবীকাল যে কোন্‌ অভাবনীয়কে বহন করে আনবে, সেই ঔৎসুক্যে মন ভরে উঠল।

এই-যে মনে অনুভূতি জাগে যে, সৌভাগ্যের বুঝি কোথাও শেষ নেই, এই-যে হৃৎস্পন্দনের মধ্যে আগন্তুক অসীমের পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়, এতেই সৃষ্টিকার্য অগ্রসর হয়। সকল বিভাগেই এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিন বাঙালির এবং ভারতবাসীর আশা সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল। তাই কংগ্রেস মনে করেছিল যে, যতটুকু ইংরাজ হাতে তুলে দেবে সেই প্রসাদটুকু লাভ করেই বড়ো হওয়া যাবে। কিন্তু, এই সীমাবদ্ধ আশা যেদিন ঘুচে গেল সেদিন মনে হল যে, আমার আপনার মধ্যে যে-

শক্তি আছে তার দ্বারাই দেশের সকল সম্পদকে আবাহন করে আনতে পারব। এইরূপ অসীম আশার দ্বারাই অসাধ্য সাধন হয়। আশাকে নিগড়বদ্ধ করলে কোনো বড়ো কাজ হয় না। বাঙালি কোথায় এই অসীমতার পরিচয় পেয়েছে। সেখানেই যেখানে নিজের জগৎকে নিজে সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিরাজ করতে পেরেছে। মানুষ নিজের জগতে বিহার করতে না পারলে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হলে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। তাই তো কথা আছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার যা ধর্ম তাই আমার সৃষ্টির মূলশক্তি, আমিই স্বয়ং আমার আশ্রয়স্থল তৈরি করে তার মধ্যে বিরাজ করব। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় সৃষ্টি তার স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে বিচিত্র আকার ধারণ করে থাকে। সে রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আপন জগৎকে বিশেষভাবে রচনা ক'রে তাতে সঞ্চরণ করার অধিকার লাভ করে থাকে। বাঙালিজাতি তার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে। সেই ভাষাতে একদা এমন এক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল যাতে করে সে নানা রচনারূপের মধ্যে যেন অসম্বৃত হয়ে উঠেছিল; বীজ যেমন আপন প্রাণশক্তির উদ্‌বেলতায় নিজের আবরণ বিদীর্ণ করে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করে তেমনি আর কি। যদি তার এই শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না। বিদেশ থেকে বন্যার স্রোতের মতো আগত ভাবধারা তাকে ধুয়ে মুছে দিত।

এমন বিলুপ্তির পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি। ভারতবর্ষের অন্য অনেক জায়গায় ইংরাজি-চর্চা খুব প্রবল। সেখানে ইংরাজিভাষায় স্বজাতীয়ের মধ্যে, পরমাত্মীয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়ে থাকে। এমন দৈন্যদশা যে, পিতাপুত্রের পরস্পরের মধ্যে শুধু ভাবের নয় সামান্য সংবাদের আদানপ্রদানও বিদেশী ভাষার সহায়তায় ঘটে। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে যে-মুখে বলে বন্দেমাতরম্ সেই মুখেই মাতৃদত্ত পরম অধিকার যে মাতৃভাষা তার অসম্মান করতে মনে কোনো আক্ষেপ বোধ করে না।

বাংলাদেশেও যে এই আত্মাবমাননার লক্ষণ একেবারে নেই তা বলতে পারি নে। তবে কিনা এ সম্বন্ধে বাঙালির মনে একটা লজ্জার বোধ জন্মেছে। আজকের দিনে বাঙালির ডাকঘরের রাস্তায় বাংলা চিঠিরই ভিড় সব চেয়ে বেশি।

বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি যদি সম্মানবোধ জন্মে থাকে তবে স্বদেশীকে আত্মীয়কে ইংরাজি লেখার মতো কুকীর্তি কেউ করতে পারে না।

এক সময়ে বাংলাদেশে এমন হয়েছিল যে, ইংরাজি কাব্য লিখতে লোকের আগ্রহের সীমা ছিল না। তখন ইংরাজি রচনা, ইংরাজি বক্তৃতা, অসামান্য গৌরবের বিষয় ছিল।

আজকাল আবার বাংলাদেশে তারই পাল্টা ব্যাপার ঘটছে। এখন কেউ কেউ আক্ষেপ করে থাকেন যে, মাদ্রাজিরা বাঙালিদের চেয়ে ভালো ইংরাজি বলতে পারে। এই অপবাদ যেন আমরা মাথার মুকুট করে পরি।

আজকে প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে; এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান্ সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। যেখানে বাংলার শুধু ভৌগোলিক অধিকার সেখানে সে মানচিত্রের সীমাপরিধিকে ছাড়াতে পারে না। সেখানে তার দেশ বিধাতার সৃষ্ট দেশ; সম্পূর্ণ তার স্বদেশ নয়। কিন্তু, ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূসীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি সেই দেশটিকে নদী প্রান্তর পর্বত অতিক্রম করে সুদূর-প্রসারিতরূপে দেখতে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্য থেকে বাংলার সীমার বাহির পর্যন্ত তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হচ্ছে। খণ্ড দেশকালের বাহিরে সে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করছে।

ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, ইংলণ্ডে ও স্কট্‌লণ্ডে এক সময়ে বিরোধের অন্ত ছিল না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কেমন করে হয়েছিল। শুধু কোনো একজন স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তা হয় নি। আসলে যখন চ্যসার প্রভৃতি কবিদের সময়ে ইংরাজি ভাষা সাহিত্যসম্পদশালী হয়ে উঠল তখন তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্কট্‌লণ্ডকে আকৃষ্ট করেছিল। সে-ভাষা আপন ঐশ্বর্যের শক্তিতে স্কট্‌ল্যাণ্ডের বরমাল্য অধিকার করে নিয়েছিল। এমনি করেই দুই বিরোধী জাতি ভাষার ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হল, জ্ঞানের ভাবের একই পথে সহযাত্রী হয়ে আত্মীয়তার বন্ধনকে অন্তরে স্বীকার করায় তাদের বাহিরের ভেদ দূর হল। দূরপ্রদেশবাসী বাঙালী যে বাংলা-ভাষাকে আঁকড়ে থাকতে চাচ্ছে, প্রবাসের ভাষাকে যে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছে করছে না, তারও কারণ এই যে, সাহিত্যসম্পদশালী বাংলাভাষার শক্তি তার মনকে জিতে নিয়েছে। এই জন্যেই, সে যত দূরেই থাক্, আপন ভাষার গৌরববোধের সূত্রে বাংলার বাঙালির সঙ্গে তার যোগ সুগভীর হয়ে রয়েছে। এই যোগকে ছেদন করতে তার ব্যথা বোধ হয়, একে উপলব্ধি করতে তার আনন্দ।

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা

নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ-ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়। একদিন মহা-ফ্রেডরিকের সময় ফ্রান্সের ভাষার প্রতি জর্মানির লোলুপতা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে টি‍ঁকল না। কেননা ফ্রান্সের প্রকৃতি থেকে ফ্রান্সের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাতে প্রাণের কাজ চালানো যায় না। সিংহের চামড়া নিয়ে আসন বা গৃহসজ্জা করতে পারি, কিন্তু সিংহের সঙ্গে চামড়া বদল করতে পারি না।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর-একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। আমি যদিচ বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছি কিন্তু বুড়ো বয়সে সেই ইস্কুল আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি তাই ছেলে পড়িয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনও কখনও আমরা পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাদেরই ইংরেজি শেখানো সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে-বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না, তাকে ইংরেজি শেখাই কী অবলম্বন করে। ভিক্ষুকের সঙ্গে দাতার যে-সম্বন্ধ তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সম্বন্ধ নয়। ভাষাশিক্ষায় সেইটে যদি ঘটে, অর্থাৎ এক দিকে শূন্য ঝুলি আর-এক দিকে দানের অন্ন, তা হলে তাতে করে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু, এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকাতে কখনও কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে দিয়ে তার প্রতিদানে অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়। যে-নদী আমার গ্রামের কাছ দিয়ে বহমান, তাতে যেমন গ্রামের এপারে ওপারে খেয়া-পারাপার চলে তেমনি আবার তাতে পণ্যদ্রব্য বহন করে বিদেশের সঙ্গে কারবার হতে পারে। কেননা সেই বহমান নদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা নদীর সম্বন্ধ সচল।

২৩।৩১

য়ুরোপে এক সময়ে লাটিন ভাষা জ্ঞানচর্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা ছিল ততদিন য়ুরোপের ঐক্য ছিল বাহ্যিক আর অগভীর। কিন্তু, আজকার দিনে য়ুরোপ নানা বিদ্যাধারার সম্মিলনের দ্বারা যে-মহত্ত্ব লাভ করেছে সেটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটে নি। এই ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় বিদ্যার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবলমাত্র য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনও ঘটতে পারত না। আজকার দিনে য়ুরোপে রাষ্ট্রীয় অসাম্যের অন্ত নেই কিন্তু তার বিদ্যার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান-সম্মিলনের উজ্জ্বলতায় দিক্‌বিদিক্‌ অভিভূত হয়ে গেছে। সেই মহাদেশে দেয়ালি-উৎসবের যে বিরাট আয়োজন হয়েছে তা সমাধা করতে সেখানকার প্রত্যেক দেশ তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে এনেছে। যেখানে যথার্থ মিলন সেইখানেই যথার্থ শক্তি। আজকের দিনে য়ুরোপের যথার্থ শক্তি তার জ্ঞানসমবায়ে।

আমাদের দেশেও সেই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু, যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা। কারণ, সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।

রাশিয়া তার অধিকৃত ছোটো ছোটো দেশের ভাষাকে মেরে রাশীয় ভাষার অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়ান ফ্লেমিশ্‌দের ভাষা ভোলাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু, ভাষার অধিকার যে ভৌগোলিক অধিকারের চেয়ে বড়ো, তাই এখানে জবরদস্তি খাটে না। বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের অনৈক্য সইতে পারে নি, তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনে তাদের বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু, সে-ঐক্য অগভীর বলে তা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে-ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা। আজ য়ুরোপের বড়ো বড়ো দাসব্যবসায়ী নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে বিষম কষাঘাত করে তার ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের রথ চালিয়ে দিয়েছে। রথের বাহন যে-ঘোড়াকয়টি তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা নেই। কিন্তু, সারথির তাতে আসে যায় না। তার মন রয়েছে এগিয়ে চলার দিকে, তাই সে রথের ঘোড়াকটাকে

কষে বেঁধে, টেনে-হিঁচড়ে প্রাণপণে চাবকাচ্ছে। নইলে তার গতিবেগ যে থেমে যায়। এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু, পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন পত্রপুষ্পের মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা হল বসন্তের ঐক্য। কারণ, বসন্তসমাগমে ফাল্গুনের সমীরণে তাদের সকলেরই মঞ্জরী মুকুলিত হয়ে ওঠে। তাদের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে বসন্তের একই বাণীর চলাচলের পথ, সেখানেই তারা এক ও মিলিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জবরদস্ত লোকেরা বলে থাকে যে, মানুষকে বড়োরকমের বাঁধনে বেঁধেছেঁদে মেরে কেটেকুটে প্রয়োজন সাধন করতে হবে— এমন দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলেই নাকি ঐক্য সাধিত হতে পারে। অদ্বৈতের মধ্যে যে পরমমুক্ত শিব রয়েছেন তাঁকে তারা চায় না। তারা বেঁধেছেঁদে দ্বৈতকে বস্তাবন্দী করে যে অদ্বৈতের ভান তাকেই মেনে থাকে। কিন্তু যাঁরা যথার্থ অদ্বৈতকে অন্তরে লাভ করেছেন তাঁরা তো তাঁকে বাইরে খোঁজেন না। বাইরের যে-এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব; আর অন্তরের যে-এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর-একটা হল পঞ্চায়েৎ।

আজকার এই সাহিত্যসম্মিলনে বাংলাদেশের প্রতিবেশী অনেক বন্ধুও সমাগত হয়েছেন। তাঁরা যদি এই সম্মিলনে সমাগত হয়ে নিমন্ত্রণের গৌরবলাভে মনের মধ্যে কোনো বাধাবোধ না করে থাকেন তবে তাতে অনেক কাজ হয়েছে। আমরা যেন বাঙালির স্বাজাত্য-অভিমানের অতিমাত্রায় মিলনযজ্ঞে বিঘ্ন না বাধাই। দক্ষ তো আপন আভিজাত্যের অভিমানেই শিবকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যে-দেশে হিন্দি ভাষার প্রচলন সে-দেশে প্রবাসী বাঙালি বাংলাভাষায় ক্ষেত্র তৈরি করেছে, এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই উত্তর-ভারতে কাশীতে তাঁরা কী পেলেন, দেখলেন, আত্মীয়দের সহযোগিতায় কী লাভ করলেন, তা আমাদের জানতে হবে। আমরা দূরে যারা বাস করি তারা এখানকার এ-সবের সঙ্গে পরিচিত নই; উত্তরভারতের লোককে আমরা মানচিত্র বা গেজেটিয়ারের সহযোগে দেখেছি। বাঙালি যখন আপন ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় বিস্তার করে সৌহার্দের পথ মুক্ত করবেন তাতে কল্যাণ হবে। ভালোবাসার সাধনার একটা প্রধান সোপান হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা।

পরস্পরের পরিচয়ের অভাবই মানুষের প্রভেদকে বড়ো করে তোলে। যখন অন্তরের পরিচয় না হয় তখন বাইরের অনৈক্যই চোখে পড়ে, আর তাতে পদে পদে অবজ্ঞার সঞ্চার হয়ে থাকে। আজ বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে উত্তরভারতের সঙ্গে সেই

আন্তরিক পরিচয়ের প্রবাহ বাংলার অভিমুখে ধাবিত হোক। এখানকার সাহিত্যিকেরা আধুনিক ও প্রাচীন উত্তরভারতীয় সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার যোগ্য, তা সংগ্রহ করে দূরে বাংলাদেশে পাঠাবেন— এমনিভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে উত্তরভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।

আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে, যে-কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে-হিন্দিভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন অকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষমাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময়ে আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। মা বিদ্বিষাবহৈ।

আজ বসন্তসমাগমে অরণ্যের পাতায় পাতায় পুলকের সঞ্চার হয়েছে। গাছের যা শুকনো পাতা ছিল তা ঝরে গেল। এমন দিনে যারা হিসাবের নীরস পাতা উল্টাতে ব্যস্ত আছে তারা এই দেশব্যাপী বসন্ত-উৎসবের ছন্দে যোগ দিতে পারল না। তারা পিছনে পড়ে রইল। দেশে আজ যে পোলিটিকাল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে তার যতই মূল্য থাক্, 'এহ বাহ্য'। এর সমস্ত লাভ-লোকসানের হিসাবের চেয়ে অনেক বড়ো কথা রয়ে গেছে সেই সুগভীর আত্মিক-প্রেরণার মধ্যে যার প্রভাবে এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এমন স্বচ্ছন্দবিকাশ হয়েছে। স্বাস্থ্যের যে স্বাভাবিক প্রাণগত ক্রিয়া আছে, তা অগোচরে কাজ করে বলে ব্যস্তবাগীশ লোকেরা তার চেয়ে দাওয়াইখানার জয়েন্ট্‌ স্টক্‌ কোম্পানিকে ঢের বড়ো বলে মনে করে— এমন কি, তার জন্যে স্বাস্থ্য বিসর্জন করতেও রাজি হয়। সম্মানের জন্যে মানুষ শিরোপা প্রার্থনা করে, এবং তার প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু শিরোপা দ্বারা মানুষের মাথা বড়ো হয় না। আসল গৌরবের বার্তা মস্তিষ্কেই আছে, শিরোপায় নেই; প্রাণের সৃষ্টিঘরে আছে, দোকানের কারখানাঘরে নেই। বসন্ত বাংলার চিত্ত-উপবনে প্রাণদেবতার দাক্ষিণ্য নিয়ে এসে পৌঁচেছে, এ হল একেবারে ভিতরকার খবর, খবরের কাগজের খবর নয়; এর ঘোষণার ভার কবিদের উপর। আমি আজ সেই কবির কর্তব্য করতে এসেছি; আমি বলতে এসেছি, অহল্যাপাষাণীর উপর রামচন্দ্রের পদস্পর্শ হয়েছে— এই দৃশ্য দেখা গেছে বাংলাসাহিত্যে, এইটেই

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো আশার কথা। আজ বাংলা হতে দূরেও বাঙালিদের হৃদয়ক্ষেত্রে সেই আশা ও পুলকের সঞ্চার হোক। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বড়ো জোর ষাট বছরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য কথায় ছন্দে গানে ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই শক্তির এইখানেই শেষ নয়। আমাদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হোক। আমরা এই শক্তিকে চিরজীবিনী করি। যেখানেই মানবশক্তি ভাষায় ও সাহিত্যে প্রকাশমান হয়েছে সেইখানেই মানুষ অমরতা লাভ করেছে ও সর্বমানবসভায় আপন আসন ও বরমাল্য পেয়েছে।

অল্প কয়েকদিন পূর্বেই মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানকার অধ্যাপক ডাক্তার অটো আমাকে লিখেছেন যে, তাঁরা শান্তিনিকেতনে বাংলাসাহিত্যের চর্চা করবার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাতে চান। তিনি এখান থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে গেলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার 'চেয়ার' সৃষ্টি করা হবে। এই ইচ্ছা দশ বছর আগে কোনো বিদেশীর মনে জাগে নি।

আজ বঙ্গবাণীর উৎস খুলে গেল। যারা তার ধারার সন্ধানে ছুটে এল তাদের পরিবেষণের ভার আমাদের উপর রয়েছে। আমাদের আশা ও সাহস থাকলে এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঘটতে পারবে। আমরা সকলে মিলিত হয়ে সেই ভাবীকালের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকব। এই অধ্যবসায়ে বাংলা যদি বিশেষ গৌরব অর্জন করে সে কি সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রী হবে না। গাছের যে-শাখাতেই ফুল ফুটুক সে কি সকল গাছের নয়। অরণ্যের যে-বনস্পতিটি ফুলে ফলে ভরে উঠল যদি তারই উদ্দেশে মধুকরেরা ছুটে আসে তবে সমগ্র অরণ্য তাদের সমাদরে বরণ করে লয়। আজ বাংলার প্রাঙ্গণেই যদি অতিথিদের সমাগম হয়ে থাকে তবে তাতে ক্ষতি কী। তাঁরা যে ভারতবর্ষেরই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছেন, ভারতবাসীদের তা মানতে হবে। বঙ্গসাহিত্য আজ পরম শ্রদ্ধায় সেই মধুব্রতদের আহ্বান করুক।

১৩৩০

সভাপতির শেষ বক্তব্য

আমাদের দৈহিক প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, তার কতকগুলি বিশেষ মর্মস্থান আছে— যেমন, প্রাণের যে-প্রবাহ রক্তচলাচলের সহযোগে অঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় তার মর্মস্থান হচ্ছে হৃৎপিণ্ড; আর, ইন্দ্রিয়বোধের যে-ধারা স্নায়ুতন্ত্র অবলম্বন ক'রে দেহে বিস্তৃত হয়েছে, তার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। তেমনি প্রত্যেক দেশের

চিত্তে যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা প্রবহমান, তার এক-একটি মর্মস্থান আপনিই সৃষ্ট হয়ে থাকে।

পশ্চিম-মহাদেশে আমরা দেখতে পাই যে, ফ্রান্সের চিত্তের কেন্দ্রভূমি প্যারিস, ইতালীর রোম, ও প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স। হিন্দু-ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি দূরে দূরে যত বিদ্যার উৎস উৎসারিত হয়েছে তার ধারা সর্বদাই কোনো না কোনো উপলক্ষ্যে কাশীতে এসে মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রাধাকুমুদবাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে কাশী ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার কেন্দ্র ছিল, তার পরে বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হলেন তখন তিনি কাশীতেই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগেও যত কবি, ভক্ত, সাধু, কোনো না কোনো সূত্রে এই নগরীর সঙ্গে তাঁদের জীবন ও কর্মকে মিলিত করেছেন। আজকার দিনে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের যে-উদ্যম বঙ্গভাষায় প্রকাশ পেয়েছে ও বাংলায় নবজীবনের সঞ্চার করেছে, এটি কেবল সংকীর্ণ ভাবে বাংলার জিনিস নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ একটি বড়ো উদ্যমের প্রকাশ। সুতরাং স্বতই যদি এর একটা বেগ কাশীতে এসে পৌছয়, তবে তাতে ক'রে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

নবজাত শিশু জন্মলাভ করে প্রথমে আপন গৃহে, কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে জাত-সংস্কারের দ্বারা সে সমাজে স্থান পায়। তেমনি ভারতবর্ষের সকল প্রচেষ্টাগুলির যেখানে জন্ম সেখানেই তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না, তাদের অন্য সংস্কারের প্রয়োজন যার দ্বারা সেগুলি সর্বভারতের জিনিস ব'লে নিজের ও অন্যের কাছে প্রমাণিত হতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা আপন ভূগোলগত সীমায় স্বীয় বিশেষত্বকে আপন সাহিত্যে চিত্রকলায় প্রকাশ করুক, তাকে উজ্জ্বল করতে থাক্, কিন্তু তার প্রাণের প্রাচুর্য বাংলার বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠান অবলম্বন ক'রে আপন শাখা বিস্তার যদি করে তবে কাশী তার সেই আত্মপ্রসার-উদ্যমের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হতে পারে। কারণ, কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনো বিশেষ প্রদেশভুক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশরই।

এই প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল তার প্রধান আকাঙ্ক্ষাটি কী। তা হচ্ছে এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ফল যেন ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের হস্তে সহজে নিবেদন করে দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে যে-সকল তীর্থস্থান আছে তার সর্বপ্রধান কাজই হচ্ছে এই যে, সেখানে যাতে সকল প্রদেশের লোক আপন প্রাদেশিক সত্তার চেয়ে বড়ো সত্তাকে উপলব্ধি করে। সমস্ত হিন্দু-ভারতবর্ষের যে-একটি বিরাট ঐক্য আছে সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করবার স্থান হচ্ছে এই-সব তীর্থ। পুরী

প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থের চেয়ে কাশীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে কেবল ভক্তিধারার সঙ্গমস্থান তা নয়, এখানে ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার মিলন হয়েছে। বাংলাপ্রদেশ আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের যোগে কাশীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তবে সে জিনিসটিকে ভারতের ভারতী প্রসন্নমনে গ্রহণ করবেন।

বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে শুধু বাংলারই শক্তি বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না; কেননা সমগ্র ভারতবর্ষের নাড়ীর মধ্য দিয়েই বাংলার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হয়েছে, তাই বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা ভারতচিত্তশক্তিরই বিশেষ প্রকাশ বলে জানতে হবে। এই কথা স্মরণ করবার স্থান হোক সেই বারাণসী যেখানে বাংলার ন্যায়ের অধ্যাপক দ্রবিড়ের শ্রুতির অধ্যাপকের সঙ্গে একত্র বসে ভারতের একই ডালিতে বিদ্যার অর্ঘকে সম্মিলিত ক'রে সাজিয়ে তুলছেন।

পরিশেষে আমি একটি কাজের কথা বলতে চাই। বাঙালিরা যে এ দেশে বাস করছেন আমরা বাংলা ভাষার মধ্যে তার পরিচয় পাব এই আশা করি। বাঙালি কি সেই পরিচয় দিয়েছে। না, দেয় নি। এটা কি আমাদের চিত্তের অসাড়তার লক্ষণ নয়। যে-চিত্ত যথার্থ প্রাণবান্ তার ঔৎসুক্য চির-উদ্যমশীল। নির্জীব মনেরই দেখবার ইচ্ছা নেই, দেখবার শক্তি নেই। যা-কিছু তার থেকে পৃথক, সমবেদনার দুর্বলতাবশত তাকে সে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা অজ্ঞতারই নামান্তর। জানবার শক্তির অভাব এবং ভালোবাসবার শক্তির অভাব একসঙ্গেই ঘটে। যে-মানুষ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে সেই তো মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারে; আত্মার ক্ষীণতা-বশতই যার সেই মহৎ অধিকার নেই, দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর বেশি যে এগোতে পারে না, অহংকারের দ্বারা সেই তো আপনার দৈন্যকেই প্রকাশ করে। মমত্বের অভাব মাহাত্ম্যেরই অভাব।

বাঙালির প্রধান রিপু হচ্ছে এই আত্মাভিমান, যে-জন্য নিরন্তর নিজের প্রশংসাবাদ না শুনতে পেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাকে অহরহই স্তুতির মদ ঢোঁকে ঢোঁকে গেলাতে হয়, তার কমতি হলেই তার অসুখ বোধ হয়। এই চাটুলোলুপ আত্মাভিমান সত্যের অপলাপ বলেই এতে যে মোহান্ধকার সৃষ্টি করে তাতে অন্যকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না। এই অন্ধতা দ্বারা আমরা নিজেকে বঞ্চিত করি। আমি জাপানে বাঙালি ছাত্রদের দেখেছি, তারা জাপানে বোতাম-তৈরি সাবান-তৈরি শিখতে গেছে, কেউ কেউ বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত, কিন্তু জাপানকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে দেখবার আগ্রহ তাদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে নেই। যদি থাকত তা হলে বোতাম-শিক্ষার চেয়ে বড়ো শিক্ষা তাদের হ'ত। তারা জাপানকে শ্রদ্ধা করতে না পারার দ্বারা নিজেদের অশ্রদ্ধেয় করেছে। যে-সব বাঙালি

উত্তরপশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল বা অল্পকাল বাস করছে তারা যদি এই মোহান্ধতার বেষ্টন থেকে নিজেদের মুক্ত না করে, তা হলে এখানকার মানবসংস্রব থেকে তাদের সাহিত্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না। যে-কয়েদি গারদের বাইরে রাস্তায় এসে কাজ করে সেও যেমন বন্দী, তেমনি যে-বাঙালি আপন ঘর থেকে দূরে সঞ্চরণ করতে আসে তারও মনের পায়ে অভিমান ও অশ্রদ্ধার বেড়ি পরানো। এই উপেক্ষার ভাবকে মন থেকে না তাড়াতে পারলে কাশীর মতো স্থানে সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালির প্রতিষ্ঠান নিরর্থক হবে। বাঙালির চিন্তাপরায়ণ বীক্ষণশীল মন যে উত্তরপশ্চিম ভারতের সংস্পর্শে এসেছে তারই প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে ফলবান হয়ে দেখা দেবে, তবেই এখানকার বঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ নিতান্ত একটা বাহুল্য ব্যাপার বলে গণ্য হবে না। এখানকার ভাষা, সাহিত্য, এখানকার স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা-কিছু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা সম্ভব তা সমস্তই বাংলাসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হবে এখানকার বাঙালি-সাহিত্যিক-সংঘ থেকে এই আমরা বিশেষভাবে আশা করি।

এ দেশে যে-সব বহুমূল্য পুঁথি আছে তা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আমি জানি, একজন জাপানি পুরোহিত নেপাল থেকে তিন-চার সিন্ধুক বোঝাই করে মহাযান-বৌদ্ধশাস্ত্র জাপানে চালান করে দিয়েছেন। এজন্য সংগ্রহকারকে দোষ দেব কী করে। যারা চেয়েছিল তারা পেয়েছে, যারা চায় নি তারা হারালো, এই তো সংগত। কিন্তু, এইবেলা সতর্ক হ'তে হবে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং রক্ষা করবার একটি প্রশস্ত স্থান হচ্ছে কাশী। এখানকার বঙ্গসাহিত্যপরিষদের সভ্যেরা এই কাজকে নিজের কাজ বলে গণ্য করবেন, এই আমি আশা করি।

আমাদের প্রাচীন কীর্তির যা ভগ্নাবশেষ চারি দিকে ছড়িয়ে আছে আন্তরিক শ্রদ্ধার দ্বারা তাদের রক্ষা করতে হবে। আমি দেখেছি, কত ভালো ভালো মূর্তির টুকরো অনেক জায়গায় পা-ধোবার পিঁড়ি বা সিঁড়ির ধাপে পরিণত করা হয়েছে। এই পদাঘাত থেকে এদের বাঁচাতে হবে। আধুনিক কালে পুরাতন শিল্পের যা কিছু নিদর্শন তার অধিকাংশ পশ্চিমভারতেই বিদ্যমান আছে। বাংলার নরম মাটিতে তার অধিকাংশ তলিয়ে গেছে। কিন্তু, এখানকার পাথুরে জায়গায়, কঠিন ভূমিতে, পুরাতন কীর্তি রক্ষিত হয়েছে; তার ভগ্নাবশেষ ছড়াছড়ি যাচ্ছে। আপনারা শ্রদ্ধা সহকারে তা সংগ্রহ করুন, এখানে যে 'সারস্বত-ভাণ্ডার' স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে তা যেন আপনাদের স্থায়ী কাজে প্রবৃত্ত করে, আজকের সভায় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমরা ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর করি নি। তাকে আপনার জিনিস বলে বরণ করে নিই নি। তাই আশ্চর্য অমূল্য ছবি-সব পথে-ঘাটে সামান্য দরে বিকিয়ে যেত, আমরা চেয়ে দেখি নি।

এক সময়ে, মনে আছে, জাপান থেকে কলাসৌন্দর্যের রসজ্ঞ ওকাকুরা বাংলাদেশে এসে এ দেশের চিত্রকলা ও কারুশিল্পের যথার্থ মূল্য আমাদের অশিক্ষিত দৃষ্টির কাছে প্রকাশ করলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করবার পক্ষে কলিকাতার আর্ট্ স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু, ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাজনিত যে-অবজ্ঞা সে আজও সম্পূর্ণ ঘোচে নি। এইজন্যেই আমাদের দেশের উদাসীন মুষ্টি থেকে ভারতের চিত্রসম্পদ অতি সহজে স্খলিত হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এখানকার পরিষৎ এইগুলিকে সংগ্রহ করাকে যদি নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেন তা হলে ধন্য হবেন।

সকল দেশেই বিদ্যার একটা ধারাবাহিকতা আছে। মূল-উৎস থেকে নদীর ধারা বন্ধ হয়ে গেলে যেমন তা বদ্ধ জলের কুণ্ডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানের তপস্যা বা কলার সাধনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় তা হলে সে-সমস্ত ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। অজন্তার চিত্রকলায় যে-ধারা ছিল সে ধারা অনেক দিন বয় নি, তাই ভারতের চিত্রকলা পঙ্ককুণ্ডে অবরুদ্ধ হয়ে ক্রমে তলার পাঁকে এসে ঠেকেছে। এই ধারাকে যথাসাধ্য উন্মুক্ত করা চাই তো। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের ভালো ভালো সব ছবিই যদি বিদেশে চালান যায়, তা হলে আমাদের দেশে চিত্রকলার বিদ্যাকে সজীব ও সচল রাখা কঠিন হবে। আমাদের আধুনিক চিত্রে প্রাচীন চিত্রকলার অনুকরণ করতে হবে, এমন কথা বলি নে। কিন্তু, অতীতের সাধনার মধ্যে যে-একটি প্রাণের বেগ আছে সেই বেগটি আমাদের চিত্তের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। অতীতের সৃষ্টিপ্রবাহকে বর্তমান কালের সৃষ্টির উদ্যমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করলে সেই উদ্যমকে সহায়হীন করা হয়। শুধু নিজেদের অতীত কেন, অন্য দেশের বিদ্যা থেকে আমরা যা পাই তার প্রধান দান হচ্ছে এই উদ্যম। এইজন্যে য়ুরোপে, যেখানে দেশ-বিদেশের সমস্ত মানবসংসার থেকে সকলরকম বিদ্যার সমবায় ঘটছে, সেখানে সাধনার উদ্যম এমন আশ্চর্যরূপে বেড়ে উঠছে। এই কথাটি মনে ক'রে আমাদের দেশের অতীতের লুপ্তপ্রায় সমস্ত কীর্তির যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেন করি, তাদের পুনরাবৃত্তি করবার জন্যে নয়, নিজেদের চিত্তকে সাধনার বৃহৎ ক্ষেত্রে জাগরূক রাখবার জন্যে।

১৩৩০

সাহিত্যসম্মিলন

যখন আমরা কোনো সত্যবস্তুকে পাই তাহাকে রক্ষণপালনের জন্য বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মানুষ করিবার জন্য মাতাকে গুরুর মন্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন গ্রহণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

বাঙালি একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ব স্বতই বাঙালির চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয় এমন আর কিছুই না। স্বদেশে বিদেশে আজ যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই বাংলাসাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে, তাহার মতো অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কী আছে।

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের আপন নহে, উপার্জন করিয়া যাহা পাই তাহাতেও আমাদের আংশিক অধিকার; নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্মপ্রকাশ, তাহার 'পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। যে-দেশে আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্বত্র আমাদের আত্মা আপন বহুধা শক্তিকে নানা বিভাগে নানারূপে সৃষ্টিকার্যে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার পরামর্শ এত উচ্চস্বরে এবং এমন নিষ্ফলভাবে দিতে হইত না। দেশে আমরা আত্মপ্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলাসাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন-কি, ইহা আমাদের নূতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ, ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-খাতে বহিত বর্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসংগতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপন যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে জড়পুত্তলীর মতো হাজার বৎসরের দড়ির টানে বাঁধা কায়দায় চলাফেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যেই তাহার মন বেপরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে; সেখানে সাহিত্যেই অনেক

সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে-মানুষ বন্দী বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক হইতে আমাদের মনের নাগপাশবন্ধন মোচন করুক; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক; তাহা হইলেই একদা কর্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইন্ধনের নিজের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জ্বলিয়া ওঠে; পাথরের উপর বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে ক্ষণকালের জন্য তাতিয়া উঠে, কিন্তু সে জ্বলে না। বাংলাসাহিত্য বাঙালির মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলিতেছে; ভিতরের দিক হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের দিকে জ্বলিবে, তখন ঝড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না, বরং বাড়িয়া উঠিবে। এখনই বাংলাদেশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি; বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালি যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও জ্বলিয়া থাকে সে বাংলাদেশে; কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলাদেশে। ইহার অন্যান্য যে-কোনো কারণ থাক্, একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেক দিন হইতে অগ্নি-সঞ্চয় করিতেছে— তাহার চিত্তের ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, ভোজনপঙ্‌ক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালিই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন সাহিত্যই সর্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়াই আবহমান কাল সুর করিয়া পড়িয়া যাইত— মনের উদার সঞ্চরণের জন্য যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত— তবে তাহার মনের অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি হইয়া তাহাকে চিন্তায় ও কর্মে সমান অচল করিয়া রাখিত।

মনে আছে, আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা

আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলাসাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন বহুমূল্য হইয়া উঠিতেছে দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে বাঙালির মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে— সাধারণ দেশহিতের উদ্দেশেও বাঙালি এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অন্য কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্তে বাঙালির গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেশের ঐক্য ও মুক্তিকে যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা এমনি করিয়াই ভাবেন। তাঁহারা এমনও মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন দেহগুলিকে কোনো মন্ত্রবলে একটিমাত্র প্রকাণ্ড দৈত্যদেহ করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটিবে না। শ্যামদেশের জোড়া যমজ যে দৈহিক শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চেয়ে জোর বেশি পায় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। নিজের দেহকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অন্য দেহধারীর সঙ্গে আমাদের যোগ একটা বন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলাভাষাকে নির্বাসিত করিয়া অন্য যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালির চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মূঢ়তা। বাংলাসাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালির মন যতই বড়ো হইবে, ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা, মনের অপরিণতি ঘটে ; যে-অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের

মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাঁহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরও জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কম্‌তি নাই— তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই তো। যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া আমরা হয়রান্ হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে। যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ৎ তাহার হিন্দুজমিদারের প্রতি আল্লার দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দুহৃদয় স্পর্শ করে না। হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া, ঝগড়া করিয়া, যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়। বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষাসাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনও চলে।

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানি বাংলা, কেতাবি বাংলা নয়। স্কট্‌লণ্ডের চল্‌তি ভাষাও তো কেতাবি ইংরেজি নয়, স্কট্‌লণ্ড্ কেন, ইংলণ্ডের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজি নয়। কিন্তু, তা লইয়া তো শিক্ষাব্যবহারে কোনোদিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক-ভাষার বিশিষ্টতা থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়মবন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সাহিত্য খান্‌খান্ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু, দুই তরফের কেহই এ কথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র আজও প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্‌কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তার পরে পলিটিক্‌স্ সত্য হইতে পারে। খানকতক বেজোড় কাঠ লইয়া ঘোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়িরূপে ঐক্য লাভ করে, এ কথা ঠিক নহে! খুব একটা খড়্‌খড়ে ঝড়্‌ঝড়ে গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্‌ও সেইরকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোয়ালে ছাপ্পরে চাকায় কোনোরকমের একটা সংগতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীক্‌সাহিত্যে গ্রীক্‌-দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃস্টান ছিলেন। তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে-বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক-বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান আমলে আর্‌বি ফার্‌সি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারও জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব, সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন তাঁহাদের অন্তর্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু, আশা করিতেছি, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমেই বলিয়াছি, বাংলা-দেশের সাধনা একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্ব-সাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

১৩৩৩

কবির অভিভাষণ

এই পরিষদে[1] কবির অভ্যর্থনা পূর্বেই হয়ে গেছে। সেই কবি বৈদেহিক; সে বাণীমূর্তিতে ভাবরূপে সম্পূর্ণ। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সংকীর্ণ এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমার বন্ধু[2] এইমাত্র যমের সঙ্গে কবির তুলনা ক'রে বলেছেন, যমরাজ আর

১ প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ্‌

২ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

কবিরাজ দুটি বিপরীত পদার্থ। বোধ হয় তিনি বলতে চান, যমরাজ নাশ করে আর কবিরাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এরা উভয়েই যে এক দলের লোক, একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত, সে-কথা অমন ক'রে চাপা দিলে চলবে কেন।

নাটকসৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা ঝরে পড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন— সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার ক'রে সব শেষে বলেছেন, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ইনি না থাকলে যা-কিছু ক্ষণকালের তাই জমে উঠে যেটি চিরকালের তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। যেটা স্থূল যেটা স্থাবর, সেটাকে ঠেলে ফেলবার কাজে মৃত্যু নিয়ত ধাবমান।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

এই যদি হয় যমরাজের কাজ, তবে কবির কাজের সঙ্গে এর মিল আছে বই কি। ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন ; কিন্তু কবি আসেন 'পঞ্চমঃ' ; আশু-প্রয়োজনের সম্ভঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখাতে।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি-অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন ক'রে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন ক'রে নেওয়াটি ব্যক্তিভেদে কিছু না কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কত রকম ক'রে বুঝেছে। সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষেও যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি। এইজন্যেই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর-এক

জন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীয়। তাঁর মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কী কথাটি বলছে, সেটি শোনবার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে— যাঁরা শুনতে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক'রে শোনবার ক্ষমতা সকলের নেই। যেমন অনেক মানুষ আছে যাদের গানের কান থাকে না— তাদের কানে সুর-গুলো পৌঁছয়, গান পৌঁছয় না, অর্থাৎ সুরগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যটি তারা স্বভাবত ধরতে পারে না। কাব্য সম্বন্ধে সেই ঐক্যবোধের অভাব অনেকেরই আছে। তারা যে একেবারেই কিছু পায় না তা নয়— সন্দেশের মধ্যে তারা খাদ্যকে পায়, সন্দেশকেই পায় না। সন্দেশ চিনি-ছানার চেয়ে অনেক বেশি, তার মধ্যে স্বাদের যে-সমগ্রতা আছে সেটি পাবার জন্যে রসবোধের শক্তি থাকা চাই। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, এই সমগ্রতার অনির্বচনীয় রসবোধের শক্তি পরিণতি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সেরা যাচনদার এক দিকে তার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি, আর-এক দিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা, দুয়েরই প্রয়োজন।

এই কারণেই এই-যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার সার্থকতা আছে। এখানে কয়েকজন যে একত্র হয়েছেন তার একটিমাত্র কারণ, কাব্য থেকে তাঁরা কিছু না কিছু শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা উদাসীন নন। এই পরস্পরের শোনা নানা দিক থেকে মিলিয়ে নেবার আনন্দ আছে। আর, যাঁরা স্বভাবশ্রোতা, যাঁরা সম্পূর্ণকে সহজে উপলব্ধি করেন, তাঁরা এই পরিষদে আপন যোগ্য আসনটি লাভ করতে পারবেন।

এই পরিষদটি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কবির পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সুযোগ, পাঠকের শ্রদ্ধা। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টি-পদার্থের প্রধান সহায় শ্রদ্ধা। সুন্দরকে দেখবার পক্ষে অশ্রদ্ধার মতো অন্ধতা আর নেই। এই বিশ্বরচনায় সুন্দরের ধৈর্য অপরিসীম। চিত্তে যখন উপেক্ষা, শ্রদ্ধা যখন অসাড়, তখনও প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে সুন্দর আসেন, কোনো অর্ঘ্য না নিয়ে চলে যান, তাঁকে যে গ্রহণ করতে না পারলে সে জানতেও পারে না যে সে বঞ্চিত। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্টিতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, অশ্রদ্ধার অন্ধকার রাত্রে সুন্দর অলক্ষ্যে এসেছেন, দীপ জ্বালা হয় নি, অলক্ষ্যে চলে গিয়েছেন। সাহিত্যে ও কলারচনায় আজ আমাদের যে সঞ্চয় তা যুগযুগান্তরের বহু অপচয়ের পরিশিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অতিথি ফিরে যায় রুদ্ধদ্বারে বৃথা আঘাত ক'রে, কেউ-বা দৈবক্রমে এসে পড়ে যখন গৃহস্থ জেগে আছে। কেউ-বা অনেক দ্বার থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটা গৃহের দ্বার খোলা। আমার সৌভাগ্য এই যে, এখানে দ্বার খোলা পেয়েছি, আহ্বান শুনতে পাচ্ছি 'এসো'। এই পরিষদ্ আমাকে শ্রদ্ধার আসন

দেবার জন্যে প্রস্তুত ; স্বদেশের আতিথ্য এইখানে অকৃপণ ; এই সভার সভ্যদের কাছে আমার পরিচয় অন্তত ঔদাসীন্যের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না।

দেশবিদেশে আমার সম্মানের বিবরণ আমার বন্ধু এইমাত্র বর্ণনা করেছেন। বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ-হিসাবে অতি অল্প। আমার লেখার সামান্য এক অংশের তর্জমা তাঁদের কাছে পৌচেছে, সে তর্জমারও অনেকখানি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। কিন্তু সাহিত্যে, কলারচনায়, পরিমাণের হিসাবটা বড়ো হিসাব নয়, সে ক্ষেত্রে অল্প হয়তো বেশির চেয়ে বেশি হ'তেও পারে। সাহিত্যকে ঠিক ভাবে যে দেখে সে মেপে দেখে না, তলিয়ে দেখে ; লম্বা পাড়ি দিয়ে সাঁতার না কাটলেও তার চলে, সে ডুব দিয়ে পরিচয় পায়, সেই পরিচয় অন্তরতর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে পরিমাণের দরকার, স্বাদের বিচারের জন্যে এক গ্রাসের মূল্য দুই গ্রাসের চেয়ে কম নয়। বস্তুত এই ক্ষেত্রে অধিক অনেক সময়ে স্বল্পের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ; অনেককে দেখতে গিয়ে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে তাতে একেকে দেখবার বাধা ঘটায়। রসসাহিত্যে এই একেকে দেখাই আসল দেখা।

একজন য়ুরোপীয় আর্টিস্ট্‌কে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ বলে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন, "ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার ; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক'রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো ; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।"

দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে ; কাছের মানুষের কোনো দাবি আমি রক্ষা করি, কোনো দাবি আমি রক্ষা করতে অক্ষম ; কেউ-বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান কেউ-বা পান না, এই সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হয়ে ওঠে— নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগদ্বেষের ধূলি-নিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিবিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে, দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আল্‌পিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে ;

তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এইরকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে খর্বতা তা আমি অনেককাল থেকে অনুভব করে এসেছি। দেশের লোকের সভায় এরই সংকোচ আমি এড়াতে পারি নে। অন্যত্র জগদ্বরেণ্য লোকদের সামনে আমাকে কথা বলতে হয়েছে, কিছুমাত্র দ্বিধা আমার মনে কোনোদিন আসে নি; নিশ্চয় জেনেছি, তাঁরা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝবেন, একটি নির্মল ও প্রশস্ত ভূমিকার মধ্যে আমার কথাগুলিকে তাঁরা ধ'রে দেখতে পারবেন। এ দেশে এমন-কি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সংকোচ বোধ হয়— জানি যে, কত কী ঘরাও কারণে ও ঘরগড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

এই জন্যেই যমরাজের নিন্দার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি; কারণ, তাঁর উপরে আমার মস্ত ভরসা। তিনি নৈকট্যের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেবেন; আমার মধ্যে যা-কিছু অবান্তর নিরর্থক ক্ষণকালীন, আর আমার সম্বন্ধে যা কিছু মিথ্যা সৃষ্টি, সে সমস্তই তিনি এক অন্তিম নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবেন। বাহিরের নৈকট্যকে সরিয়ে ফেলে অন্তরের নৈকট্যকে তিনি সুগম করবেন। কবিরাজদের পরম সুহৃদ যমরাজ। যেদিন তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ডেকে নেবেন সেদিন তোমাদের এই রবীন্দ্র-পরিষদ খুব জমে উঠবে।

কিন্তু, এ কথা ব'লে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা নেই। মানুষ মানুষের নগদ প্রীতি চায়। মৃত্যুর পরে স্মরণসভার সভাপতির গদগদ ভাষার করুণ রস যেখানে উচ্ছ্বসিত, সেখানে তৃষার্তের পাত্র পৌঁছয় না। যে জীবলোকে এসেছি এখানে নানা রসের উৎস আছে, সেই সুধারসে মর্তলোকেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই; বুঝতে পারি, এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে। মানুষের কাছে মানুষের প্রীতি তারই মধ্যে একটি প্রধান অমৃতরস—মরবার পূর্বে এ যদি অঞ্জলি ভরে পান করতে পাই তা হলে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে যায়। অনেক দিনের কথা বলছি, তখন আমার অল্প বয়স। একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুশয্যার পাশে আমি বসে আছি। তিনি বললেন, 'রবি, তোমার হাতটা আমাকে দাও দেখি।' হাত বাড়িয়ে দিলেম, কিন্তু তাঁর এই অনুরোধের ঠিক মানেটি বুঝতে পারলেম না। অবশেষে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'আমি এই যে জীবলোক থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমার হাতের স্পর্শে তারই শেষস্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।'

সেই জীবলোকের স্পর্শের জন্যে মনে আকাঙ্ক্ষা থাকে। কেননা, চলে যেতে হবে। আমার কাছে সেই স্পর্শটি কোথায় স্পষ্ট, কোথায় নিবিড়। যেখান থেকে এই

কথাটি আসছে, 'তুমি আমাকে খুশি করেছ, তুমি যে জন্মেছ-সেটা আমার কাছে সার্থক, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মূল্য আমি মানি।' বর্তমানের এই বাণীর মধ্যে ভাবীকালের দানও প্রচ্ছন্ন; যে-প্রীতি, যে-শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর, সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে; ক্ষণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। আমার বিদায়কাল অধিক দূরে নেই: এই সময়ে জীবলোকের আনন্দস্পর্শ তোমাদের এই পরিষদে আমার জন্য তোমরা প্রস্তুত রেখেছ, তোমাদের যা দেয় ভাবীকালের উপরে তার বরাত দাও নি।

ভাবীকালকে অত্যন্ত বেশি করে জুড়ে বসে থাকব, এমন আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি ভবিষ্যতের আসন সগৌরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া। মেয়াদ ফুরোলে যে-গাছ মরে যায় অনেক দিন থেকে ঝরা পাতায় সে মাটি তৈরি করে; সেই মাটিতে খাদ্য জমে থাকে পরবর্তী গাছের জন্যে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণশক্তি পায় না; আমাদের বাণীর সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চড়তে পারে। সে সপ্তকের রাগিণী তখন নূতন হবে, কিন্তু পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করবার স্পর্ধা যেন তার না হয়। মনে যেন থাকে, তখনকার কালের পুরাতন এখনকার কালে নূতনের গৌরবেই আবির্ভূত হয়েছিল।

নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়— তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজা-বাহাদুর আকাশে যে-জয়ধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধরে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতায় আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলুম—

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের নিত্যসুধা তৃপ্তি করে পুরা।

সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা

শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এইরকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে-বৃদ্ধদের মরচে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।

এই পরিষদ সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক। পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।

১৩৩৪

সাহিত্যরূপ

আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে এই ইচ্ছা করে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করব ; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা করে দেওয়া যাবে তা মনে করে নয়। অনেক সময়ে আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না বলে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা করে নিই ; তাতে করে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়, তখন কোনো-প্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব তখন আশা করি এ কথা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না যে, যে-জিনিসটা নিয়ে তর্ক করছি সেটা আমাদের দুই পক্ষেরই দরদের জিনিস, সেটা বাংলাসাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে ; এখন অমিলটা কোথায় সেটা শান্তভাবে স্থির করে দেখা দরকার।

আমার বয়স একদা অল্প ছিল, তখন সেকালের অল্পবয়সীদের সঙ্গে একাসনে বসে আলাপ করা সহজ ছিল। দীর্ঘকাল সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তার কারণ এ নয় যে, আমার পক্ষে কোনো বাধা আছে। এখনকার কালে যাঁরা চিন্তা করছেন, রচনা করছেন, বাংলাসাহিত্যে নেতৃত্ব নেবার যাঁরা উপযুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তাঁরা কী মনের ভাব নিয়ে আসরে নেবেছেন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করবার পক্ষে তাঁদের মনের মধ্যে হয়তো কোনো অন্তরায় আছে। এ নিয়ে অনেকে আমাকেই অপরাধী করেন। তাঁরা বলেন, আমি না জেনে অনেক সময় অনেক কথা বলে থাকি। এটা অসম্ভব নয়। আজকের দিনে বাংলা ভাষায় প্রতিদিন যে-সব লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা সমস্ত পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সে শক্তিও নেই, অবকাশেরও অভাব আছে। সেই কারণেই আজকের মতো এই-রকম উপলক্ষ্যে নূতন লেখকদের কাছ থেকে রচনানীতি ও রীতি সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরের কথা কিছু শুনে নেব, এই ইচ্ছা করি।

আলোচনাটাকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রসঙ্গটার একটা গোড়াপত্তন করে দেওয়া ভালো।

এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যে-যুগে আরম্ভ হয়েছিল সে আমার জন্মের অদূরবর্তী পূর্বকালে। সেইজন্যে এই সাহিত্যসূত্রপাতের চিত্রটি আমার কাছে সুস্পষ্ট।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে,

পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। মিল্‌টন ইংরেজিভাষায় লাটিন-ধাতুমূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্যই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে-ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাড়ুয্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন; এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কিনা, এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কিনা, সে তর্ক এখানে করতে চাই নে— কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে; তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপন-সৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি সেই একই কথা। তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে-চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ, তিনি

সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার, বর্জিল, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু, এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যাবসা নাহয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারই। যদি ফেল্ করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়। আমরা জানি, এসিয়াতে এমন এক যুগ ছিল যখন পারস্যে চীনে গ্রীসে রোমে ভারতে আর্টের আদর্শ চালাচালি হয়েছিল। এই ঋণ-প্রতিঋণের আবর্তন-আলোড়নে সমস্ত এসিয়া জুড়ে নবনবোন্মেষশালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল— তাতে আর্টিস্টের মন জাগরূক হয়েছিল, অভিভূত হয় নি। অর্থাৎ, সেদিন চীন পারস্য ভারত কে কার কাছ থেকে কী পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেছে সে কথাটা চাপা পড়েছে, তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় মুনফার হিসাবটাই আজও বড়ো হয়ে রয়েছে। অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যাবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন। অর্থাৎ, তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হয়ে ব্যর্থ হল না। কথাসাহিত্যের নতুন রূপ প্রবর্তন করলেন; তাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন। তারা বললে না যে, এটা বিদেশী; এই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে। তার কারণ, বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্য-রূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলাভাষায় কথাসাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বাংলাসাহিত্যে। তার কারণ, তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে, গল্পের কোনো একটি থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'বিষবৃক্ষ' নামের দ্বারাই

মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিকভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।

নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের থেকে দেখা যাক। একদিন সাহিত্যের আসরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল ঝক্‌ঝকে পালিস-করা লেখা; কাটাকোটা ছাঁটাছোঁটা জোড়া-দেওয়া দ্বিপদীর গাঁথনি। তাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জ্বলতা, রসধারার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোকে তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল।

এমন সময়ে এলেন বার্‌ন্‌স্। তখনকার শান-বাঁধানো সাহিত্যের রাস্তা, যেখানে তক্‌মা-পরা কায়দাকানুনের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত-উৎসবের যাত্রীদের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আনলেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিলল না। তার পর থেকে ওয়ার্ড্‌স্বার্থ, কোল্‌রিজ, শেলি, কীট্‌স্ আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করে চললেন। সেই রূপের মধ্যে ভাবের বিশিষ্টতাও আছে, কিন্তু ভাবগুলি রূপবান হয়েছে ব'লেই তার গৌরব। কাব্যের বিষয় ভাষা ও রূপ সম্বন্ধে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের বাঁধা মত ছিল, কিন্তু সেই বাঁধা মতের মানুষটি কবি নন; যেখানে সেই-সমস্ত মতকে বেমালুম পেরিয়ে গেছেন সেইখানেই তিনি কবি। মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু, টম্‌সন্ একেন্‌সাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু, বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়; বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে থাকে তা হলেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল। শরৎকালকে সম্বোধন করে কীটস্ যে-কবিতা লিখেছেন তার বিষয় বিশ্লেষণ করে কীই বা পাওয়া যায়; তার সমস্তটাতেই রূপের জাদু।

য়ুরোপীয় সাহিত্য আমার যে বিশেষ জানা আছে, এমন অহংকার আমি করি নে। শুনতে পাই, দান্তে, গ্যটে, ভিক্টর হ্যুগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই রূপের লীলায় ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের আনন্দ। সাহিত্যে এই নব নব রূপস্রষ্টার সংখ্যা বেশি নয়।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ-যুগান্তর কথাটার

উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে 'যুগ' বলে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্ন-ওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে— বোঝাই সারা হলে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাশের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখেছে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তকমাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনের বারো-আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না—কেননা তার পনেরো আনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উদ্ভটরকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি এ কথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই, কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারি নে। সেটা নূতন কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়— যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজের সাহিত্যিক পালাটা সাঙ্গ করে চলে যেতে পারেন; কিন্তু তিনি যে একটা-কোনো যুগকে চুকিয়ে দিয়ে যান কিম্বা আর-একজন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে প্রকাশ করেন তিনি আর-একটা যুগকে এনে হাজির

করে দেন, এটা অদ্ভুত কথা। একজন সাহিত্যিক আর-একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত করে দিয়ে যান না, তাঁরা একটা পাতার পরে আর-একটা পাতা যুক্ত করে দেন। প্রাচীন কালে যখন কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তখন একজনের লেখা চেঁচে মেজে তারই উপরে আর-একজন লিখত— তাতে পূর্বলেখকের চেয়ে দ্বিতীয় লেখকের অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণ হত না, এইমাত্র প্রমাণ হত যে, দ্বিতীয় লেখকটি পরবর্তী। এক যুগ আর-এক যুগকে লুপ্ত না করে আপনার স্থান পায় না, এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্বাপরতা প্রমাণ হয়; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়— হয়তো দেখা যাবে, ভাবীকাল উপরিবর্তী লেখটাকে মুছে ফেলে তলবর্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। নূতন কাল উপস্থিতমতো খুবই প্রবল— তার তুচ্ছতাও স্পর্ধিত; সে কিছুতেই মনে করতে পারে না যে, তার মেয়াদ বেশিক্ষণের হয়তো নয়। কোনো-এক ভবিষ্যতে সে যে তার অতীতের চেয়েও জীর্ণতর প্রমাণিত হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। এই জন্যেই অতি অনায়াসেই সে দম্ভ করে যে, সেই চরম সত্যের পূর্বতন ধারাকে সে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। এ কথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী— কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।

যদি নিজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি, আশা করি, আপনারা মাপ করবেন। আমার বাল্যকালে আমি দুই-একজন কবিকে জানতুম। তাঁদের মতো লিখতে পারব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। লেখবার চেষ্টাও করেছি, মনে কখনও কখনও নিশ্চয়ই অহংকারও হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অতৃপ্তিও ছিল। সাহিত্যের যে-রূপটা অন্যের, আমার আত্মপ্রকাশকে কোনোমতে সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে তোলবার চেষ্টা করে কখনোই যথার্থ আনন্দ হতে পারে না। যা হোক, বাল্যকালে যখন নিজের অন্তরে কোনো আদর্শ উপলব্ধি করতে পারি নি, তখন বাইরের আদর্শের অনুবর্তন করে যতটুকু ফল লাভ করা যেত সেইটেকেই সার্থকতা বলে মনে করতুম।

এক সময়ে যখন আপন মনে একলা ছিলুম, একখানা স্লেট হাতে মনের আবেগে দৈবাৎ একটা কবিতা লিখতেই অপূর্ব একটা গৌরব বোধ হল। যেন আপন প্রদীপের শিখা হঠাৎ জলে উঠল। যে লেখাটা হল সেইটের মধ্যেই কোনো উৎকর্ষ অনুভব করে যে আনন্দ তা নয়। আমার অন্তরের শক্তি সেই প্রথম আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তেই এতদিনের বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলুম। তখনকার দিনের প্রবীণ সাহিত্যিকরা আমার সেই কাব্যরূপটিকে সমাদর করেন নি, পরিহাসও করেছিলেন। তাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নি, কেননা আমার আদর্শের সমর্থন আমার নিজেরই মধ্যে,

বাইরেকার মাপকাঠির সাক্ষ্যকে স্বীকার করবার কোনো দরকারই ছিল না। সেদিন যে-কাব্যরূপের দর্শন পেলুম সে নিঃসন্দেহই কোনো-একটা বিষয় অবলম্বন করে এসেছিল, কিন্তু আনন্দ সেই বিষয়টিকে নিয়ে নয়; সেই বিষয়ের মধ্যে কোনো অসামান্যতা ছিল বলেই তৃপ্তি বোধ করেছি তাও নয়। আত্মশক্তিকে অনুভব করেছিলুম কোনো-একটি প্রকাশরূপের স্বকীয় বিশিষ্টতায়। সে-লেখাটি মোটের উপর নিতান্তই কাঁচা; আজকের দিনে তা নিয়ে গৌরব করতে পারি নে। সেদিন আমার যে-বয়স ছিল আজ সে বয়সের যে-কোনো বালক কবি তার চেয়ে অনেক ভালো লিখতে পারেন। তখনকার কালের ইংরেজি বা রাশীয় বিশেষ একটা পদ্ধতির সঙ্গে আমার সেই লেখাটা খাপ খেয়ে গেল এমন কথা বলতে পারি নে। আজ পর্যন্ত জানি নে, কোনো একটা যুগ-যুগান্তরের কোঠায় তাকে ফেলা যায় কিনা। আমার নিজেরই রচনার স্বকীয় যুগের আরম্ভসংকেত ব'লে তাকে গণ্য করা যেতে পারে।

এই রূপসৃষ্টির আবির্ভাব একই কবির জীবনে বারবার ঘটে থাকে। রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ-আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে। আমার জীবনে, মানসী, সোনার তরী, ক্ষণিকা, পলাতকা আপন বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়েই উৎসব করেছে। সেই রূপের আনন্দেই রচনার বিষয়গুলি হয়েছে সার্থক। বিষয়গুলি অনিবার্য কারণে আপনিই কালোচিত হয়ে ওঠে। মানবজীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিক ভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে কিন্তু তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতির বদল হয়। মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে কালে বিস্তৃত হতে থাকে। আগে হয়তো কেবল ঋষি মুনি রাজা প্রভৃতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ কবিদের কাছে স্পষ্ট ছিল; এখন তার পরিধি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু, যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন্ কথাটা বলা হয়েছে তার উপরে ঝোঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দিই। ডারুয়িনের অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটা হয়তো মানবসাহিত্যে কখনো-না-কখনো বলা হয়েছে, জগদীশচন্দ্র বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের যে-স্বরূপটি দেখাচ্ছেন হয়তো মোটামুটি-ভাবে কোনো একটা সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে তার আভাস থাকতে পারে— কিন্তু তাকে সায়ান্স্ বলে না; সায়ান্সের একটা ঠাট আছে, যতক্ষণ সেই ঠাটের মধ্যে কোনো একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় ততক্ষণ তার বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নেই। তেমনি বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব হোক না কেন যতক্ষণ সে কোনো-একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র

বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে স্তব্ধ নয়। তার চলতি ধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই তা আবর্জনাকুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কাল্চারের লক্ষণ বলে মানি। চলতি স্রোতে যা-কিছু সব-শেষে আসে তারই যে সব-চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুব রূপ পায়, এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এই জন্যে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়— তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ-সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু, দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি, তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী, যেহেতু এটা আধুনিক। সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনই প্রকাশ পায় যখনই দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকালকার দিনে য়ুরোপে নানা কারণে তার ধর্ম সমাজ লোকব্যবহার স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত বেশি নাড়া খাওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না হলে তার বাঁচাও নেই। এই একান্ত উৎকণ্ঠার দিনে এই সমস্যার দল বাছবিচার করতে পারছে না। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেমন প্রয়োজনের দায়ে গৃহস্থের ঘর ও ভাণ্ডার দখল করে বসে, তেমনি প্রব্লেমের রেজিমেন্ট্ তাদের নিজের বারিক ছাপিয়েও সাহিত্যের সর্বত্রই ঢুকে পড়ছে। লোকে আপত্তি করছে না, কেননা সমস্যাসমাধানের দায় তাদের অত্যন্ত বেশি। এই উৎপাতে সাহিত্যের বাসা যদি প্রব্লেমের বারিক হয়ে ওঠে তবে এ প্রশ্ন মারা যায় যে, স্থাপত্য-কলার আদর্শে এই ঘরের রূপটি কী। প্রয়োজনের গরজ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানে রূপ জিনিসটা অবান্তর। য়ুরোপে সাহিত্যের সব ঘরই প্রব্লেমের ভাণ্ডারঘর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে; তাই প্রতিদিনই দেখছি, সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হয়ে আসছে। কিন্তু, এটা একটা ক্ষণকালীন অবস্থা— আশা করা যেতে পারে যে, বিষয়ের দল বর্তমানের গরজের দাবি ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে

দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বলতেই হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।

সভায় আমার বক্তব্য শেষ হলে পর অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ বললেন: কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্টতা ভাবের প্রগাঢ়তায় (intensity)। কবি টম্‌সন্ ঋতুবর্ণনাচ্ছলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, এইখানে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সঙ্গে তাঁর কাব্যবিষয়ের মিল আছে, কিন্তু পরস্পরের প্রভেদের কারণ হচ্ছে এই যে, টম্‌সনের কবিতায় কাব্যের বিষয়টির গভীরতা নেই, বেগ নেই, ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সেটি আছে।

আমি বললুম: তুমি যাকে প্রগাঢ়তা বলছ সেটা বস্তুত রূপসৃষ্টিরই অঙ্গ। সুন্দর দেহের রূপের কথা যখন বলি তখন বুঝতে হবে, সেই রূপের মধ্যে অনেকগুলি গুণের মিলন আছে। দেহটি শিথিল নয়, বেশ আঁটসাট, তা প্রাণের তেজে ও বেগে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্পদে তা সারবান, ইত্যাদি। অর্থাৎ এইরকমের যত্‌গুলি গুণ তার বেশি তার রূপের মূল্যও তত বেশি। এই-সব গুণগুলি একটি রূপের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ঐক্য পায় তখন তাতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। নাইটিঙ্গেল পাখিকে উদ্দেশ করে কীট্‌স্ একটি কবিতা লিখেছেন। তার মাঝখানটায় মানবজীবনের দুঃখতাপ ও নশ্বরতা নিয়ে বিশেষ একটি বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, সেই বেদনার তীব্রতাই কবিতার চরম কথা নয়; মানবজীবন যে দুঃখময়, এই কথাটার সাক্ষ্য নেবার জন্যে কবির দ্বারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই— তা ছাড়া, কথাটা একটা সর্বাঙ্গীণ ও গভীর সত্যও নয়—কিন্তু এই নৈরাশ্যবেদনাকে উপলক্ষ্যমাত্র করে ঐ কবিতাটি যে একটি বিশেষ রূপ ধরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেইটেই হচ্ছে ওর কাব্য-হিসাবে সার্থকতা। কবি পৃথিবী সম্বন্ধে বলছেন—

Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs;
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs;
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow.

একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে— তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান কবিতা।

যে ভাবটিকে নিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সেটি কবিতাকে আকার দেবার একটা উপাদান।

দেবালয় থেকে বাহির হয়ে গোধূলির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুন্দরী চলে গেল, এই একটি তথ্যকে কবি ছন্দে বাঁধলেন—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনী মন্দিরবাহির ভেলি,
নবজলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম— সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল। আর-একজন কবি দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা করছেন। বিষয়-হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে, অন্নের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়— তাও যে পাত্রে করে খাবে এমন সম্বল নেই, মেজেতে গর্ত করে আমানি ঢেলে খায়— দরিদ্র-নারায়ণকে আর্তস্বরে দোহাই পাড়বার মতো ব্যাপার। কবি লিখলেন—

দুঃখ করো অবধান,
দুঃখ করো অবধান,
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।

কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু, সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না; ভাব ভাষা ভঙ্গী সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হল কিনা এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে'— দারিদ্র্যদুঃখের বিষয়-হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য; সেইটি অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করবার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়্দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু, পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তি-রূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গীতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর, সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে আমরা প্রশ্ন করব না; আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যক্ষ কোনো

একটি চারিত্ররূপ জাগ্রত করা হল কিনা। পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে : হে গুণী, কোন্ অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে।

১৩৩৫

সাহিত্যসমালোচনা

আমার দুটি কথা বলবার আছে। এক, আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে।[১] সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি। অনেক দিন এ সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করেছি, কখনো কোনো রিপোর্ট্ ঠিকমতো পাই নি। সেদিন নানা আলোচনার ভিতর সব কথা ঠিক ধরা পড়েছে কি না জানি নে। আর-একটা বিপদ আছে, কোনো-কিছু সম্বন্ধে যখন যে-কেউ রিপোর্ট নিতে ইচ্ছা করেন তাঁর নিজের মতামত খানিকটা সেটাকে বিচলিত করে থাকে। এটুকু জানিয়ে রাখছি যে, যদি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট্ বেরোয় আমাকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। তারও প্রয়োজন নেই, একটু সংযতভাবে চিত্তকে স্থির রেখে যদি লেখেন। এর দরকার আছে, কেননা এ সম্বন্ধে এখনও উত্তেজনা আছে— সেজন্য অল্পমাত্র যদি বিকৃতি ঘটে তা হলে অন্যায় হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমি সতর্ক করতে চাই, ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নাই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর-এক পক্ষে আছে। এরকম ভাবে তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হব। বর্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক বা না হোক, আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি নে। লোকমতের কী মূল্য আজকের দিনে আমার বুঝবার মতো বয়স হয়েছে। অল্প বয়স যখন ছিল তখন অবশ্য বুঝি নি, তখন লোকমতকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতাম। অন্যের মত-অনুযায়ী লিখতে পারলে, অন্যকে অনুকরণ করতে পারলে, সত্য কাজ কিছু করা গেল কল্পনা করেছি— সে যে কত বড়ো অসত্য, বারবার, হাজার বার তা প্রমাণ হয়ে গেছে আমার এই জীবনে। আমি তার উপর বিশেষ কোনো আস্থা রাখি না। আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, এখন আমার চেয়ে ভালো লিখতে পারুন বা না পারুন, সে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

আমি সেদিন যে-আলোচনা উত্থাপিত করেছিলাম সে-প্রসঙ্গে আমার মত আমি

১ বাংলার কথা। ৬ চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৪

ব্যক্ত করেছি। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে, যা বক্তব্য সে আমার লেখায় বারবার বলেছি। গত বারে সে কথা কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম কিম্বা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে লিখি নি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম-বিগর্হিত মনে হয়েছিল। তাতে সমাজধর্মের যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে, সমাজরক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন ; আমি সে-দিক থেকে কখনো আলোচনা করি নি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়— তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।

সংসারধর্মে মানবচরিত্রে সত্যের সেই-সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েছেন, যাকে তাঁরা সর্বকাল ও সর্বজনের কাছে ব্যক্ত করবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন। যার মধ্যে তাঁরা সৌন্দর্য দেখেছেন, মহিমা দেখেছেন, তাই তাঁদের রচনার আনন্দকে জাগিয়েছে। বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন, এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে, এমন কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্‌ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। কলাবান বাক্য যে-বিষয়কে প্রকাশ করে তাকে আপন অলংকারের দ্বারা স্থায়ী মূল্য দেয়। সেকালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড়ো ছবি এঁকেছেন এবং তাতে মানুষকে বড়ো দেখে মানুষ আনন্দ পেয়েছে। আমাদের মনের ভিতর যে-সব বেদনা, যে-সব আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আমরা যাকে অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি, সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাই না ব'লে বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, পূজা করতে পারি না, অর্ঘ্য দিতে পারি না। আমাদের সে-সম্পদ নেই, আমরা মন্দির রচনা করতে জানি না, যাঁরা রচনা করেন ও যাঁরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের পূজা সেখানে দিই। বড়ো বড়ো জাতি সাহিত্যে বড়ো বড়ো পূজার জন্যে আমাদের অবকাশ রচনা করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করে তাঁদের কাছে

কৃতজ্ঞ হয়েছে। সমাজের প্রভাতকালে প্রকাণ্ড একটা বীরত্বদৃপ্ত প্রাণসম্পদপূর্ণ মনুষ্যত্বের আনন্দময় চিত্র মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে কবিরা রচনা করতে বেরিয়েছেন। অনেকসময় সমাজের পাথেয় নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং বাইরের নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। এইজন্য যেটা মানুষের সভ্যতার অতি-পরিণতি তাতে বিকৃতি আসে, এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েছি। অবসাদের সময়ে কলুষটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেহপ্রকৃতিতে অনেক রোগের বীজ আছে। শরীরের সবল অবস্থায় সেগুলি পরাহত হয়েই থাকে। এমন নয় যে তারা নেই। তাদের পরাভূত করে আরোগ্যশক্তি অব্যাহত থাকে। যে-মুহূর্তে শরীর ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হয়, দুর্বল হয়, তখনই সেগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ইতিহাসেও বারংবার এটা দেখেছি। যখন কোনো-একটা প্রবৃত্তি বা মনের ভাব প্রবল হয় তখন তার প্রবলতাকে চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস না করে থাকতে পারি না, তাকে একান্তভাবে অনুভব করি ব'লেই। সেই অনুভূতির জোরে প্রবৃত্তিকে নিয়ে আমরা বড়াই করতে শুরু করি। এইজন্য এক-একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতি-গুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজিসাহিত্যের ভিতর যখন অত্যন্ত একটা কলুষ এসেছিল সে উদ্ধত হয়েই নির্লজ্জ হয়েই আপনাকে প্রকাশ করেছিল। তার পর আবার সেটা কেটে গেছে। ফরাসীবিপ্লবের সময় ইংরেজ কবিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কথা বলেছেন; প্রচলিত সমাজনীতি, প্রচলিত ধর্মনীতিকে গুরুতর আঘাত করেছেন। মানুষের মনকে কর্মকে মোহমুক্ত করে পূর্ণতা দান করবার জন্যে তাঁদের কাব্যে সাহিত্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেছে। তখনকার সমাজে তাঁদের কাব্য নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু কালের হাতে তার সমাদর বেড়ে গেল। এ দিকে বিশেষ কোনো যুগে যে-সব লালসার কাব্যকীর্তন প্রকাশিত হয়েছিল তারা সেকালের বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পেয়েছে; মনে হয়তো হয়েছিল, এইটেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। তবু পরে প্রকাশ পেয়েছে, এ জিনিসটা সেই যুগের ক্ষণকালীন উপসর্গ।

আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে। যখন সংস্কৃত-সাহিত্যে সাধনার দৈন্য এসেছিল তখন কাব্যে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিল সেগুলিতে বীর্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথযাত্রার পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই

মনে তার জন্যে যে-আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই— তাকে সংসারযাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ মহৎ থাকে এবং এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায়, ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাক্, তার বিনাশ নেই। য়ুরোপীয় জাতির ভিতর যে-অস্বাস্থ্য রয়েছে তার প্রতিকারও তাদের মধ্যে আছে। যেখানে স্বাস্থ্যের প্রবলতা সেখানে রোগও আপাতত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মানুষ বাঁচে। দুর্বল শরীরে তার প্রকাশ হলে সে মরে।

আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে। আমাদের সমস্ত চিত্তকে ও শক্তিকে জাগরূক করে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তা হলেই আমরা বাঁচব। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব। আমাদের মজ্জার ভিতর জীর্ণতা; এইজন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যেটা তপস্যার দান সেটাকে যেন আমরা নষ্ট না করি, তপোভঙ্গ যেন আমাদের না হয়। মানবজীবনকে বড়ো করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড়ো শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা যেন রক্ষা করি। সংকীর্ণতা প্রাদেশিকতার দ্বারা সে-শক্তিকে আমরা খর্ব করব না। এ জন্যে আমাদের অনেক লড়াই করতে হবে। সে লড়াই করতে না পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্য পাব। যে-আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড়ো শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি, সেটা পুরানো ফ্যাশন, এখন তার সময় গেছে, তা হলে আমাদের মৃত্যু। যে-ফল এখনও পাকবার সময় হয় নি তার ভিতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন জাগে তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা বলে না মনে করেন।

যে-সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষসঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয়তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন, এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই, অসংযতভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই, আমি খুশি হব। মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করেন,

ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংযমের ভিতর দিয়েই করেন। কেউ যেন কখনও না বলেন, উন্মত্ততার দ্বারা পৃথিবীর উপকার করব।

যাকে শ্রদ্ধা বলে তা সৃষ্টি করে, অশ্রদ্ধা নষ্ট করে। যদি বলি, আমি বড়োকে শ্রদ্ধা করি না, তা হলে শুধু যে বড়োকে আঘাত করি তা নয়, সৃষ্টির শক্তিকে একেবারে নষ্ট করি, সেটা আমাদের পতনের কারণ হয়। যারা বিজয়ী হয়েছে তারা শ্রদ্ধার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে জয় করেছে। বড়ো বড়ো যুদ্ধে যে সকল সেনাপতিরা জিতেছেন তাঁরা হারতে হারতেও বলেছেন 'আমরা জিতেছি', কখনও হারকে স্বীকার করতে চান নি। সেটা উপস্থিত তথ্যের বিরোধী হতে পারে। হয়তো হেরেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা নিজেকে শ্রদ্ধা করেছেন, তার দ্বারা হারের ভিতর দিয়ে জয়কে সৃষ্টি করেছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত জাতির জয়সম্পদকে সৃষ্টি করা যায়। যখন দেখি, জাতির মনে অশ্রদ্ধা আসন পেতে মহৎকে অট্টহাসির দ্বারা বিদ্রূপ করতে থাকে, তখন সব-চাইতে বেশি আশঙ্কা হয়, তখন হতাশ হয়ে বলতে হয়, পরাভবের সময় এল। আমাদের সিদ্ধি সে তো দূরে রয়েছে, কিন্তু তার অগ্রগামী দূত যে-শ্রদ্ধা সেও যদি না থাকে তা হলে তার চেয়ে এমনতরো সর্বনাশ আর কিছু হতে পারে না।

আমার নিজের লেখাতে যেটা বিকৃত সেটার নজির দেখাতে পারেন, অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘকালের লেখার ভিতরে কখনও কলুষ লাগে নি, এ কথা বলতে পারব না। যদি বলি, যা কিছু লিখেছি সমস্ত শ্রদ্ধেয়, সমস্ত ভালো, অতবড়ো দাম্ভিকতা আর-কিছু হতে পারে না। অনেক রকমের অনেক লেখার মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে যেগুলি নিজের পক্ষ সমর্থন করে সেগুলিই যদি গ্রহণ করি তবে তার দ্বারা শেষ কথা বা সম্পূর্ণ কথা বলা হবে না।

আজকের সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়— ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে যাঁরা সাহিত্যের সত্যকে মনের ভিতর দেখতে পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের মনের কথা বলবেন, এই বিশ্বাসেই এই সভা আহ্বান করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁদের আছে তাঁরা সেটা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন। কোন্ নীতির ভিত্তির উপর সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, কোন্ সাহিত্য মানুষের কাছে চিরকালের গৌরব পাওয়ার যোগ্য, সেই সম্বন্ধে কারও কিছু বিশেষ ভাবে বলবার থাকে সেইটাই বলবেন, এই সংকল্প করেই আমি আপনাদের ডেকেছি। আমি কখনও মনে করি নি, আমার পক্ষের কথা বলে সকলের কথাকে চাপা দেব। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আমার উপর রাগ না করে আপনাদের মত সভায় ব্যক্ত করুন। আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন,

এ মত সেকেলে, পুরোনো, তা হলে সেটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে রাজি আছি। যে-মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি, সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন করুন। আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব। আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ উল্টা রকমের ব্যাপার হবে, এরকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন। সেদিন আপনাদের কেউ কেউ বললেন, আমার সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য নেই, সেটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় : সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।

রবীন্দ্রনাথ : সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন এক সময় আমাদের দেশে একান্নবর্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, অবস্থাপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, সে-পরিবর্তন যে কারণেই হোক— ধর্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশ স্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়— তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ পাকা করে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজন চলে যায়, অথচ নিয়ম শিথিল হতে চায় না। সমাজ অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে-কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আলগা হলেই সব নিয়মের জোর চলে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবি করলে সমাজ টিকতে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেক সময় তাকে বিদ্রূপ করে তার বিরুদ্ধবাক্য ব'লে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আয়ু অল্প নয়। রীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দু-সমাজে গোহত্যা পাপ বলে গণ্য, অথচ সেই উপলক্ষ্যে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ বলে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্বনাশ করেছে বলে শাস্তি দিই নে। সমাজ-ব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাধি যে-নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু, যে-সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত

সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না, ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনোকালে হতে পারে বলে মনে করি না।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়: কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান প্রেম আর ভূত মানি না, সাহিত্যে তার স্থান আছে কি।

রবীন্দ্রনাথ: এ কথা পূর্বে বলেছি। মানুষ যেখানে জয়ী হয়েছে সেখানে সে যা পেয়েছে তার বেশি দিয়েছে। ঐশ্বর্য বলতে এই বোঝায়, সে তার মূলধনের বাড়া। সেই ঐশ্বর্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্‌বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়। লোভ-ক্রোধের প্রবলতার মধ্যেও প্রকাশের শক্তি আছে। যুদ্ধের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে আপনাকে সে প্রকাশ করতে পারে। বর্বরতার মধ্যেও সাহিত্যের প্রকাশযোগ্য কিছু আছে, সেটা কলুষ নয়, সেটা তেজ, শক্তি। অনেক সময় অতি সভ্য জাতির প্রাণশক্তিতে শৈথিল্য যখন আসে তখন বাহির হতে বর্বরতার ক্রোধ ও হিংসা কাজে লাগে। অতিসভ্য জাতির চিত্ত যখন ম্লান হয়ে আসে, চিরকালের জিনিস সে যখন কিছু দিতে পারে না, তখন তার দুর্গতি। গ্রীস যখন উন্নতির মধ্যগগনে ছিল তখন সে চিত্তেরই ঐশ্বর্য দিয়েছে, কামনা বা লালসার আভাস সেই সঙ্গে থাকলেও সেটা নগণ্য। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পঙ্কিলতা প্রকাশ পায় এও সেইরূপ। স্রোত ক্ষীণ হয়ে পাঁক বড়ো হলেই বিপদ।

একজন প্রশ্ন করলেন: আপনি সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের কথা বললেন। সমালোচনারও এরকম কোনো আদর্শ আছে কি না। সাহিত্য-সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয় তা হলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কি না।

রবীন্দ্রনাথ: এটা সাহিত্যিক নীতি-বিগর্হিত। যে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা— এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না— অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়। সুবিচার করতে হলে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত

সেটা রক্ষা করে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হলে সে মতের প্রভাব অনেক বেশি হয়। বিচারশক্তির প্রেস্‌টিজ শাসনশক্তির প্রেস্‌টিজের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের গভর্মেণ্টের কোনো কোনো ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তার মতে শাসনের প্রবলতা প্রমাণ করবার জন্যে মারের মাত্রাটা ন্যায়ের মাত্রার চেয়ে বাড়ানো ভালো। আমরা বলি, সুবিচার করবার ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।

সজনীকান্ত দাস: এখানে যে-আলোচনা হচ্ছে সেটা সম্ভবতঃ 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই?

রবীন্দ্রনাথ: হাঁ, 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই কথা হচ্ছে।

ইহার পর 'শনিবারের চিঠি'র আদর্শ, 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা'র আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক ও সামাজিক doctrine, তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা আদপে সাহিত্য কি না, ইত্যাদি বিষয়ে নানা ভাবের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,, শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা পর পর লিখিত হইল।

মণিমুক্তা সম্বন্ধে

যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে

যে-জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না। যেমনতরো কোনোসময় বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।

ঈশ্বরকে মানি নে, ভালবাসা মানি নে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেছি, এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না, সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়। ভালোবাসা মানছি না,

অতএব যারা ভালোবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এ কথা বলে লাভ কী।

'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা সম্বন্ধে

'শনিবারের চিঠি' যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হলে বেশি ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। যদি একান্তভাবে দোষ নির্ণয় করবার দিকে সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করি তা হলে সেটা মাথায় চেপে যায়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে। 'শনিবারের চিঠি'তে এমন সব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা দেখেছি যাঁরা সাহিত্যিক নন এবং জনগণের মধ্যেও যাঁদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে অতি প্রকট করে যে সব ছবি আঁকা হয় তাতে না সাহিত্যের না সমাজের কোনো উপকার ঘটে। এর ফল হয় এই যে, যেখানে সাধারণের হিতের প্রতি লক্ষ্য করে লেখকেরা কঠিন কথা বলেন তার দাম কমে যায়। মনে হয়, কঠিন কথা বলাতেই লেখকের বিশেষ আনন্দ, তাঁর লক্ষ্য যেই হোক আর যাই হোক।

কর্তব্যপালনের যে অবশ্যম্ভাবী কঠোরতা আছে নিজেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্যসংস্কার কার্যে তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে— কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্তভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্রচিকিৎসায় অস্ত্রচালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেননা আরোগ্যবিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটুমাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়। প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা করে 'শনিবারের চিঠি' যদি কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবি করি। কর্তব্য যেখানে বড়ো সেখানেই তার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শুচি রক্ষার প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্যের doctrine সম্বন্ধে পুনরায়

কেবলমাত্র না-মানার দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু ভগবান প্রেম আর ভূত কেন তোমরা আরও অনেক কিছু না মানতে পার। যেমন, হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসা। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে যদি সে কথাও লিখতে তা হলে বুঝতেম সেটাতে সাহিত্য-বহির্বর্তী বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য-আলোচনায় যদি বল, অনেকে বলে ভীমনাগের সন্দেশ ভালো, আমি বলি ভালো নয়, তার দ্বারা সাহিত্যিক সাহসিকতা বা অপূর্বতার প্রমাণ হয় না।

সর্বশেষে

অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কেউ লিখতে পারে না। তোমরা বলতে পার, দরিদ্রের মনোবৃত্তি আমি বুঝি না, এ কথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। তোমরা যদি বল, তোমাদের সাহিত্যের বিশেষত্ব দারিদ্র্যের অনুভূতি, আমি বলব সেটা গৌণ। তোমরা যদি সর্বদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 'দরিদ্রনারায়ণ' 'দরিদ্রনারায়ণ' কর তাতে ক'রে এমন একটা বায়ুবৃদ্ধি হবে যাতে সাধারণ পাঠকেরা দরিদ্রনারায়ণ বললেই চোখের জলে ভেসে যাবে। তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিকপত্রে বল, আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব গরিবের জন্যে কাঁদব। এরকম ভঙ্গিমাবিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। 'গরিবিয়ানা' 'দরিদ্রিয়ানা'কে সাহিত্যের অলংকার করে তুলো না। ভঙ্গী মাত্রেরই অসুবিধা এই যে, অতি সহজেই তার অনুকরণ করা যায়— অল্পবুদ্ধি লেখকের সেটা আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে, এইবার গরিবের কথা পড়া যাক। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত করে তোমরা নিজেদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকা উচিত যে, আমি যা লিখছি 'গরিবিয়ানা' বা 'যুগ' প্রচার করবার জন্য নয়, একমাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি। এ কথা বললেই লেখক যথার্থ সাহিত্যিকের আসন পায়। উপসংহারে এ কথাও আমি বলে রাখতে চাই, তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে প'ড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্‌কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।

১৩৩৫

পঞ্চাশোর্ধ্বম্

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে সরে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেছেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ঘড়িধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তরপরিণতি জীবনের ধর্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবনযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের ফসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন করে দিলেই হল না। শাস্ত্র বলে, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান— সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্মল জলের দাক্ষিণ্য, সেই পূর্ণতার সুযোগেই জলদানের পুণ্য; দৈন্য যখন এসে তাকে তলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ঘোলা হয়ে ওঠে। তখন এ কথা যেন প্রসন্ন মনে বলতে পারি যে, থাক্, আর কাজ নেই।

বর্তমান কালে আমরা বড়োবেশি লোকচক্ষুর গোচরে। আর পঞ্চাশবছর পূর্বেও এত বেশি দৃষ্টির ভিড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না-করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করত, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিল না। মনু যে 'বনং ব্রজেৎ' বলেন, সেই ছুটি নেবার বনটা হাতের কাছেই ছিল; আজ সেটা আগাগোড়া নির্মূল। আজ মন যখন বলে 'আর কাজ নেই', বহু দৃষ্টির অনুশাসন দরজা আগলে বলে 'কাজ আছে বই কি'— পালাবার পথ থাকে না। জনসভায় ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে; পাশ কাটিয়ে চুপি-চুপি সরে পড়বার জো নেই। ঘরজোড়া বহু চক্ষুর ভৎর্সনা এড়াবে, কার সাধ্য? চারি দিক থেকে রব ওঠে, 'যাও কোথায় এরই মধ্যে?' ভগবান মনুর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

যে কাজটা নিজের অন্তরের ফরমাশে তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোনো দায় নেই। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবি দুর্বার। যে-মাছ জলে আছে তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেছে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য করেই হোক, ছল করেই হোক, রাগের ঝাঁজে হোক, অনুরাগের ব্যথায় হোক, যোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে-সে যখন-তখন যাকে-তাকে বলে উঠতে পারে, 'তোমার রসের জোগান কমে আসছে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ

ফিকে হয়ে এল।' তর্ক করতে যাওয়া বৃথা; কারণ শেষ যুক্তিটা এই যে, 'আমার পছন্দ-মাফিক হচ্ছে না।' 'তোমার পছন্দের বিকার হতে পারে, তোমার সুরুচির অভাব থাকতে পারে' এ কথা বলে লাভ নেই। কেননা, এ হল রুচির বিরুদ্ধে রুচির তর্ক; এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শান্তির কটুত্ব কমাবার জন্যে সবিনয় দীনতা স্বীকার করে বলা ভালো যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস; অতএব শক্তির পূর্ণতাকালে যে-উপহার দেওয়া গেছে তারই কথা মনে রেখে, অনিবার্য অভাবের সময়কার ত্রুটি ক্ষমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্লান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে দুয়ো দেয়। আপন নবশ্যামল ধানের খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না আষাঢ়ে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্যসমারোহের কথা।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবি প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও পূর্বকৃত কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভদ্ররীতি আছে। পেন্‌শনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু, সাহিত্যেই পূর্বের কথা স্মরণ ক'রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই ক্ষমা করতে চায় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ত্রুটি প্রমাণ ক'রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব করবার জন্যে তাদের উত্তপ্ত আগ্রহ। শোনা যায়, কোনো কোনো দেশে এমন মানুষ আছে যারা তাদের সমাজের প্রবীণ লোকের শক্তির কৃশতা অনুমান করলে তাকে বিনা বিলম্বে চালের উপর থেকে নিচে গড়িয়ে মারে। মানুষকে উচ্চ চালের থেকে নিচে ভূমিসাৎ করবার ছুতো খুঁজে বেড়ানো, কেবল আফ্রিকায় নয়, আমাদের সাহিত্যেও প্রচলিত। এমনতর সংকটসংকুল অবস্থায় জনসভার প্রধান আসন থেকে নিষ্কৃতি লওয়া সংগত; কেননা, এই প্রধান আসনগুলোই চালের উপরিতল, হিংস্রতা-উদ্‌বোধন করবার জায়গা।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র সাহিত্যের কৃতিত্বকে কোনো মানুষের পক্ষেই চরম লক্ষ্য বলে মানতে চায় না। একদা তাকে অতিক্রম করবার সাধনাও মনে রাখতে হবে। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্মের জন্যে প্রস্তুত হতে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তার পরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে আরও পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবি মাঝখানটাতে; আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মানুষ কর্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হয়েছে, কর্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্যে মানুষকে কাজ করতে হবে, নিজের জন্যে মানুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম করতে করতে কর্মের অভ্যাস কঠিন হয়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্মের চলতি স্রোত আপন বালির বাঁধ আপনি বাঁধে, আর সেই বন্ধনের অহংকারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই। এমনি করে ধর্মতন্ত্র যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর পাকা করে আপন সীমা নিয়েই গর্বিত হয়, তেমনি সকল প্রকার কর্মই একটা সাম্প্রদায়িকতার ঠাট গড়ে তুলে সেই সীমাটার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা ও ঘোষণা করতে ভালোবাসে।

সংসারে যতকিছু বিরোধ এই সীমায় সীমায় বিরোধ, পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা বিদ্বেষ ও চিত্তবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম হতে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা ভাগ আছে যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর-একটা ভাগ আছে যেখানে সাহিত্যের পণ্য আমরা বাহিরের হাটে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এমন দিন আসে যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো; নইলে বাইরে ওড়ে ধুলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কনুয়ের ঠেলা গায়ে প'ড়ে পাঁজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যলোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেককাল দেখি নি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প; এইজন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরুষতা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয়মহলে যে-কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনোদিন লঙ্ঘন করব বা করতে পারব, এমন কথা মনেও করি নি। তখন এমন কিছু লিখি নি যার জোরে গৌরব করা চলে, অথচ এই শক্তিদৈন্যের অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটুকাটব্য শুনতে হয় নি যাতে সংকোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ করে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চলেছে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা করেছি। তবু যতই করি-না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই

এই সীমাটি দুই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর-একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না-জেনে আমরা এক দিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্য দিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে-পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাবনিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে বসে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিত্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারই আয়োজন করা গেছে তার একটা জবাবদিহি আছে।

কখন কালের পরিবর্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি নি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায় তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে; তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বলছি কালের আসন সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মানতে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকারপ্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা করতে বাধা লাগে, সহসা বুঝতে পারি নে—সেও এসেছে বর্তমানের শিখর অধিকার করে চিরকালের আসন জয় করে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে, গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন ক'রে চলে, পথনির্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সংকুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক থেকে দক্ষিণ-হাওয়া চলতে শুরু করে। কিন্তু, বদলের হাওয়া বইল বলেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব আছে, যে-অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বলবার উপলক্ষ খোঁজে তার মন সংকীর্ণ, তার স্বভাব রূঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারি আসর জমেছিল, নবদ্বীপের কীর্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই

ব'লে দরবারি তোড়িকে গ্রাম্যভাষায় গাল পাড়তে বসা বর্বরতা। নূতন কালকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারি তোড়ির নিত্য আসন আপন মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে যদি খাটো করতে চায় তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুত নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ করতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছে কি না।

কিন্তু, নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কী সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না, কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। হয়তো কোনো আশু উত্তেজনা, বাইরের কোনো আকস্মিক মোহ, তার অন্তর্গূঢ় নীরব আবেদনের উল্টো কথাই বলে; হয়তো হঠাৎ একটা আগাছার দুর্দমতা তার ফসলের খেতের প্রবল প্রতিবাদ করে; হয়তো একটা মুদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয়তো বাহাবা মেলে, কিন্তু সর্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চললেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যাঁরা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে, য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্টোরিয়া-যুগ জুড়ে সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমনভাবে চলেছিল যে মনে হয়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারি দিকে আবর্তিত হয়ে প্রাগ্রসর উদ্যমকে যেন নিরস্ত করে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে, একটা অধৈর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সবকিছু উলট-পালট করবার জন্য কোমর বাঁধল, গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠল 'আর ভালো লাগছে না'। যা-করে হোক আর-কিছু-একটা ঘটা চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব মনুর বিধান মানতে চায় নি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্মত্ত চরগুলো একটি একটি করে তার অঙ্গনে ক্রমে জুটতে লাগল; ভাবখানা এই যে, উৎপাত করে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতায় ঐশ্বর্যের অঙ্কপাত

নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চলছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাঁধা, এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা লোহার সিন্ধুকগুলোকে কোনো-কিছুতে নড়্‌চড়্‌ করতে পারবে, এ কথা সে ভাবতেই পারে নি। এইজন্য একঘেয়ে উৎকর্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য চাঞ্চল্যকে সে-দিনের মানুষ ঐ লোহার সিন্ধুকের ভরসায় দমন করবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল। একদিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিন্ধুকে সিন্ধুকে ভয়ংকর মাথা-ঠোকাঠুকি; বহুদিনের সুরক্ষিত শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধুলোয় ধুলোয় ছড়াছড়ি; সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্তে হল ভূমিসাৎ। পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালু বেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে পড়ল, তাড়াহুড়ো বেধে গেল, গোলমাল চলছে— সাবেক কালের কর্তাব্যক্তির ধমকানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ংকর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোনো-কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হয়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি শুরু হল। কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে 'ভালো মানুষের মতো থামো,' কেউ বলে 'মরীয়া হয়ে চলো'। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে যাঁরা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ করছেন তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত করে বলতে পারে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে, যে-যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হয়ে বসে ছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটাকম্বল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো সে তর্ক তুলে ফল নেই; আপাতত এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে নব নব প্রণালীর প্রবর্তন করতে বসল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্ছে না ব'লে যারা উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে তারাও ঐ পঞ্চাশোর্ধ্বের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বলছিলেম, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্ধ্বম্‌ আছে, কালগত হিসাবেও তেমনি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম করে থাকি তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মথিত হয়ে উঠবে। নবাগত যাঁরা তাঁরা যে-পর্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ না করবেন সে-পর্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত

হবে। পুরাতনকে অতিক্রম করে নূতনকে অভূতপূর্ব করে তুলবই, এই পণ করে বসে নবসাহিত্যিক যতক্ষণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি টানাটানি করতে থাকবেন, ততক্ষণ সেই অতিমাত্র উদ্‌বেজনায় ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব হয়ে উঠবে।

যেটাকে মানুষ পেয়েছে সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করতে পারে নি, সাহিত্যে কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মারলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ করে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায় যাতে সে মনোহর হয়ে ওঠে, এমন পরিস্ফুট মূর্তি ধরে যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কাজ করতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ করে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে-আদর্শ কামনা করেছে তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হয়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলাসাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলাদেশের মেয়েপুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে; এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্বকালবর্তী ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। যা আমাদের ভালো লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভালো-লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে-যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার

সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ-পর্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর-ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ বলছেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েছে। কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিত করে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু, সংবাদটা যদি সত্যই হয় তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত তাঁদের ঘোষণাবাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যুষের সুনির্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা নয়। রাত্রির চন্দ্রকে যখন বিদায় করবার সময় আসে তখন কুয়াশার কলুষ দিয়ে তাকে অপমানিত করবার প্রয়োজন হয় না, নবপ্রভাতের সহজ মহিমার শক্তিতেই তার অন্তর্ধান ঘটে।

পথে চলতে চলতে মর্তলীলার প্রান্তবর্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র সসংকোচে 'তরুণসভায়' প্রেরণ করলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখনকার দিনের সঙ্গে নাই মেলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ করবেন— কোনো হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর্দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই; তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোধ্বং নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।

অবশেষে যাবার সময় বেদমন্ত্রে এই প্রার্থনাই করি— যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আসুব: যাহা ভদ্র তাহাই আমাদের প্রেরণ করো।

১৩৩৬

বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

একদিন কলিকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী; সেখানে বসল বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।

এই উপলক্ষ্যে বর্তমান যুগের বেগমান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান

যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

এক দিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্যমানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্য দিকে পূর্বপশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্যসংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্যসংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা— নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে— সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানব-লোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণন করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম স্থূল যতকিছু রহস্যকে অবারিত করছে। তার অন্তহীন জিজ্ঞাসাবৃত্তি প্রয়োজন অপ্রয়োজনে নির্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদানসংগ্রহে নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গীকে যথাযথ, অত্যুক্তিবিহীন, এবং কৃত্রিমতার-জঞ্জাল-বিমুক্ত করে তোলে।

এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থ ই গৌরব করতে পারে। সজল মেঘ নীলনদীর তট থেকেই আসুক আর পূর্বসমুদ্রের বক্ষ থেকেই বাহিত হোক, তার বর্ষণে মুহূর্তেই অন্তর থেকে সাড়া দেয় উর্বরা ভূমি— মরুক্ষেত্র তাকে অস্বীকার করার দ্বারা যে অহংকার করে সেই অহংকারের নিষ্ফলতা শোচনীয়। মানুষের চিত্তসম্ভূত যাকিছু গ্রহণীয় তাকে সম্মুখে আসবামাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে-মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।

প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছে। সেটা

ধার-করা সাজসজ্জার মতোই তাকে অস্থির করে রাখলে, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হয়ে রইল। ইংরেজিসাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার তখন ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তগম্য, সেই কারণেই এই সংকীর্ণশ্রেণীগত ইংরেজি-পোড়োর দল নূতনলব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন।

কথায়-বার্তায় পত্রব্যবহারে সাহিত্যরচনায় ইংরেজিভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীন্যের লক্ষণ। বাংলাভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত ও বাংলা-পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন যার হাঁটুজলে পাড়াগেঁয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।

তবু এ কথা মানতে হবে, এই অহংকারের মূলে ছিল পশ্চিম-মহাদেশ হতে আহরিত নূতন-সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি। সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কেননা, তাঁদের পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেককাল মনের জমি ঠিকমতো চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন; তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেরি করলে না। পূর্বকালের থেকে তার বর্তমান অবস্থার যে-প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। সেদিন তিনি যে বাংলাভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে-ভাষার পূর্ব-পরিচয় এমন-কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহ ভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত। বাংলাভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির স্তরের মতো। এই অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনার ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।

এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অগম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর-মিল্‌টন-রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজলনীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে

আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে-যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর স্বরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু, তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য 'রাজবদ্বন্নত-ধ্বনি'— কিন্তু, তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগে নি। অথচ এর অনতিপূর্বকালবর্তী সাহিত্যের যে-নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে।

আমি জানি, এখনও আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা সেই পুরাতনকালের অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশনাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা ভান মাত্র। তাঁরা যে স্বয়ং যথার্থতঃ সেই সাহিত্যেরই রসসম্ভোগে একান্ত নিবিষ্ট থাকেন, রচনায় বা আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূনির্মাণের কোনো এক আদিপর্বে হিমালয়পর্বতশ্রেণী স্থিতিলাভ করেছিল, আজ পর্যন্ত সে আর বিচলিত হয় নি; পর্বতের পক্ষেই এটা সম্ভবপর। মানুষের চিত্ত তো স্থাণু নয়; অন্তরে বাহিরে চার দিক থেকেই নানা প্রভাব তার উপর নিয়ত কাজ করছে, তার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর; সে যদি জড়বৎ অসাড় না হয় তা হলে তার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটবেই, ন্যাশনাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো-একটি সুদূর ভূতকালবর্তী আদর্শবন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে ন্যাশনাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব করা বিড়ম্বনা। সাহিত্যে বাঙালির মন অনেক কালের আচারসংকীর্ণতা থেকে অবিলম্বে মুক্তি যে পেয়েছিল, তাতে তার চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণ করেছে।

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃতভাণ্ডার

থেকে মধুসূদন নিঃসংকোচে যে-সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে-বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-রচনায় যে-রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলাভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না ; শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে— প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

মাইকেল সাহিত্যে যে-যুগান্তর আনলেন তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প তখন দেখেছি, কত যুবক ইংরেজিসাহিত্যের সৌন্দর্যে ভাববিহ্বল। সেক্‌স্‌পিয়র, মিল্‌টন, বায়্‌রন, মেকলে, বার্ক্‌ তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। অথচ তাঁদের সমকালেই বাংলাসাহিত্যে যে নূতন প্রাণের উদ্যম সদ্য জেগে উঠেছে, সে তাঁরা লক্ষ্যই করেন নি। সেটা যে অবধানের যোগ্য তাও তাঁরা মনে করতেন না। সাহিত্যে তখন যেন ভোরের বেলা কারও ঘুম ভেঙেছে, অনেকেরই ঘুম ভাঙে নি। আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে তখনও ঘোষিত হয়নি প্রভাতের জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশা।

বঙ্কিমের লেখনী তার কিছু পূর্বেই সাহিত্যের অভিযানে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তখন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই। যাঁরা তার রস পেয়েছেন তাঁরা তখনকার কালের নবীনা হলেও প্রাচীনকালীন সংস্কারের বাহিরে তাঁদের গতি ছিল অনভ্যস্ত। আর কিছু না হোক, ইংরেজি তাঁরা পড়েন নি। এ কথা মানতেই হবে, বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ কি বিষয়ে কি ভাবে কি ভঙ্গিতে পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেকালে ইংরেজিভাষায় বিদ্বান বলে যাঁদের অভিমান তাঁরা তখনও তাঁর লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি ; অথচ সে-লেখা ইংরেজি শিক্ষা-হীন তরুণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা পায় নি, এ আমরা দেখেছি। তাই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাবকে আর তো ঠেকানো গেল না। এই নব্য রচনারীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি-মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে— যেন অসূর্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন

প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হতে পারে কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে।

এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলাসাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র। ইংরেজি-ভাষায় যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন। নব্যসাহিত্যের হাওয়ায় তখনকার তরুণী পাঠিকাদের মনঃপ্রকৃতির যে পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা নিঃসন্দেহ। তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠছে, এইটেই তখনকার দিনের ব্যঙ্গরসিকদের প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠল। কথাটা সত্য। ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা। রোমান্টিকে মুক্ত ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিহার। সেখানে অনভ্যস্ত পথে ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটতে পারে। তাতে করে পূর্ববর্তী বাঁধা নিয়মানুবর্তনের তুলনায় বিপজ্জনক এমন-কি হাস্যজনক হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে। দাঁড় থেকে ছাড়া পাওয়া কল্পনার পায়ে শিকল বাঁধা না থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে হয়তো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোভনতায়। কিন্তু, বড়ো পরিপ্রেক্ষণিকায় ছড়িয়ে দেখলে দেখা যায়, অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি মোটের উপরে সকল-প্রকার স্খলনকে অতিকৃতিকে সংশোধন করে চলে।

যাই হোক, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গতিবেগ বাংলার ছেলেমেয়েকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে, এ সভায় তার আলোচনার উপলক্ষ্য নেই। এই সভাতেই বাংলাসাহিত্যের বিশেষ সফলতার যে প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে, সভার কার্যারম্ভের পূর্বে সূত্রধাররূপে আজ তারই কথা জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এমন একদিন ছিল যখন বাংলাপ্রদেশের বাইরে বাঙালি-পরিবার দুই-এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলাভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ— সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। বাঙালিচিত্তের যে-বিশেষত্ব মানব-সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালিজাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে-জমি আছে তার মাটিতে যদি বাঁধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ধ্বসে পড়ে। ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহাবৃক্ষ সেই মাটির গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে তা হলে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্র রক্ষা পায়। বাংলাদেশের চিত্তক্ষেত্রকে তেমনি

করেই ছায়া দিয়েছে, ফল দিয়েছে, নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলাসাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে-প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্যে। বাংলাদেশকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালি উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালির চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালি যত দূরে যেখানেই যাক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্বে বাঙালির ছেলে বিলাতে গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্ধাপূর্বক অবাঙালিত্বের আড়ম্বর করত, এখন তা নেই বললেই চলে— কেননা বাংলাভাষায় যে-সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু, মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না, সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালির পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশি যে, অন্য প্রদেশের বর্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাসংস্কৃতির সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্যপ্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয় অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলাভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ এবং শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অন্য দিকে। অথচ সে-সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি-হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয় আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তরপশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাই বলছি, আজ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন বাঙালির অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করছে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিক-গামী তটকে এক করে নেয়, আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ-প্রদেশের বাঙালির হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালি আপনাকে প্রকাশ করেছে ব'লেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই ব'লেই, যেখানে যাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না। এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারম্বার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

অথচ সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়। কিন্তু, সাহিত্যসাধনা যার, যোগীর মতো তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন 'বিরচিব মধুচক্র'। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের। মধুসূদন যেদিন মৌচাক মধুতে ভরছিলেন, সেদিন বাংলায় সাহিত্যের কুঞ্জবনে মৌমাছি ছিলই বা কয়টি। তখন থেকে নানা খেয়ালের বশবর্তী একলা মানুষে মিলে বাংলাসাহিত্যকে বিচিত্র করে গড়ে তুলল। এই বহু স্রষ্টার নিভৃত-তপো-জাত সাহিত্যলোকে বাংলার চিত্ত আপন অন্তরতম আনন্দভবন পেয়েছে, সম্মিলনীগুলি তারই উৎসব। বাংলা-সাহিত্য যদি দল-বাঁধা মানুষের সৃষ্টি হত তা হলে আজ তার কী দুর্গতিই ঘটত তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে। বাঙালি চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তার স্বাভাবিক আনন্দ— আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি সেই 'আনন্দাদ্ধ্যেব'। মানুষের সব-চেয়ে নিকটতম যে-সম্বন্ধবন্ধন বিবাহব্যাপারে, গোড়াতেই সেই বন্ধনকে অহৈতুক অপমানে জর্জরিত করবার বরযাত্রিক মনোবৃত্তিই তো বাংলা দেশের সনাতন বিশেষত্ব। তার পরে কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালিবর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্যে একদা ভিড় করে সমবেত হত, কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শত্রুতাবশতই যে তাদের সেই দুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, নিন্দার মাদক রসভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে। আজ বর্তমান সাহিত্যেও বাঙালির ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নিষ্ঠুর পীড়নৈপুণ্য সর্বদাই উদ্যত। সেটা আমাদের ক্রূর অট্টহাস্যোদ্বেল গ্রাম্য

অসৌজন্যসম্ভোগের সামগ্রী। আজ তো দেখতে পাই বাংলাদেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালি আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্তন করতে তার দেরি লাগত না— কিন্তু সাহিত্য যেহেতু কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্ট্‌স্টক্ কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, যেহেতু সে নির্জনচর একলা মানুষের, সেইজন্যে সকল প্রকার আঘাত এড়িয়ে ও বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিস ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয় নি। এই সাহিত্যরচনায় বাঙালি নিজের একমাত্র কীর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে ব'লেই এই নিয়ে তার এত আনন্দ। আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রে বাঙালি আজ এসেছে গৌরব করবার জন্যে। বিচ্ছিন্ন যারা তারা মিলিত হয়েছে, দূর যারা তারা পরস্পরের নৈকট্যে স্বদেশের নৈকট্য অনুভব করছে। মহৎসাহিত্যপ্রবাহিনীতে বাঙালিচিত্তের পঙ্কিলতাও মিশ্রিত হচ্ছে ব'লে দুঃখ ও লজ্জার কারণ সত্ত্বেও ভাবনার কারণ অধিক নাই। কারণ, সর্বত্রই ভদ্রসাহিত্য স্বভাবতই সকল দেশের সকল কালের, যা-কিছু স্থায়িত্বধর্মী তাই আপনিই বাছাই হয়ে তার মধ্যে থেকে যায়; আর-সমস্তই ক্ষণজীবী, তারা গ্লানিজনক উৎপাত করতে পারে কিন্তু নিত্যকালের বাসা বাঁধবার অধিকার তাদের নেই। গঙ্গার পুণ্যধারায় রোগের বীজও ভেসে আসে বিস্তর; কিন্তু স্রোতের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখতে পাই নে, আপনি তার শোধন এবং বিলোপ হতে থাকে। কারণ মহানদী তো মহানর্দমা নয়। বাঙালির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে-পরিচয় সৃষ্ট হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্বদেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে। বাঙালি সেই মহৎ প্রত্যাশাকে আজ আপন নাড়ীর মধ্যে অনুভব করছে বলেই বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে সম্মিলনী-আকারে পুনঃ পুনঃ বঙ্গভারতীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে প্রবৃত্ত। তার আশা সার্থক হোক, কালে কালে আসুক বাণীতীর্থপথযাত্রীরা, বাংলাদেশের হৃদয়ে বহন করে আসুক উদারতর মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে বাহিরে সকলপ্রকার বন্ধনমোচনের সাধনমন্ত্র।

১৩৪১

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাইবে। কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপিতে, সাময়িক পত্রে, এবং প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালে, এক রূপ পাঠ দেখা যায় না। প্রয়োজনবোধে, সেরূপ পাঠভেদ-সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য এখানে সংকলিত হইল। কোনো কোনো রচনার প্রসঙ্গ ধরিয়া কবির যে-সব প্রণিধেয় উক্তি পাওয়া যায় তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকতর পূর্ণাঙ্গ তথ্যসংকলন রচনাবলীর সর্বশেষ খণ্ডে পঞ্জী আকারে মুদ্রিত হইবে।]

প্রহাসিনী

'প্রহাসিনী' ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের 'খাপছাড়া' অংশ বাদ দেওয়া হইল। উক্ত কবিতা তিনটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর একবিংশ খণ্ডে 'খাপছাড়া' গ্রন্থের সংযোজনাংশে (৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় ১, ২, ৩ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য) ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী প্রদত্ত হইল—

আধুনিকা	প্রবাসী	১৩৪১ চৈত্র
নারীপ্রগতি	বিচিত্রা	১৩৪১ মাঘ
রঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪২ কার্তিক
পরিণয়মঙ্গল	বিচিত্রা	১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ
ভাইদ্বিতীয়া	প্রবাসী	১৩৪৩ পৌষ
ভোজনবীর	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ
গরঠিকানি	প্রবাসী	১৩৪৫ আশ্বিন
অনাদৃতা লেখনী	বিচিত্রা	১৩৪৪ বৈশাখ
পলাতকা	বিচিত্রা	১৩৪১ চৈত্র
গৌড়ী রীতি	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ

১৩৪১ সালের মাঘের 'বিচিত্রা'য় 'নারীপ্রগতি' কবিতাটি বাহির হইলে 'অপরাজিতা দেবী' রবীন্দ্রনাথকে অনুরূপ ছন্দে একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। 'আধুনিকা'

কবিতাটি তাহারই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাজিতা দেবীর উত্তর 'সে-কালিনী ও আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর ১৩৪১ সালে চৈত্রের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৮২৯-৩৪) একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

'রঙ্গ' কবিতাটি যে পুরাতন ছড়ার অনুকরণে লিখিত রবীন্দ্রনাথ তাহা 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত ছড়াটি নিম্নে আগাগোড়া মুদ্রিত হইল—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি।

উদ্‌ধৃত ছড়াটি সম্বন্ধে কৌতুকজনক বিস্তৃত আলোচনাও উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পৃ ৫৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য।

'পরিণয়মঙ্গল' কবিতাটি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জয়শ্রী দেবী ও শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের বিবাহ ('জয়া-মটরু-শুভসম্মিলন') উপলক্ষ্যে রচিত হয়।

বরাহনগরের শ্রীমতী পারুল দেবী রবীন্দ্রনাথকে নাতনিরূপে কয়েকবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ফোঁটা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন।[১] 'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতাটি ১৩৪৩ সালের (ইং ১৯৩৬) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্বাদস্বরূপ শ্রীমতী পারুল দেবীকে প্রেরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯৩৭ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আলোচ্য কবিতা-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয় নি। তবু বরানাগরিকাই অগ্রগণ্যা হয়ে রইল, এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান-স্বরূপে বড়ি দান করুন, এই আমার প্রত্যাশা।

—দেশ, ৯ মাঘ ১৩৪৯, পৃ ৩৬১

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর দৌত্যে রবীন্দ্রনাথ 'অপরাজিতা দেবী'র ১৬ জুন ১৯৩৮ তারিখের একটি কবিতায়-লেখা নাতিদীর্ঘ পত্র পান। পত্রটির শেষাংশে লেখিকা জানাইয়াছিলেন—

রবিরাগ জানি, কবি, বাদলেও ফিকা না—
তাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে ঠিকানা)।

'অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'গরঠিকানি' কবিতাটি উক্ত পত্রের জবাবে লিখিয়া নিম্নোদ্‌ধৃত 'পত্রদূতী' কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথ উহা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে পাঠান। ১৩৪৫ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৭৬০-৬৫) অপরাজিতা দেবীর 'নাৎনির পত্র' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পত্রদূতী' ও 'গর্-ঠিকানী' একত্র প্রকাশিত হয়।—

পত্রদূতী

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর প্রতি

গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার ছন্দে লিখেছে পত্র,
ছন্দেই তার ইনিয়ে-বিনিয়ে জবাব লিখেছি অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে প'ড়ে খামাখা অকাজে তোমারে দিলেম কষ্ট।

১ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র ('রবীন্দ্রনাথের চিঠি', দেশ: ২৪ পৌষ, ২ মাঘ ও ৯ মাঘ ১৩৪৯) দ্রষ্টব্য।

আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে মন যেন উড়ো পক্ষী,
বাদলা-হাওয়ায় কোথা উড়ে যায় অজানা কাদেরে লক্ষি।
ঠিকানা তাদের রঙিন মেঘেতে লিখে দেয় দূর শূন্য,
খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই হয় না তাহারা ক্ষুণ্ণ।
তাহাদের চিঠি আন্‌মনাদের আসে জানালার পার্শ্বে,
যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে— চিঠিখানি সবাকার সে।
উত্তর তার কখনো কখনো গেয়েছি আমারি ছন্দে,
গুঞ্জন তারি ছড়িয়ে গিয়েছে সিক্ত মাটির গন্ধে।
অচিন মিতার সাথে কারবার সে তো কবিদেরই জন্য,
সে অধরা দেয় সংগীতে ধরা, কিন্তু তারা যে অন্য।
জানা-অজানার মাঝখানটাতে নাৎনি করেছে সন্ধি,
কবির সাধ্য নাই তারে করে পোস্টাফিসের বন্দী।
মর্তের দেহে মেনে যে নিয়েছে বাঁধন পাঞ্চভৌত্য,
তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার চার পয়সার দৌত্যে?
জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু হাল খবরের অংশ,
হায় রে আয়ুতে খবরের কোঠা প্রায় হয়ে এল ধ্বংস।
সেদিন ছিলাম সাতাশ-আটাশ, আশি আজি সমাসন্ন,
আমার জীবনে এই সংবাদ সবার অগ্রগণ্য।

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ
৫ আষাঢ় ১৩৪৫

পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নিম্নোদ্‌ধৃত কয়েকটি বর্জিত ছত্র পাওয়া যায়—

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৪ পৃষ্ঠায় 'হিস্‌টিরিয়ায় পাওয়া' ছত্রটির পর

তলোয়ার থাকে সংক্ষেপে তার খাপে,
গদার গুরুতা শুধু তার মোটা মাপে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৪ পৃষ্ঠায় 'ছাপিয়ে যে ওর দাম' ছত্রটির পর

'রবি' নাম যদি বলি নাম নহে ওটা,
ললাটের 'পরে জয়তিলকের ফোঁটা,
তা হলে শোনাবে অহংকার সে কত,
'অপরাজিতা'ও নহে কি তাহারি মতো।

ঝগড়া বাধিয়ে এইখানে লিখি ইতি,
সন্দেহ করি, ভালো নহে এই রীতি—
শান্তিভঙ্গ করে দেবে এই ভাষা,
পুরো শান্তির চেয়ে তারি ’পরে আশা।

‘অনাদৃতা লেখনী’ কবিতার পঞ্চম হইতে দশম ছত্র পর্যন্ত অংশ ১৪ মাঘ ১৩৪৩ তারিখে স্বতন্ত্র আকারে প্রথম রচিত হয়। কবিতাটির ‘বিচিত্রা’য় প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩৪৪) প্রাক্তন পাঠে উক্ত ছয়টি ছত্র পাওয়া যায় না।

‘পলাতকা’ কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর উদ্দেশে রচিত। পাণ্ডুলিপিতে পত্রের আকারে উহার আরম্ভে সম্বোধন ‘বৃদ্ধা’, এবং পত্রশেষের স্বাক্ষর ‘দাদামশায়’। কবিতাটির ‘পুনশ্চ’ অংশ ‘দাদামশায়ের চিঠি’ নামে ১৯৩৬ নভেম্বরের ‘শ্রীহর্ষ’ পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘কাপুরুষ’ কবিতাটি, পাণ্ডুলিপি অনুসারে, শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে ‘কবিসম্রাট’ স্বাক্ষরে লেখা হইয়াছিল।

‘গৌড়ীরীতি’ কবিতাটি ১৩৩৯ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে নিম্নোদ্‌ধৃত সংক্ষিপ্ত আকারে ১৩৩৬ চৈত্রের ‘বিচিত্রা’য় (পৃ ৪৫৪) বিনা স্বাক্ষরে বাহির হয়—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় তার থলে,
লোকে তার ’পরে মহা রাগ করে হাতি দেয় নাই ব’লে।
বহু সাধনায় বিড়াল যে পায় ফুকারে সে “ওহো ওহো”,
বলে আঁখি মেজে, “যথেষ্ট এ যে, পরম অনুগ্রহ।”

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে ছটাক যদি বা কমে,
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের গালাগালি-বোল জমে।
সমুখে আসিয়া পকেট ঠাসিয়া স্তবের লম্বা দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দা-রোপণ— ধন্য ধন্য গৌড়।

কবিতাটির আরম্ভের দুই স্তবক বস্তুতঃ আরও কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা। ১৯২৬ সালে য়ুরোপ-প্রবাস-কালে বেলগ্রেড হইতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে যে-পত্র লেখেন, ১৩৩৮ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী-সংখ্যা ‘বাতায়ন’ হইতে তাহা এই প্রসঙ্গে মুদ্রিত হইল—

বেলগ্রেড,
৭ই নভেম্বর ১৯২৫[1]

কল্যাণীয়বরেষু

মণ্টু, তোমার চিঠিখানা পড়ে, খুব খুশি হলুম। সাধারণ তো আমাকে অহংকৃত এবং হৃদ্যতাবিহীন বলেই মনে করে। সেই জন্যেই জনসমাজে আমি যত প্রশংসা পেয়েছি তত প্রীতি পাই নি। আর সেই জন্তেই লোকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও যতটা পারে দাম কমাতে চেষ্টা করে। এর ঠিক কারণটা কী আমি তো ভালো বুঝতেই পারি নে। আমি যদি স্বভাবতই কঠিনহৃদয় ও স্নেহসম্পদে কৃপণ হতুম তা হলে কবি হতেই পারতুম না। অন্তরে যার রসের অভাব সে কখনোই রসসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু, যখন অনেক লোকের একই ধারণা হচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন বলতেই হবে যে, আমার মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে যাতে করে আমার দেশের লোক আমার হৃদয় স্পষ্ট দেখতে পায় না। সম্ভবত আমাদের দেশে হৃদয়াবেগ-প্রকাশের যে বিশেষ রীতি ও ভঙ্গী সাধারণে প্রচলিত আমার তা অভ্যাস নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমাদের পরিবার একঘরে, সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ঘটতেই পারে নি। দ্বিতীয়ত ছেলেবেলা থেকে আমি আমাদের পরিবারের কোণে কোণে অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা ভাবেই কাটিয়েছি। আমাদের আত্মীয়বন্ধুর পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ, তা ছাড়া আমাদের বাড়ির রীতি পদ্ধতি ব্যবহারে একটা স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে গেছে কেননা আমরা সমাজের বহির্বর্তী। এইজন্যে আমাদের দেশে আত্মীয়তা-প্রকাশের যে-সব গলাগলি কোলাকুলি ধরন আছে তাতে আমার হাত পাকে নি। এই-সব কারণে দেশে জনসাধারণ যদি আমাকে ভুল বোঝে সে আমার ভাগ্যের দোষ। কিন্তু, একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো। বঙ্কিম একদিন সাহিত্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু, আমি তো জানি তাঁর কাছে ঘেঁষতে কেউ সাহস করত না— আমরা কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর গা-ঘেঁষা হবার জো ছিল না। কিন্তু, আমার ঘরে চড়াও হয়ে উপদ্রব করতে না পারে এমন অপোগণ্ড বা নগণ্য ব্যক্তি তো বাংলাদেশে কেউ নেই। অথচ বঙ্কিমকে কেউ উদ্ধত বা কঠিনহৃদয় বলে নি। কেননা যাঁর কাছে কেউ সহজে কিছুই পায় না তাঁর অনুগ্রহের কণা পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু, যার কাছে কোনো বাধা নেই তার কাছেই দাবির ষোলো আনা পূরণ করতে না পারলে আট আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।

১ তারিখ সম্ভবতঃ— ১৭ নভেম্বর ১৯২৬

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে ভারি রাগ করে হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায় কালো বেড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে, 'দাতা বটে ষোলো আনা!'

—বাতায়ন, ১৩৩৮ রবীন্দ্রজয়ন্তী

'অটোগ্রাফ' কবিতাটি শ্রীমান অভিজিৎ চন্দের প্রতি 'দাদু' রবীন্দ্রনাথের স্নেহোপহার।

সংযোজন

'প্রহাসিনী'র রচনাবলী-সংস্করণে 'সংযোজন' অংশে বিভিন্ন সাময়িকপত্র হইতে সংকলন করিয়া কতকগুলি নূতন কবিতা যোগ করা হইল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতেও দুইটি কবিতা গ্রহণ করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলির প্রকাশকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র	ভারতী	১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন
পত্র	ভারতী	১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
সুসীম চা-চক্র	শান্তিনিকেতন	১৩৩১ শ্রাবণ
চাতক	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৫০ কার্তিক-পৌষ
নাতবউ	বিচিত্রা	১৩৩৮ অগ্রহায়ণ
মিষ্টান্বিতা	পরিচয়	১৩৪২ শ্রাবণ
নামকরণ	প্রবাসী	১৩৪৬ পৌষ
ধ্যানভঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৬ ভাদ্র
রেলেটিভিটি	অলকা	১৩৪৬ ভাদ্র
নারীর কর্তব্য	অলকা	১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
মধুসন্ধায়ী	প্রবাসী	১৩৪৭ বৈশাখ
মাছিতত্ত্ব	শনিবারের চিঠি	১৩৪৬ চৈত্র
কালান্তর	যুগান্তর	১৩৪৭ শারদীয়া সংখ্যা
তুমি	নিরুক্ত	১৩৪৭ আশ্বিন
মিলের কাব্য	কবিতা	১৩৪৭ চৈত্র
মশকমঙ্গল গীতিকা	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৭ অগ্রহায়ণ

'নিমন্ত্রণ' (পৃ ৪৭) ও 'লিখি কিছু সাধ্য কী' (পৃ ৬৮) কবিতা দুইটি পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি 'বাঁশরী' নাটকে (১৩৪০ অগ্রহায়ণ) ব্যবহার করা হইয়াছে।

'পত্র' কবিতাটি প্রথমসংস্করণ 'পূরবী'র 'সঞ্চিতা' অংশে ১৩৩২ সালে প্রথম সংকলিত হইয়াছিল। (পরবর্তী সংস্করণে 'সঞ্চিতা' অংশ 'পূরবী' হইতে সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।) রচনাস্থান-নির্দেশক 'বনক্ষেত্র' শব্দটি Woodfield-এর কবিকৃত বঙ্গানুবাদ।

'সুসীম চা-চক্র' কবিতাটির সম্পর্কে অধুনালুপ্ত 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' হইতে (১৩৩১ শ্রাবণ) 'সুসীম চা-চক্র প্রবর্তনা'র বর্ণনাটুকু উদ্‌ধৃত হইল—

পূজনীয় গুরুদেব চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি চা-বৈঠকের প্রবর্তনা করিয়াছেন— ইহার নাম সুসীম চা-চক্র। সু-সুমো নামে বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীনীয় বন্ধু আশ্রমে একটি চা বৈঠক স্থাপনের জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পূজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, ইহা আশ্রমের কর্মী ও অধ্যাপকগণের অবসরসময়ে একটি মিলনের ক্ষেত্রের মতো হইবে— যেখানে সকলে একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনায় পরস্পরের যোগসূত্র দৃঢ় করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়ত, চীনদেশে চা-পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। সেখানে ইহা আমাদের দেশের মতো যেমন-তেমন ভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসংগতি দান করিবে।

বর্ষাঋতুর জন্য শ্রীযুত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের চক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎপরে গুরুদেবের নবরচিত একটি গান হয়। ইহার পরে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন হইতে আনীত খাদ্য আনন্দের সহিত ভোজন করেন।

'সুসীম চা-চক্র' উল্লিখিত সেই 'নবরচিত গান'— সুরে গেয়, অথচ সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবর্ণের লঘু গুরু উচ্চারণ-সহ কবিতারূপেও পাঠের যোগ্য।

'চাতক' কবিতা প্রসঙ্গে, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় কবিতাটির পরিচয়স্বরূপ মুদ্রিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—

এ কবিতাটি গুরুদেব যে প্রসঙ্গে লেখেন তাহা আমার মনে আছে। অধ্যাপকেরা বিদ্যাভবনের বারাণ্ডায় চা পান করিতেন। গুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেন, এবং বলাই বাহুল্য তাহাতে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া উঠিত। আমি বিদ্যাভবনে আমার কাজ নিয়া থাকিতাম, অত কাছে থাকিলেও আমি খুব কমই ঐ 'চা-চক্রে' বসিতাম, চা পান তো করিতামই না। একদিন অধ্যাপকেরা 'চা-চক্রে'র জন্য আমার নিকট হইতে ১৻৲ আদায় করেন। ইহাতে আমার ঐ বন্ধু

'চা-চাতক'গণ (এ নাম গুরুদেবেরই দেওয়া) 'চা-চক্রে'র এক বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আর, গুরুদেব সেদিন 'চক্রেশ্বর' হইয়া এই আলোচ্য কবিতাটি পাঠ করেন।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ, পৃ ১৩৮

'মিষ্টান্বিতা' কবিতাটি শ্রীমতী পারুল দেবীকে পত্রাকারে লিখিত হয়। কবিতার শেষ স্তবকটুকু রহস্যচ্ছলে প্রথমবারে প্রেরিত হয় নাই। ১৯৩৫ সালের ৫ জুন তারিখে নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকার পর উক্ত অংশ প্রেরিত হয়—

আমি আশা করেই ছিলুম যে তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়— না রাগ করা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব বলেই কবিতাটির শেষ দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাই নি— উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ কোরো।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ পৌষ, পৃ ৩৭৫

'নামকরণ' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক 'গল্পসল্প' গ্রন্থের 'চণ্ডী' গল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের 'চন্দনী' গল্পের শেষে যে কবিতা আছে তাহা এই কবিতার শেষ স্তবকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নূতনরূপ।

'নারীর কর্তব্য' কবিতাটি 'আন্নাকালী পাকড়াশী'র ছদ্ম-স্বাক্ষরে 'অলকা' পত্রিকায় বাহির হয়। এই উপলক্ষ্যে অন্য বহু ছদ্মনামও ভাবা হইয়াছিল। এই কবিতা সম্পর্কে কিছু তথ্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (বৈশাখ ১৩৬৪) গ্রন্থের ২১০-১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

'মধুসন্ধায়ী' কবিতা কয়টি 'মংপু-নিবাসিনী শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত'। আলোচ্য কবিতাধারার পরিশেষ-স্বরূপ নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত 'পঁচিশে বৈশাখ' হইতে সংকলন করা হইল—

বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া
তবুও রয়েছে কিছু বাকি দাবি-দাওয়া।
এখন স্বয়ং যদি আসিবারে পার'
তা হলে মাধব ঋণ বেড়ে যাবে আরো।
আহারের কালে মধু রহে বটে পাতে,
কিন্তু কোথা, দান করেছিলে যেই হাতে।
ডাকযোগে সাড়া পাই, থাক দূরদেশী—
মোকাবিলা দেখাশোনা দাম ঢের বেশি।

পত্তশিখরের পানে কবি মধু-সখা
উড়েছিল মধুগন্ধে, গন্ত উপত্যকা
করিবে আশ্রয় আজি স্পষ্টভাষণের
প্রয়োজনে। দুরারোহ তব আসনের
ঠাঁই-বদলের আমি করিতেছি আশা,
সংশয় না থাকে কিছু তাই এই ভাষা।

১১ মার্চ, ১৯৪০

'মিলের কাব্য' নিম্নোদ্ধৃত গদ্য ভূমিকা-সহ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—

১৯।১।৪১ তারিখের কথা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বসে আছি শয়নকক্ষে কেদারায় হেলান দিয়ে। আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণরাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত; দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা। আকাশ ছিল মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে টিপ টিপ করে। সুধাকান্ত বসে আছে পাশের চৌকিতে। হঠাৎ আমাকে বকুনি পেয়ে বসল। একটা কথা শুরু করলুম অকারণে, বলে গেলুম :

যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, সুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে বলে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে ব'সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি, সাদা হয়ে গেছে; মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে-অনুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নাই। তা হলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে, রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়। রঘুপতির অযোধ্যা বহু লোকের বহু কালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হয়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা 'না' প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ'য়ের আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই একে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে— একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না। সৃষ্টি জোড়-মিলনের কাব্য।

গদ্যের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁট বেঁধে চলল। অসুস্থ শরীরে ও আমার একটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুধাকান্ত এরই

ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকেন। আজ বাদলসন্ধ্যায় হাজরে দেওয়া তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ দিই…

—কবিতা, ১৩৪৭, চৈত্র, পৃ ১

আকাশপ্রদীপ

'আকাশপ্রদীপ' ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে মুদ্রণপ্রমাদের ফলে প্রকাশকাল '১৩৪৫' ছাপা হইয়াছিল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির সাহায্যে কয়েকটি কবিতায় রচনার কাল ও স্থান সংযোজিত, এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধিত হইয়াছে; 'বেজি' কবিতা দ্রষ্টব্য।

১৩৪৭ সালের গ্রীষ্মে আলমোড়ায় অবস্থানকালে রচিত 'যাত্রাপথ' কবিতাটি বাদে 'আকাশপ্রদীপ'এর অন্যান্য প্রায় সমস্ত কবিতা ১৩৪৫ সালের আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালের মধ্যে শান্তিনিকেতনে রচিত। অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রথম প্রচারিত না হইয়া একেবারে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। চারটিমাত্র কবিতার পত্রিকায় প্রকাশের সূচী নিয়ে দেওয়া হইল—

জানা-অজানা	প্রবাসী	১৩৪৫ কার্তিক
পাখির ভোজ	প্রবাসী	১৩৪৫ ফাল্গুন
সময়হারা	প্রবাসী	১৩৪৫ মাঘ
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'	প্রবাসী	১৩৪৬ বৈশাখ

'যাত্রাপথ', 'স্কুল-পালানে', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'জল', 'শ্যামা', 'কাঁচা আম'— এই কয়টি কবিতা প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র আরম্ভের কয়েক পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য) ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটির কোনো কোনো অংশ বিশেষভাবে তুলনীয়।

'বধূ' কবিতার প্রথম ছত্রটির পূর্ববর্তী কোনো-এক পাঠে পাণ্ডুলিপিতে 'ঠাকুরমা' স্থলে 'মুখুজ্জে' পাওয়া যায়। 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যের ছড়া বলার বিবরণটুকু এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুত বেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই-যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত।

আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত— কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।

—জীবনস্মৃতি, শিক্ষারম্ভ অধ্যায়

'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম' কবিতা দুইটি তথ্যের বিচারে জুড়ি কবিতা। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বধূসমাগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু তুলনীয়—

তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।

—জীবনস্মৃতি, প্রত্যাবর্তন অধ্যায়

পাণ্ডুলিপিতে 'শ্যামা' কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙ্‌ক্তির নিম্নরূপ আদিপাঠ পাওয়া যায়—

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে,
বারো ছিল বয়স আমার।

'জানা-অজানা' কবিতার 'প্রবাসী'তে-প্রকাশিত পাঠে সর্বশেষে দুইটি অতিরিক্ত ছত্র মুদ্রিত হইয়াছিল—

তাহাতে আভাসে থাকে চরমের কথা,
অস্তগিরিশিখরের নক্ষত্রের রহস্যবারতা।

'যাত্রা' কবিতাটিতে যে স্মৃতিচিত্র বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বা ভ্রমণের ডায়ারির (বিচিত্র প্রবন্ধ: য়ুরোপ-যাত্রী) 'শুক্রবার। ২২শে আগস্ট ১৮৯০' তারিখের অংশটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে ৫৮৭-৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'সময়হারা' কবিতার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠের সূচনায় ছিল—

ডাক্তারেতে বলে যখন 'মরেছে এই লোক'
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,

কিন্তু যখন বলে 'জীবন্মৃত'
সেটা শোনায় তিতো।
আমার ঘটল তাই,
নালিশ তবু নাই।

বর্তমান গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠার 'কখনো বা হিসাব ভুলে' ইত্যাদি ১৫-১৮ সংখ্যক ছত্র 'প্রবাসী'তে নাই; অপর পক্ষে ১১০ পৃষ্ঠার প্রথম দুই ছত্রে যে-স্তবকের শেষ তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ পাওয়া যায়—

শোচনীয় এই যে খবরখানা
আছে শুধু এক মহলেই জানা।
বাকি রইল অনেক অবোধ যাদের আশা আছে,
ঘোরে আমার আনাচে-কানাচে।

ইংরেজি ১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের একটি অংশ আলোচ্য কবিতাটির প্রসঙ্গে প্রণিধান-যোগ্য: আমার 'সময়হারা' কবিতাটি কোনো পক্ষর সঙ্গে ঝগড়া করতে লিখি নি, ওটা যে একটা সকৌতুক কবিতা সে কথাটা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে।

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি প্রকাশের পর, যে পুরাতন ছড়া অবলম্বনে উহা রচিত তাহার ঢাকা-ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত পাঠ 'প্রবাসী'তে (১৩৪৬ আষাঢ়, পৃ ৩৭৩) সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে উহার একটি পাঠ বহুকাল পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া ১৩০১-০২ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আলোচ্য কবিতা প্রসঙ্গে কবির সংগৃহীত সেই ছড়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ড হইতে (পৃ ৬২৭) নিম্নে সংকলিত হইল—

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।
ডাকাত আলো মা,
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে
দেখতে দিলে না।
আগে যদি জানতাম
ডুলি ধরে কানতাম।

'কাঁচা আম' কবিতার শেষ স্তবকে যে ঘটনাটির উল্লেখ আছে সেই প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত রবীন্দ্র-বাক্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—

জানো, একবার মাত্র জীবনে গয়না পরেছিলুম, আংটি। নতুন বৌঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, সং ১, পৃ ২০৫

চণ্ডালিকা

'চণ্ডালিকা' নাটিকাটি ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাদ্রের শেষে কলিকাতায় ম্যাডান থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ উহা আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহার আখ্যান-অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street, 1882) গ্রন্থের ২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত। 'ভূমিকা'য় গল্পটির যে-অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রথমার্ধমাত্র। গল্পের শেষার্ধ মূল গ্রন্থ হইতে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য নিম্নে মুদ্রিত হইল—

Matters, however, did not progress so satisfactorily as could be wished. The girl, disappointed at night, rose early the next morning, put on her finest apparel, and stood on the road by which Ānanda daily went to the city for alms. Ānanda came, and she followed him to every house he went for alms. This caused a great scandal, and Ānanda, followed by the girl, ran back to the hermitage, and reported the occurence to the Lord. The Lord was then called upon to exercise diplomacy to save the character of his disciple. He said to Prakriti, "You want to marry Ānanda. Have you got the permission of your parents ? Go, and get their permission." This afforded but slight respite, for Prakriti soon returned from the city with her parents' permission. The Lord then said, 'Should you wish to marry Ānanda, you must put on the same kind of ochre-coloured vestment which he uses." She agreed, and thereupon her head was shaved, she was made to put on ochre-coloured cloth, divested of her vicious motives, and had all her former sins removed by the mantra called

sarva dúrgati-śodhana-dhárani, the destroyer of all evils. Thus did the Lord convert her into a Bhikshuni.

—The Sanskrit Buddhist Literature, p 224

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনেই পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় 'চণ্ডালী' নামে সুদীর্ঘ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৩১০ মাঘ, পৃ ৪৪৯-৫৪) কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

'চণ্ডালিকা' প্রকাশের প্রায় চার বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ উহাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী পঞ্চবিংশ খণ্ডে 'চণ্ডালিকা'র উক্ত রূপান্তর মুদ্রিত হইয়াছে।

তাসের দেশ

'তাসের দেশ' বাংলা ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে, চণ্ডালিকার সহিত একই সময়ে, প্রথম বাহির হয়। উক্ত সংস্করণে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নাটিকাটির সমসাময়িক অভিনয়-সংবাদটুকুও মুদ্রিত হইয়াছিল—

প্রথম অভিনয়
ম্যাডান থিয়েটার
২৭শে, ২৮শে, ও ৩০শে ভাদ্র
১৩৪০

১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে 'তাসের দেশ'এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহা বহুল পরিমাণে 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত' সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নাটিকাটির অধুনাপ্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠই মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয়সংস্করণ 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়।

প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দৃশ্যে' পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখা চরিত্র (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৬৩) নূতন সংযোজিত হইয়াছে। রাজপুত্রের 'আমার মন বলে চাই চাই গো' (পৃ ১৬৩) গানটি প্রথম সংস্করণে 'তোমার মন বলে চাই চাই গো' ইত্যাদি পাঠান্তরে রাজপুত্রের

মায়ের গানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে, সম্পূর্ণ তৃতীয় দৃশ্যটি এবং নিম্নে নির্দেশিত আটটি গান নূতন যোগ করা হয়—

১। থর বায়ু বয় বেগে
২। গোপন কথাটি রবে না গোপনে
৩। তোলন নামন (তাসের কাওয়াজ)
৪। বলো, সখী, বলো তারি নাম
৫। অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে
৬। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
৭। গগনে গগনে যায় হাঁকি
৮। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও

রাজার মুখের ছড়া বা 'শাস্ত্রের ছন্দ'টিও ('শান্ত যেই জন', পৃ ১৯০) নূতন। প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত এই চারটি গান দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে—

১। হারে রে রে রে রে
২। হে মাধবী, দ্বিধা কেন
৩। হে নিরুপমা
৪। তুমি কোন পথে যে এলে, পথিক

১৭৪ পৃষ্ঠার শেষে মুদ্রিত রাজপুত্রের স্তবগানটি প্রথম সংস্করণে পূর্ণতর আকারে এইরূপ ছিল—

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস।
ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস।
তাম্রকূট-ঘন-ধূম-বিলাসী,
তন্দ্রাতীরনিবাসী—
সব-অবকাশ-ধ্বংস
যমরাজেরই অংশ॥

'তাসের দেশ' রচনাটি, ১২৯৯ আষাঢ়ের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটা আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডের ১৭২-৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গল্পগুচ্ছ

সংকলিত সকল গল্পই 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সাতটি গল্প যথাক্রমে বাংলা ১৩২১ সনের বৈশাখ-কার্তিক সাত মাসে এবং বাকি তিনটি গল্প ১৩২৪ সনের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং পৌষ মাসে। প্রথম সাতটি গল্প প্রথমতঃ গল্পসপ্তক (১৩২৩) গ্রন্থে সংকলন করা হয় এবং পয়লা নম্বর (১৩২৭) গ্রন্থে সংকলিত হয় 'তপস্বিনী' ও 'পয়লা নম্বর'। 'পাত্র ও পাত্রী'র প্রথম সংকলন বিশ্বভারতীসংস্করণ গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে (১৩৩৩); উহাতে পূর্বোক্ত নয়টি গল্পও পুনর্মুদ্রিত হয়।

'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত হইলে উহা বঙ্গসাহিত্যসমাজে বিশেষ আন্দোলনের কারণ হইয়াছিল ; তৎকালীন নারায়ণ প্রভৃতি পত্রে তাহার নিদর্শন আছে।

'শেষের রাত্রি' গল্পটিকে 'গৃহপ্রবেশ' (১৩৩২) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

'বোষ্টমী' গল্পের বোষ্টমীর উল্লেখ রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস সম্পূর্ণ ই কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবে তাহার কিছু মূল আছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু কোনো পাঠিকার প্রশ্নোত্তরে লিখিত এই পত্রখণ্ড এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—

বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেচি। বোষ্টমী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয় —সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।

—পত্রধারা, প্রবাসী, ১৩৩৯ শ্রাবণ, পৃ ৪৫১

সাহিত্যের পথে

'সাহিত্যের পথে' বাংলা ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেই অনুসারে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হইল। সাময়িকপত্রে প্রবন্ধগুলির প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাস্তব	সবুজ পত্র	১৩২১ শ্রাবণ
কবির কৈফিয়ত	সবুজ পত্র	১৩২২ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্য	বঙ্গবাণী	১৩৩১ বৈশাখ
তথ্য ও সত্য	বঙ্গবাণী	১৩৩১ ভাদ্র
সৃষ্টি	বঙ্গবাণী	১৩৩১ কার্তিক

সাহিত্যধর্ম	বিচিত্রা	১৩৩৪ শ্রাবণ
সাহিত্যে নবত্ব[১]	প্রবাসী	১৩৩৪ অগ্রহায়ণ
সাহিত্যবিচার	প্রবাসী	১৩৩৬ কার্তিক
আধুনিক কাব্য	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ
সাহিত্যতত্ত্ব	প্রবাসী	১৩৪১ বৈশাখ
সাহিত্যের তাৎপর্য	প্রবাসী	১৩৪১ ভাদ্র

'বাস্তব' ও 'কবির কৈফিয়ত' প্রবন্ধ দুইটির প্রথমসংস্করণে-মুদ্রিত চলতি ভাষার পাঠের পরিবর্তে 'সবুজ পত্র' মাসিকে প্রকাশিত সাধুভাষায়-লিখিত মূলপাঠ সংকলিত হইয়াছে। 'বাস্তব' প্রবন্ধের আরম্ভের নূতন অনুচ্ছেদটিও 'সবুজ পত্র' হইতে। উক্ত প্রবন্ধটির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না" এমন কথা "একেবারে আমারই নাম ধরিয়া" কেহ কেহ প্রয়োগ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৯৫-২০৩) 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' এবং 'সবুজ পত্র' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩২১ মাঘ, পৃ ৬৯৮-৭১০) 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধ দুইটি দ্রষ্টব্য।[২] 'প্রবাসী'র প্রবন্ধটিতে লেখক সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, "রবীন্দ্র-সাহিত্য সার্বজনীন নহে"; "রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি'— এই তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩০ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ ফাল্গুন তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা। সেনেট হলে বক্তৃতা হইবার অব্যবহিত পরে প্রথম দুইটি বক্তৃতার অনুলিখন 'সাহিত্যের মূলতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের রসতত্ত্ব' নামে ১৩৩০ ফাল্গুনের 'পরিচারিকা' পত্রিকায় সর্বাগ্রে বাহির হয়। তৃতীয় বক্তৃতাটি 'সাহিত্য' নামে ১৩৩১ বৈশাখের 'পল্লীশ্রী'তে প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ সালে 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় 'কষ্টিপাথর' অংশ (পৃ ২০১-০৩ ও ৩৪৮-৫২) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সম্ভবত উক্ত অনুলিখন যথাযথ হয় নাই বিবেচনা করিয়া 'বঙ্গবাণী'র জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বক্তৃতা তিনটি লিখিয়া

১ 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধের মূল নাম 'যাত্রীর ডায়ারি'

২ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত

দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' প্রবন্ধটির কয়েকটি বর্জিতাংশ 'বঙ্গবাণী' হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

সূচনাংশ

আমি অনেক দিন থেকেই প্রতিশ্রুত আছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে কিছু বলব। এতদিন সেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারি নি, তার কারণটা আমার প্রকৃতিগত।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, বাল্যকাল হতেই আমি স্কুল পালিয়ে বেড়িয়েছি, পারৎপক্ষে বিদ্যামন্দিরের সীমানায় ধরা দিতে চাই নি। এখন আমার এই বয়সে যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনা হল তখন দিনের পর দিন কেবলই আমার প্রতিশ্রুতির দিন পিছিয়ে দিচ্ছি— ওটা শুদ্ধ ভীরুতাবশত।

আজকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলতে হলে শ্রোতা ও বক্তার সম্মান-রক্ষার্থে লিখে বলাই উচিত। নিজে নানা দিক থেকে চিন্তা ক'রে, আর এই বিষয়ে অন্য অন্য সবাই কে কী বলেছেন তা সংগ্রহ ও তুলনা ক'রে, আলোচনাটা বেশ ভালো রকম ক'রে করা উচিত। এই-সব নানা কথা ভেবেই তো আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি।

ক্রমশই দেখছি, লেখার বয়স চলে যাচ্ছে। কতকাল থেকে ক্রমাগত লেখনী চালাচ্ছি, এখন লিখে লিখে একটা ক্লান্তি আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে। তা ছাড়া আমি কর্মজালে বিজড়িত হয়ে পড়েছি।

এবার যখন সুদূর চীন-যাত্রা করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন বহুমানভাজন আমাদের সভাপতি-মশায়[১] আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আমার প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি জানালেন যে, আমার তিনটি বক্তৃতার মধ্যে অন্তত একটা যেন বলে যাই। আমি তখন বললেম, 'আমার যা বলবার তা যদি আপনারা মুখে বলতে দেন তবে হয়তো আমি চেষ্টা করতে পারি।' তিনি তাতেই সম্মতি দিলেন। তাই আজ সাহস ক'রে আপনাদের কাছে দাঁড়িয়েছি, আপনাদের কাছে মুখে বলবার স্পর্ধা আমার স্বভাব-সংগত নয়।

মনে করেছিলেম, আমি তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে ব'সে ব'সে কিছু বলব। হয়তো দুই-তিন শো ছাত্র হবে— তাদের মোকাবিলায় সাহিত্যপ্রসঙ্গ নিয়ে সহজভাবে কিছু আলাপ ক'রে যাব। তাই সাহস ক'রে রাজি হয়েছিলাম।

১ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

যখন মুখে বলি তখন অনেক সময়ই চিন্তা ক'রে বলতে পারি নে— তার কারণ আমার স্মরণশক্তির দুর্বলতা। লোকে যাকে পয়েন্ট্‌ বা ব্যাখ্যানসূচি বলে সে-সব আমি মনে ধারণ করে রাখতে পারি নে। বলবার সময় সূচিগুলি হারিয়ে তার পরে সেই হারাধনের পিছনে পিছনে মনকে হঠাৎ দৌড় করতে পাঠালে, আসল কাজটার বড়ো ব্যাঘাত ঘটে। তাই দুর্দৈবক্রমে বক্তৃতাসভায় আমার ডাক পড়লে আমার রসনাকে আমার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ ক'রে দিই। অর্থাৎ, সেই সময় যেমন চিন্তার ধারা আসে তারই অনুবর্তন করে যাই। এ ছাড়া অন্য উপায় আমার হাতে নেই।

আজ আমার বলবার বিষয়টি হচ্ছে সাহিত্য। আর-কিছু না হোক, অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে বাল্যকাল থেকেই হাতে-কলমে সাহিত্য নিয়েই আছি। এই সম্বন্ধে অন্য মনীষীদের আলোচিত উপদেশে যদিও কিছু শিক্ষা করতে পারি নি, তবু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে। নিরন্তর সাহিত্যপ্রবাহ ব'য়ে ব'য়ে আমার অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে যে-পথ তৈরি হয়েছে সেই পথ দিয়ে আজকার দিনের আলোচনা হয়তো একটা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করতেও পারে। আপনা হতেই সেটা হবে এই আশাতেই আজ এখানে এসেছি।

অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র— ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র— হঠাৎ একদিন আমার প্রভাতভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। ব'লে ইংরেজিতে শুরু করলেন: Is art too good for human nature's daily food?

বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে-সকল সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রয়াস আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আনুকূল্য করে, মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদক্ষ করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনোপ্রকার সমস্যাপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ কি না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নই আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে ক'রে নিয়ে এসেছি। এই প্রশ্নের সূত্রটিকেই অবলম্বন ক'রে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা ক'রে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।

এর উত্তর দিতে গেলে আর্ট সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত গোড়া ঘেঁষে কথাটা বলতে হবে। নইলে কোনো ছোটো নিষ্পত্তিতে চলবে না। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কলাকারু সম্বন্ধে মানুষের এত বিচিত্র প্রয়াসের তাৎপর্যটা কোথায় আছে। যুগযুগান্তর থেকে মানব এই যে-সকল রূপরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আছে, যে-রচনা চিরকাল ধ'রে সকলের বহুপুরস্কৃত, মানবের সেই চেষ্টার মূল উৎস কোথায়। তা যদি ঠিকমতো নির্ণয়

করতে পারি তা হলেই বুঝতে পারব, আর্টের সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ কী এবং মানুষের প্রাণধারণের চেষ্টার পক্ষে তার উপযোগিতা কতটুকু।

এই মূল অনুসরণ করতে গেলে মধ্যপথে থামবার জো নেই, একেবারে তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় গিয়ে পৌঁছতে হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় অসীমের রাজ্যে। সত্যের সন্ধানে অসীমের পথে অভিযান আমাদের ভারতীয় প্রকৃতিগত; হয়তো কোনো ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনাকে এত সুদূরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে আমার সংকোচ হত। যদি বা সাহস ক'রে এ কাজে প্রবৃত্ত হতেম তা হলে গোড়াতেই 'ওরিএন্ট্যাল মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌' নামধারী এক স্বরচিত [কুহেলিকার অন্তরাল থেকে হয়তো আমার কথাগুলিকে তাঁরা কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে অস্পষ্ট ক'রে শুনতেন। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে আমার ভরসার কারণ এই যে, আমাদের পিতামহেরা আমাদের সমস্ত সম্বন্ধকেই একটি চিরন্তন সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

এই অনুশীলনায় তাঁদের সাহসের অন্ত ছিল না। যে-কোনো অভিব্যক্তি কলায় সংগীতে সাহিত্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাকে অনন্ততত্ত্বের পটভূমিকার উপর রেখে দেখতে পারলেই সত্যকে পাওয়া যায়— এই কথাটি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়।

মানবীয় সত্যকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। সেই তিন বিভাগের শাশ্বত ভিত্তি সন্ধান করতে গেলেই উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কোনো উপায় নেই।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৩-০৫

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশ

এই শেষোক্ত কথাটি আজ বিশেষ ভাবে আলোচ্য। যিনি বলেন আর্টের পরিচয় মানবের সংসারযাত্রার সঙ্গে একান্তভাবে সংগত, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই ভাবের সূত্রটিই তার প্রধান অবলম্বন— তাঁর এ কথাটা কি গ্রহণ করা চলে। প্রাত্যহিক প্রাণধারণ-ব্যাপারের সঙ্গে সংগত ক'রে দেখলেই কি তাকে সত্যরূপে দেখা হয়।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৫

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সূচনাংশ

প্রাত্যহিক প্রাণধারণের নানা ব্যাপারের সঙ্গে যে আর্ট মেলে না— এ কথা বলা চলে না। পূর্বেই বলেছি, সত্যের তিন ভাগের মধ্যে আদান-প্রদানের ঐক্যপথ আছে। অর্থাৎ, তাদের মিলের মধ্যে সত্য আছে। তেমনি আবার তাদের বিভাগের মধ্যেও

সত্য আছে। আমাদের জ্ঞান এক দিকে আমাদের প্রাণধারণ-ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। টিঁকে থাকবার জন্যই আমাদের অনেক কিছু জানা চাই। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারি নে যে, যে-সকল জানা আমাদের টিঁকে থাকার পক্ষে একান্ত উপযোগী নয় সেই-সকল জানা নিকৃষ্ট। বস্তুত…

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৫-০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মকে যে অনন্তস্বরূপ বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে তারও পরিচয় আছে। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষ আপনার প্রয়োজনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, তৃতীয় অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বাক্যের পর

এমন কি, 'যেমন ক'রে হোক আমি নিজে টিঁকব', 'অন্যের যা হয় হোক'— এ ইচ্ছাটা থাকে না।

বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৬, তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

পৃথিবীতে যে-মানুষ বলেছে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', সেই কৃপণ দীর্ঘজীবী হতে পারে, ধনী হতে পারে, কৃচ্ছ্রসাধনে আশ্চর্য শক্তি দেখাতে পারে— কিন্তু সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। ভূমা আমাদের ঐক্যবোধের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, যে-সত্যের সমৃদ্ধিকে প্রভূত ও সমুজ্জ্বল করে তোলে সেই সত্য-ক্ষেত্রেই আর্টের ফসল ফলে।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৬, তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

আপনাদের মধ্যে কোনো কোনো পরিহাসরসিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখছি— তবু উপনিষদের বাণী আমি এড়াতে পারলেম না। উপায় যে নেই। বহু শতাব্দীর এই-সব মহামন্ত্র, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাব ও সাধনার বীজমন্ত্র, আজও যে এরা আমার প্রাণের আশ্রয়। সেই উপনিষদ্ ব্রহ্মের আর-একটি স্বরূপের উল্লেখ ক'রে বলেছেন— অনন্তম্। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩১০

রচনাবলী পৃ ৩৭৭, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

এই জগতে আওরঙ্গজেব একদা সুদীর্ঘকাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব ক'রে ভারতকে কম্পান্বিত ক'রে দিয়ে গেছে; কিন্তু তাকে কি কেউ গ্রহণ করেছে। তা হলে পুঁথির

কালো অক্ষরের কীট-দংষ্ট্রার নিত্যদংশনের মধ্যে ছাড়া আর কোথায় সে আছে? কিন্তু তার যে ভাই দারাকে অকালে বধ ক'রে নিজের সিংহাসনের সোপানকে সে রক্তকলঙ্কিত করেছে তাকে যে আমরা আমার ব'লে আমাদের অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছি। সেই দারার জীবনটিই কি কাব্য নয়, সংগীত নয়। কেন তাকে কাব্যের সঙ্গে, সংগীতের সঙ্গে তুলনা করছি। কেননা, তার আসন যে নিখিলের করুণার মধ্যে।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৮

রচনাবলী পৃ ৩৮১, সর্বশেষ অনুচ্ছেদের শেষে

যদি হয় তো হোক্ সেটা অবান্তর কথা। তাতে যদি লজ্জা পাবার কোনো কারণ থাকে তবে সে লজ্জা কবির নয়, রূপদক্ষের নয়, সে লজ্জা তাঁরই যিনি অনন্তং, আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি— সেই লজ্জা পরমসুন্দরের— সেই লজ্জায় বিশ্বের প্রকাশ!

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩১২

বর্তমান গ্রন্থে ৩৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি (অমৃতের দুটি অর্থ ইত্যাদি) 'বঙ্গবাণী'র। প্রথম সংস্করণে উক্ত অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হইয়াছিল—

এই ঝড়ের মূর্তি তো মিলিয়ে গেল। একদা আমার স্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সেদিন বিরাট আকাশপটে যে-প্রমত্ততার প্রলয়চিত্র রচিত হয়েছিল, সে বাহ্যত যত স্বল্পস্থায়ী হোক, সেই ক্ষণকালের মধ্যেই ছিল অমৃতের প্রকাশ। চটকলের পাশে যে নোংরা বসতি আছে সময়ের পরিমাপে সে বড়ো হলেও সে মরেই আছে।

—সাহিত্যের পথে, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৯

৩৭৯ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রার পথে যে 'দারুণ ঝড়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সমসাময়িক বিবরণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর উনবিংশ খণ্ডে ৩২৯ পৃষ্ঠায় (জাপানযাত্রী। ৯ই জ্যৈষ্ঠ) পাওয়া যাইবে। চীনসমুদ্রে উক্ত ঝড়ের প্রেরণাতেই তিনি 'তোমার ভুবন-জোড়া আসনখানি' গানটি রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তোসামারু জাহাজ হইতে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ তারিখে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইল—

কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল শুরু হল— ডেকে কোথাও শোবার জো রইল না। অল্প একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম, 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে, পড়ুক ঝ'রে',

তার পরে 'বীণা বাজাও', তার পরে 'পূর্ণ আনন্দ'— কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চলল, তখন একটা নতুন গান বানিয়ে গাইতে শুরু করলুম, শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি দেড়টার সময় ক্যাবিনে এসে শুলুম। গানটা সকালেও মনে ছিল। সেটা নিচে লিখে দিচ্ছি। বেহাগ, তেওরা।

—প্রবাসী, ১৩৪২ আশ্বিন, পৃ ৮৫৪

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে (১৩৩৪ আষাঢ়) পূর্বদ্বীপপুঞ্জ-ভ্রমণে বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে রচনা করেন। ইহার কয়েক মাস আগে (১৯২৬ ডিসেম্বর) দিল্লিতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীঅমলচন্দ্র হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে 'অতি আধুনিক বাংলাকথাসাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক মহলে নানা দিক হইতে উহার সমালোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ ভাদ্র, পৃ ৩৮৩-৯০) ও 'কৈফিয়ৎ' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ৮৯২-৯৫), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের রীতিনীতি' (বঙ্গবাণী, ১৩২৪ আশ্বিন, পৃ ২৩৭-৪৬), এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃ ৫৮৭-৬০৬) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরের রচনা। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিবার পর উহা প্রকাশিত হইলেও (প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ), প্রবন্ধটি বিদেশে জাভা হইতে বালি যাইবার পথে প্লান্‌সিউজ জাহাজে 'যাত্রীর ডায়ারি' আকারে ১৩৩৪ সনের ভাদ্র মাসেই লিখিত। এটি এক হিসাবে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক। 'প্রবাসী' হইতে কয়েকটি বর্জিত অনুচ্ছেদ উদ্‌ধৃত হইল—

রচনাবলী পৃ ৪০৮, প্রবন্ধের সূচনাংশ

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব— সৃষ্টির মূলবাণী এই।

কিন্তু, এই বলার মধ্যেই আছেন দুই— যিনি বললেন আর যিনি শুনলেন, সৃষ্টিকর্তার নিজের অন্তরেই এই বলিয়ে আর এই শুনিয়ে, দু পারে দুজন— মাঝখানে সৃষ্টিরচন।

মর্তলোকের লেখার মধ্যেও সেই একই কথা। সামনা-সামনি আছে দুজনে— একজন বলে, একজন শোনে। যে শোনে তারই দাবির ছাঁচে বলার আকৃতি-প্রকৃতি অনেকখানিই ঢালাই হয়, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা শক্ত। যদি পুঁইশাকের খেতের মালিক তার ঝুড়ি নিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়ায় তা হলে ব্যাবসাদার কখনো জাহাজের

কাপ্তেনকে খবর দেবার কথা মনেই আনতে পারে না; তার দাবি আপনিই হাটে যাবার ডিঙি বা ডোঙার তলব করে।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৫

রচনাবলী পৃ ৪১১, ষষ্ঠ ছত্রে 'যথার্থ যে বীর' ইত্যাদির পূর্বে

তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৭

রচনাবলী পৃ ৪১২, চতুর্থ ছত্রের পর স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ

শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে ব'লেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম ক'রে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি। 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখি নি— দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন ব'লেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৭

পূর্বদ্বীপপুঞ্জ হইতে দেশে ফিরিয়া ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র লেখেন; প্রাসঙ্গিকবোধে উহার শেষাংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

'সাহিত্যধর্ম' ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চলছে। তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই 'সাহিত্যে নবত্ব' ব'লে আরও একটা লেখা হয়েছে। তোমার সঙ্গে বাক্যালোচনাতেও সাহিত্যতত্ত্বচর্চা কিছু পরিমাণে আছে— এতে ক'রে যে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌছনোটা খুব বেশি দরকারি নয়— দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর-এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে। মানুষের মন শেষ কথায় যখন এসে

পৌঁছয় তখন নীরবতার সমুদ্র। সেখানে তার কথার কারবার বন্ধ করতে মানুষের আপত্তি আছে; কেননা, মনটা নাড়া না পেলে একেবারে সে বেকার। এইজন্যে বারে বারে সত্য সিদ্ধান্তকেও মানুষ তার সংশয়ের খোঁচা মেরে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে— যুগে যুগে তাই চলছে। আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্যে নয়, চাওয়ার জন্যেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়ো; হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধু— কেননা, ফিরে ফিরে না পেতে থাকলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। অতএব, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সাবেক কালের সঙ্গে হাল আমলের যে ঝগড়া চলছে তার মূলে মানুষের এই স্বভাবটাই কাজ করছে, যাকে আশ্রয় করে তাকে সে আঘাত ক'রে সন্দেহ করে— তার পরে আবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তার কাছে ফিরে আসে।

—অনামী, পত্রগুচ্ছ, পৃ ৩৪৩

'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রপরিষৎ-সভায় প্রদত্ত মৌখিক ভাষণের কবির স্বকৃত স্মৃতিলেখন। প্রবন্ধটির বর্জিত আরম্ভভাগ 'প্রবাসী' হইতে সংকলিত হইল—

রবীন্দ্রপরিষৎ সভায় 'সাহিত্যবিচার' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, সেইটি লিখে দেবার জন্যে আমার 'পরে অনুরোধ আছে। মুখে-বলা কথা লিখে বলায় নূতন আকার ধারণ করে। তা ছাড়া আমার মতো অসাধারণ বিস্মৃতি-শক্তিশালী লোক এক দিনের কথিত বাণীকে অন্য দিনে যথাযথরূপে অনুলেখনে অক্ষম। অতএব সেদিনকার বাক্যের ইতিহাস অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা না ক'রে বক্তব্য বিষয়টার প্রতিই লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলে রাখি, যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্যবিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো; আর বিচারটি হল পরিচয়— তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য। কিন্তু, পরিচয় তো অনেকরকম আছে। আমরা প্রায়ই ভুল করি, এক পরিচয়ের জায়গায় আর-এক পরিচয় দাখিল করি, যেখানে এক গ্লাস জল আনা আবশ্যক সেখানে 'তাড়াতাড়ি এনে দিই আধখানা বেল'। জলের চেয়ে বেলে ভার আছে, সার আছে, সেই কারণে বাজারে তার দামও বেশি, কিন্তু যে তৃষার্ত মানুষ জল চায় সে মাথায় হাত দিয়ে পড়ে।

সাহিত্যবিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়। কল্পনা করা যাক, আমাদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সাহিত্যের বিষয়। পরিচয় দেবার উপলক্ষ্যে বিচারক হয়তো গর্ব ক'রে বলে উঠবেন, জাতিতে উনি বৈদ্য। জিজ্ঞাসু বলবেন, 'এহ বাহ্য'। তখন বিচারক আবার গর্ব করে বলতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করেন, তার পদগৌরব এবং অর্থগৌরব প্রচুর। জিজ্ঞাসু আবার বলবেন, 'এহ বাহ্য'। তখন বিচারক স্বর আরও চড়িয়ে বলবেন, উনি তত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। হায় রে, এও সেই আধখানা বেল। ঐতিহাসিক সাহিত্যে এ-সব তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করা চাই, কিন্তু রসসাহিত্যে এগুলিকে সযত্নেই বর্জন করতে হবে। উৎসাহী হোমিওপ্যাথ বাল্মীকিকে প্রশ্ন করে যে, বনবাসকালে নিঃসন্দেহ মাঝে মাঝে রামচন্দ্রের ম্যালেরিয়া হয়েছে, তখন তিনি নিজের কিরকম চিকিৎসা করতেন। বাল্মীকি তাঁর জটাশ্মশ্রু নিয়ে চুপ ক'রে থাকেন, কোনো উত্তর দেন না। ঐতিহাসিক রামচরিতে রামচন্দ্রের সমর্থিত চিকিৎসাপদ্ধতি মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিক রামচরিতে ওকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। এমনতরো বহুসহস্র অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই রামায়ণ সম্ভবপর হয়েছে, তথাপি সেটা সপ্ত কাণ্ডর কম হল না।

আমি যে-কথাটি বলতে গিয়েছি সে হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়।

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩১

এই গ্রন্থের ৪১৫ পৃষ্ঠার অষ্টাদশ ছত্রের পরে একটি অতিরিক্ত বাক্য 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায়: তৃষ্ণার্তের জন্যে আধখানা বেলের প্রভূত আয়োজন।

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩২

এই গ্রন্থের ৪১৬ পৃষ্ঠার শুরুতে যে অনুচ্ছেদ শেষ হইয়াছে তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায়—

কথা যখন উঠল, নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বললে আশা করি কেউ দোষ নেবেন না। কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে সংবাদ পাওয়া গেল, আমার কবিতায় সত্ত্ব রজঃ এবং তম এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণটাই সাহিত্যিক ল্যাবরেটরিতে অধিক পরিমাণে ধরা পড়েছে। এরকম তাত্ত্বিক কাকুক্তি প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট বলেই সেটা শুনতে হয় খুব মস্ত। এ-সব কথা ভারি ওজনের কথা। আমাদের শাস্ত্র-মানা দেশে এতে ক'রে লোকেও স্তম্ভিত হয়। আমার আপত্তি এই যে, সাহিত্যবিচারে এ-সব শব্দের কোনো স্থান নেই। তবু যদি গুণের কথা উঠলই, তা হলে এ কথা

মানতেই হবে আমি ত্রিগুণাতীত নই, দ্বিগুণাতীতও নই, সম্ভবত সাধারণ মানুষের মতো আমার মধ্যে তিন গুণেরই স্থান আছে। নিশ্চয়ই আমার লেখার কোথাও দেখা দেয় তম, কোথাও বা রজ, কোথাও বা সত্ত্ব। পরিমাণে রজটাই সব-চেয়ে বেশি এ কথা প্রমাণ করতে যাঁরা কোমর বাঁধেন তাঁরা এ লেখা ও লেখা, এ লাইন ও লাইন থেকে তার প্রমাণ ছেঁটে কেটে আনতে পারেন। আবার যিনি আমার কাব্যকে সাত্ত্বিক ব'লে প্রমাণ করতে চান তিনিও বেছে বেছে সাত্ত্বিক লাইনের সাক্ষী সারবন্দী ক'রে দাঁড় করাতে যদি চান মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবার দরকার হবে না। কিন্তু, সাহিত্যের তরফে এ তর্কে লাভ কী। উপাদান নিয়ে সাহিত্য নয়, রসময় ভাষারূপ নিয়েই সাহিত্য। ম্যাক্‌বেথ নাটকে তমোগুণ বেশি কিম্বা রজোগুণ বেশি, কিম্বা সাংখ্যদর্শনের সব গুণেরই তাতে আবির্ভাব কিম্বা অভাব, এ কথা উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক যে-কোনো গুণই তাতে থাক্ বা না থাক্ সবসুদ্ধ মিলে ঐ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেছে। প্রতিভার কোন্ মন্ত্রবলে তা হল তা কেউ বলতে পারে না। সৃষ্টি আপনাকে আপনিই প্রমাণ করে, উপাদানবিশ্লেষণ দ্বারা নয়, নিজের সমগ্র সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ ক'রে। রজোগুণের চেয়ে সত্ত্বগুণ ভালো, এ নিয়ে মুক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় তর্ক চলতে পারে; কিন্তু সাহিত্যে সাহিত্যিক ভালো ছাড়া অন্য কোনো ভালো নেই।

কাঁটাগাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ হয়। গোলাপ-গাছের প্রকৃতিটা অস্ত্রধারী, জগতে শত্রু আছে এ কথা সে ভুলতে পারে না। এই সন্দেহচঞ্চল ভাবটা সাত্ত্বিক শান্তির বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুল হিসাবে নিন্দা করা যায় না; নিষ্কণ্টক অতিশুভ্র ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে রমণীয়তায় হেয় এ কথা তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ বলবে না। ভুঁইচাঁপা ওঠে মাটি ফুঁড়ে, থাকে মাটির কাছে, কিন্তু ফুলের সমজদার এই রজো বা তমোগুণের লক্ষণটা স্মরণ করিয়ে তাকে সাংখ্য-তত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করে না।

আমার কাব্য সম্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষ তর্কটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় যে-দোষটা সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় এটা তারই একটা নিদর্শন। আমরা সহজেই ভুলি ইত্যাদি

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩৩

'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ দুইটি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি ১৩৪০ সালের শেষে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৩৪১ সালের আরম্ভে (১৬ জুলাই ১৯৩৪) পঠিত হয়।

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটির 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত পাঠের কয়েকটি অংশ গ্রন্থ-প্রকাশকালে প্রথম সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধটির উক্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পূর্ণতর পাঠ মুদ্রিত হইল।

পরিশিষ্ট

'সাহিত্যের পথে'র প্রথম সংস্করণে 'পরলোকগত লোকেন পালিতকে লিখিত' রবীন্দ্রনাথের চারখানি পত্রের কিয়দংশমাত্র 'পরিশিষ্ট' আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯৮-৯৯ সালে প্রথম বর্ষের 'সাধনা' পত্রিকায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্রোত্তর সহ উক্ত 'সাহিত্য সম্বন্ধে চিঠিপত্র'গুলি মাসে মাসে প্রকাশিত হয় (সাধনা, ১২৯৮ ফাল্গুন হইতে ১২৯৯ ভাদ্র ও আশ্বিন দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে (পৃ ৪৬৩-৮৮) 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে পত্রগুলির 'সাধনা'য় প্রকাশিত সম্পূর্ণতর পাঠ 'পত্রালাপ' নামে ইতিপূর্বেই সংকলিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান সংস্করণে সেগুলি বর্জিত হইল।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির সমসাময়িক কয়েকটি সাহিত্য-বিষয়ক রচনা, অভিভাষণ ও আলোচনার বিবরণ, বিভিন্ন পত্রিকা হইতে সংকলন করিয়া রচনাবলী-সংস্করণে নূতন পরিশিষ্ট যোগ করা হইল। সাময়িক পত্রে উহাদের প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল—

সভাপতির অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন	১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ
সভাপতির শেষ বক্তব্য	শান্তিনিকেতন	১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্যসম্মিলন	প্রবাসী	১৩৩৩ বৈশাখ
কবির অভিভাষণ	প্রবাসী	১৩৩৪ ফাল্গুন
সাহিত্যরূপ	প্রবাসী	১৩৩৫ বৈশাখ
সাহিত্য-সমালোচনা	প্রবাসী	১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ
পঞ্চাশোর্ধ্বম	বিচিত্রা	১৩৩৬ ফাল্গুন
বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	বিচিত্রা	১৩৪১ মাঘ

'সভাপতির অভিভাষণ' ও 'সভাপতির শেষ বক্তব্য'— কাশীতে উত্তরভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের কথিত বক্তৃতার শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক 'আংশিক অনুলিখন'। বক্তৃতা দুইটি ইংরেজি ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যথাক্রমে ৩ ও ৪ তারিখে প্রদত্ত হয়।

১৩৩২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের শিউড়ি-অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন, এইরূপ কথা হইয়াছিল। 'সাহিত্যসম্মিলন' সেই উপলক্ষে রচিত হয়।

'কবির অভিভাষণ' প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের অভ্যর্থনার উত্তরে বলা হইয়াছিল। আলোচ্য রচনাটি উক্ত মৌখিক অভিভাষণের কবির স্বকৃত অনুলেখন। ১নং 'রবীন্দ্র-পরিষদ-নিষ্ক্রান্তি'-রূপে 'রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ' নামে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভার দুইটি বিশেষ অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ লিখিত বিবরণ। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে যে-আলোড়ন জাগিয়াছিল (শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পূর্বসংকলিত পত্র দ্রষ্টব্য) তাহার পরিণামে বাংলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের একত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে যথাক্রমে ৪ ও ৭ তারিখে বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উপরোক্ত দুইটি অধিবেশন জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচনায় সূত্রধারের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদন করেন।

'পঞ্চাশোর্ধ্বম্' বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের কলিকাতায় ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ অধিবেশনের জন্য (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০) লিখিত অভিভাষণ। সে সময়ে বাংলার বাহিরে ব্যস্ত থাকায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বা অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। রচনাটি অনতিবিলম্বে 'বিচিত্রা'য় বাহির হয়।

'বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) উদ্‌বোধন অভিভাষণ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

উল্লেখযোগ্য সংশোধন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

পৃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	১	পরিচে পেরাকি	পিরিচে পেড়াকি
৩৮	৬	সে দন	সেদিন
৫৫	১৮	মোট	মোটা
৯২	২৪	চাঁদনীর	চাঁদিনীর
১০১	২০	রক্কে	রক্কে
১০৪	১৫	যথাযথ্য	যাথাযথ্য
১০৮	১৬	ভাঙা	ডাঙা
১৭৪	১২	ওদিকে	ওদিক
২২৩	১	ত্রুটি	ছুটি
২৩০	১২	সম্মুখে	সমুখে
২৪৭	২৭	বালা	বাংলা
৩১৪	১৯	অন্তরেরর	অন্তরের
৩১৫	১২	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ্র
৩২১	১৪	ব্যয়ামপ্রণালী	ব্যায়ামপ্রণালী
৩২৬	২৬	পায়লা-নম্বরে	পয়লা-নম্বরে
৩২৭	২৮	সীতাংশু	সিতাংশু
৩৩৯	১৯	বলশালী	ধনশালী
৪১৬	১৫	ম হমাতেই	মহিমাতেই
৪১৭	৮	দয়ে	দিয়ে
৪৩৫	২	এঁকেই	একেই
৪৪৭	৮	শোনাবামাত্র	শোনবামাত্র
৪৫০	১৪	থাকে	থেকে
৪৬৯	৬	মেই	নেই
৪৭৫	২৩	জানতে	জানাতে
৫০০	১২	আবসাদ	অবসাদ
৫৩০	১৯	রঙ্গ।	বড়ো রঙ্গ।